যুগকন্যা

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

নর্দার্ন বুক ক্লাব
কলিকাতা ৫

প্রথম প্রকাশ—রথযাত্রা ১৩৭৪

প্রকাশক :
সি, এল, দাস
নর্দার্ন বুক ক্লাব
৬৭ বি, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ৫।

ব্লক :
পিকটো টাইপ সিণ্ডিকেট
৩২বি, জয় মিত্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৫

মুদ্রাকর :
শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৯নং, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা ৬।

প্রচ্ছদপট :
শ্রীবিমল সেন

দাম ৪'৫০ টাকা
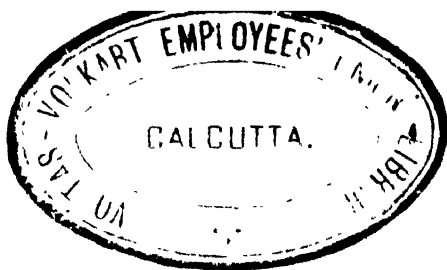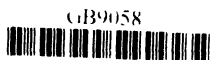
স্বাধীন ভারতের আশার প্রতীক

প্রতিভাময়ী কন্যাদের

উদ্দেশে

এই গ্রন্থখানি

সস্নেহে

সমর্পিত হলো

॥ পরিচয় ॥

স্বাধীন ভারতে কন্যাদের সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা কোন্ পথ অবলম্বন করবে এবং কি উপায়ে তারা যুগকন্যারূপে বিশ্বের কন্যাকুল সমক্ষে প্রজ্ঞার আলোকপাত করে সবার নমস্য হবে—

বাস্তবধর্মী একটি কন্যার আখ্যান উপায়নরূপে গ্রহণ করে, তারই আভাস দেবার প্রচেষ্টা হয়েছে।

প্রবীণতম লেখকের এই নবীনতম প্রয়াস জনাদৃত হলেই মৌলিক পরিকল্পনাটি সার্থক হবে।

এই গ্রন্থে বর্ণিত কুমার কুমারীদের কথা যথাস্থানে সংবৃত হলেও পঞ্চবার্ষিকী সাধনার পর সমাজ জীবনে এরা যে কালজয়ী স্বাক্ষর রাখে, যথাকালে সে আলেখ্যও রূপায়িত হবে।

৪২, বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৩

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

কানাই চৌধুরী যখন নিজের প্রতিভা, কর্মশক্তি ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের প্রভাবে রায়বাবুদের কলিয়ারী, জমিদারী ও সাতমহলযুক্ত বিখ্যাত বড় বাড়ীর মালিক হয়ে এলেন—তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের কোঠা পেরিয়ে গেছে; মাথার চুলে পাক ধরেছে, অতিরিক্ত শ্রমে গায়ের চামড়া ঢিলে হয়ে পড়েছে, মনের উৎসাহ হঠাৎ যেন থেমে গেছে।

নিজের চোখে তিনি দেখেছেন—পূর্বতন মালিকদের অন্যায়, অপব্যয়, অনাচার এবং অবিশ্বাসী কর্মচারীদের শঠতার জন্য রাজার মত প্রতিষ্ঠা ও ঐশ্বর্যসম্পন্ন একটা বিশিষ্ট বংশের পতন কেমন করে সম্ভব হতে পারে। সেই প্রনষ্ট প্রতিষ্ঠা ও ঐশ্বর্য তিনি আয়ত্ত করতে পেরেছেন নিজের ন্যায়নিষ্ঠ মন, ত্যাগ ও আদর্শ চরিত্রের সহায়তায়। কিন্তু আয়াসলব্ধ এক অতুল ঐশ্বর্য ভোগ করতে তিনি ছাড়া আর ত কেউ নেই। সারা জীবন ধ'রে তিনি অর্থ'ই সঞ্চয় করেছেন, কিন্তু ঐশ্বর্য ছাড়াও মানুষের জীবনের যে আর একটা দিক আছে, ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠার মোহে সে দিকটার কথা তাঁর মনেও পড়েনি। এই অবস্থায় তিনি উপলব্ধি করলেন যে, এই বয়সে এক তরুণীর পাণিপীড়ন ক'রে সংসার রচনা তাঁর পক্ষে সহজ ও সম্ভব হ'লেও, তাঁর জাগ্রত অন্তর কিন্তু তাতে সাড়া দিচ্ছে না। এই সঙ্গে আর

একটি আশঙ্কাও জাগল যে, এই অর্জিত বিশাল সম্পত্তি পরিণত বয়সে একার শক্তিতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাও সম্ভব নয়। এখন চাই এমন একজন উপযুক্ত কর্মী—যাঁর সঙ্গে তাঁর মনের মিল হতে পারে। চান তিনি এমন লোক—যে ব্যক্তি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর মত ধনাঢ্য প্রভুর আজ্ঞাবহন করতে অভ্যস্ত নন···ন্যায়নিষ্ঠ নির্ভীক কর্মীরূপে যিনি স্বভাব ও চিত্তের প্রভাবে তাঁর সমকক্ষ হবার ক্ষমতা রাখেন।

কথায় আছে—'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' সুতরাং কানাই চৌধুরী এই মধুমতী গ্রাম থেকেই তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী কর্মী পুরুষের সাহায্য পেয়ে গেলেন। তাঁর নাম মথুরানাথ ভট্টাচার্য। কানাই বাবুরই স্বজাতি ও সমবয়সী, সচ্ছল অবস্থাপন্ন, বিপত্নীক এক ভদ্রলোক। একটি বালিকা কন্যা ও একটি শিশু পুত্র রেখে পত্নী যখন পরলোক গমন করেন, তখনও মথুরবাবুর বিবাহের বয়স ছিল। কিন্তু সাধ্বী পত্নীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর অক্ষুণ্ণ থাকায়, সে চিন্তাকেও কোনদিন অন্তরে স্থান দেন নি। শুধু মধুমতী গ্রামখানি নয়—সমস্ত পরগণা জুড়ে তাঁর সুনাম। যেহেতু, মানুষকে ভালবাসাই তাঁর স্বভাব—এজন্য তিনি অজাতশত্রু। আরও দুটি দুর্লভ গুণের জন্য মথুরবাবু পুরাণ-বর্ণিত প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের পর্য্যায়ভুক্ত হয়েছিলেন। যেমন, তাঁর অদ্ভুত সত্যনিষ্ঠা—জীবনে কখনো তিনি মিথ্যাচারে অভ্যস্ত নন। আর তাঁর অদ্ভুত মানবতা—মানুষকে ভালবাসা ছিল তাঁর কর্তব্যের মন্ত্র,

ভালবেসে তিনি অমানুষকেও মানুষ করে নিতে ভালবাসেন।
এজন্য জন-সমাজে 'কলির যুধিষ্ঠির' নামে তিনি অভিহিত হয়ে
আসছেন। সুনামের সঙ্গে মহকুমা সদরপুরে সরকারী ব্যাঙ্কে
দীর্ঘকাল চীফ একাউণ্ট্যাণ্টের কাজ করে এসেছেন। স্ত্রীর মৃত্যুর
পর অসময়ে সে কাজ থেকে অবসর নিয়ে বাড়ীতে থেকেই
নিজস্ব জমিজমা দেখাশোনা করেন। অবস্থা মন্দ নয়, ভদ্রাসন-
যুক্ত বাড়ীখানি দেখলেই মনে হয় যে, মা কমলার
আঙিনা যেন।

কানাই চৌধুরী এই সর্তে মথুরবাবুকে তাঁর সমগ্র ষ্টেটের
দেওয়ান বা অধ্যক্ষপদে নিয়োগপত্র গ্রহণে বাঁধ্য করতে সমর্থ
হলেন যে, কানাইবাবু তাঁর জমিদারীর প্রজা এবং কলিয়ারীর
শ্রমিকদের প্রতি পুত্রবৎ আচরণ করবেন, খাজনা ছাড়া জমিদারী
ব্যাপারে পরিচিত কুখ্যাত 'আবওয়াব' নামে উপরি আদায়-
পত্রের মোহ ত্যাগ করবেন; চাষের জমি মধ্যে মধ্যে মেরামত
ক'রে দেবেন এবং শ্রমিকরাও যাবতীয় ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা
পাবে। কোনরূপ অন্যায় বা অবৈধ ব্যাপারে চৌধুরী মশাই
কর্মচারীদের প্রশ্রয় দেবেন না।...মথুরবাবুর প্রদত্ত প্রতিটি সর্তে
সম্মত হয়ে কানাই চৌধুরী বললেন: এই রকম মজবুত মানুষই
আমি চেয়েছিলুম—যিনি আমার চোখ-রাঙানির তোয়াক্কা
রাখবেন না, বরং আমাকেই সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতে হবে—আমার
কোন অন্যায় দেখে তিনি যাতে চোখ রাঙিয়ে আমার কাছেই
কৈফিয়ৎ চাইবার মত কোন ফাঁক না ধ'রে ফেলেন।

চার্জ নিয়েই মথুরবাবু বিভিন্ন সেরেস্তার কর্মচারীদের জানিয়ে দিলেন যে, কি সর্তে তিনি এই ষ্টেট চালাবার দায়িত্ব নিয়েছেন। সুতরাং, এখন থেকে প্রত্যেক কর্মচারীকে তাঁরই নীতি অনুসরণ করে চলতে হবে।

কানাইবাবু তাঁকে যদিও বলেছিলেন—সেরেস্তার মানুষ-গুলির মধ্যে বেশীর ভাগই পুরাণো পাপী—"রায়বাবুদের" আমলের লোক। তাঁদের অধঃপতনে এঁরাও যথেষ্ট হাত সাফাই করেছিলেন মনে হয়। এ-অবস্থায় এদের রাখা না রাখা আপনার ইচ্ছা মথুরবাবু। দুষ্টু গরু সব সরিয়ে গোয়ালশূন্য ক'রে—তারপর যদি আপনি নিজের পছন্দে গোয়াল ভর্তি করেন,আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। আপনিই এদের বাহাল বরখাস্তের মালিক, এ কথা মনে রাখবেন। কারণ, দুষ্টু গরুকে আমার বড় ভয়; গুঁতোবার ফুরসৎ পেলেই এদের শিঙ্ চুলকোয়. তখন মনিবকেও মানে না।

মথুরবাবু বললেনঃ আপনি অন্যায় বলেন নি। কিন্তু একসঙ্গে এতগুলি লোকের চাকরী যদি যায়, এদের সংসার চলবে কি করে বলুন! তার চেয়ে আমাদের নীতি জানিয়ে সেইভাবে এদের যদি চালিয়ে নিতে পারি—সেইটিই বড় কথা। মন্দকে ভালো করে নেওয়ার মধ্যে একটা সার্থকতা আছে।

সেই সূত্রেই মথুরবাবু সেরেস্তার কর্মচারীদের তাঁর অবলম্বিত নীতির কথা বুঝিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকেও প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, বাজে আদায় বা অন্যায় ক'রে অর্থ উপার্জনের

কথা তাঁরা ভুলে যাবেন এবং সে জন্যে এখন থেকে তাঁদের বেতন যথাসম্ভব বাড়িয়ে দেওয়া হবে, তা ছাড়া দুর্গা পূজায় ও চৈত্র-সংক্রান্তিতে সাল-তামামীর সময় প্রত্যেক কর্মচারী দু'মাসের বেতন পার্বণী হিসাবে অতিরিক্ত পাবেন।

এতে কর্মচারীদের উচিত খুসি হওয়া। কিন্তু রায়বাবুদের আমলের 'রাঘব-বোয়াল'-স্বরূপ সদর-নায়েব ফটিক ঘোষাল এ ব্যবস্থায় একেবারে যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তাঁর মতে প্রজার কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে খাজনা আদায়ের চেয়ে অনির্দিষ্ট ধারায় বাজে আদায় বা 'আবওয়াব'-এর টাকারই রস বেশী, আর অতিশয় মিষ্টি; যেহেতু তার অংশ সেরেস্তার আমলাবর্গও পেয়ে থাকেন। এই দিক দিয়ে ফটিক ঘোষাল মোটা অঙ্কের টাকা উপার্জন করতেন। এখন মথুরবাবুর ব্যবস্থায় সে পাট উঠে যাচ্ছে দেখে তিনি মনে মনে একান্ত বিরক্ত হয়ে তলে তলে দল পাকাতে লাগলেন। মথুরবাবুও তাঁর শান্তিময় জীবনে এই প্রথম এক শত্রু সৃষ্টি করে তার প্রচ্ছন্ন কোপদৃষ্টিতে পড়লেন। এই লোকটির প্রকৃতি ঠিক শয়তানের মত। সদাই তাঁর হাস্যমুখ, মিষ্টিস্বরে কথা বলেন—কিন্তু সে-কথা চিনির প্রলেপ দেওয়া, তার ভিতরে অতি বিশ্রী তিক্ত স্বাদ! বাইরেটা তাঁর যতখানি চোখে লাগা ভালো, ভিতরটা তার বিশগুণ বেশী কালো। এই অদ্ভুত প্রকৃতির জীব হচ্ছেন—ফটিক ঘোষাল।

মথুরবাবুর মত দক্ষ ও যোগ্য লোকের উপর সমস্ত বিষয়-

সম্পত্তির ভার তুলে দিয়ে কানাই চৌধুরী নিশ্চিন্ত হলেন। পক্ষান্তরে মথুরবাবুও স্বল্পভাষী কর্মযোগী এই মানুষটিকে চিনেছিলেন। রায়বাবুদের মত এই লোক বেহিসেবি নন, একটি পয়সাও অপব্যয় করতে চান না। লোকজন খাইয়ে, বারো মাসে তেরো পার্বণ ক'রে, দু' হাতে টাকা ছড়িয়ে নাম বাজাবার পক্ষপাতী তিনি নন—তা লোকে নিন্দা করুক, বা ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণ ব'লে যত অপবাদই রটিয়ে বেড়াক, তাঁর এ-সবে গ্রাহ্যই নেই। কথায় কথায় বলেন—টাকার মতন শক্ত না হ'লে টাকা ধরা দেয় না। তাই না টাকার ব্যাপারে তাঁকে এত কঠিন হতে হয়েছে।

কিন্তু গ্রাম্য মাতব্বরগণ গ্রামের হাইস্কুলের বিল্ডিং তৈরীর জন্যে যেই মথুরবাবুর মাধ্যমে কানাইবাবুকে অনুরোধ জানালেন এ ব্যাপারে মাথা দেবার জন্যে, তিনি তৎক্ষণাৎ অম্লান বদনে যে মোটা টাকা ডোনেশান ব'লে দিলেন—এঁদের পক্ষে সেটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। উপরোক্ত, স্কুলটির সাহায্য-কল্পে মাসে মাসে একশো টাকা হিসেবে বরাদ্দ করায় তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন, ইনি কি ধাতের মানুষ। অথচ, এই লোককেই তাঁরা কৃপণ বলে নিন্দা করেছেন! কানাইবাবু আরও করলেন কি, বড়বাড়ীর যে পূজোর দালানে রায়বাবুদের আমলে বারো মাসে তেরো পার্বণ উপলক্ষে উৎসব হ'ত, তিনি সেখানে নূতন ধরণের এক পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করলেন। তার একদিকে ছেলেরা, আর এক দিকে মেয়েরা সারি সারি ব'সে পড়াশোনা

করবে ; ছেলেদের দিকে একজন এবং মেয়েদের দিকে আর একজন বর্ষীয়ান শিক্ষক তাদের পড়াবে। এই প্রাথমিক পাঠশালা থেকে মেয়েরা মোটামুটি শিক্ষা পাবে এবং ছেলেরা এখানকার পড়া শেষ ক'রে হাইস্কুলের ৫ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হতে পারবে। এখানকার শিক্ষার, এমন কি পুস্তকাদি কেনবার ভারও কানাই চৌধুরী বহন করবেন।

এইভাবে পাঠশালা চালু হবার মাস কয়েক পরে, হঠাৎ একদিন কানাই চৌধুরী মথুরবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার ছেলে-মেয়েরা এ-পাঠশালায় ত পড়তে আসে না! তারা কি পড়াশোনা করে না মথুরবাবু?

মৃদু হেসে মথুরবাবু বললেন: আমার সন্তানরা পড়াশোনা করবে না? তবে বলি চৌধুরী মশাই, আমার মেয়ে সাধনা এক অদ্ভুত স্বভাবের মেয়ে। এখন তার বয়স হবে বছর এগারো, কিন্তু তিন বছর বয়স থেকেই তার মা-সরস্বতীর সাধনা সুরু হয়েছে। আনন্দস্বামী নামে এক অসাধারণ পণ্ডিত—আমরা তাঁকে স্বামীজী বলি, এই গ্রামে আসেন, গ্রামের মেয়েদের অন্তরে শৈশব থেকেই শিক্ষার দীপটি জ্বেলে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু গ্রামবাসীর সাড়া তিনি পেলেন না, মেয়েরা ভয়ে তাঁর আশ্রমের ত্রিসীমায়ও যেতে চাইল না। এগিয়ে গেল আমার মেয়ে সাধনা—তিন বছর বয়সে। সেই থেকে তার শিক্ষা সেখানেই চলেছে। আর বাড়ীতে সাধনাই আমার পাঁচ বছরের বাচ্চা ছেলে সুধীরকে নিজে পড়ায়।

আমার স্ত্রী তিন মাসের ছেলেটিকে রেখে যখন চোখ বুজলেন—সাধনা তখন সাত বছরের মেয়ে। শুনে অবাক হবেন—সেই বয়সেই ভাইটির ভার নিয়ে সে তাকে লালন করে আসছে। তারপর, পড়া ছাড়া ঘর-সংসারের কাজকর্মও সাধনাকে করতে হয়। সংসারে দূর সম্পর্কের ওর এক পিসি ছাড়া আর ত কেউ নেই।

কানাইবাবু বললেন: বটে! তাহলে ত আপনার মেয়ে সাধনার সঙ্গে আমাকে ভাব করতেই হবে। হ্যাঁ, এখন আমার এই অনুরোধ আপনার কাছে মথুরবাবু, সাধনাও যাতে তার ভাইটিকে নিয়ে এখানে এসে পড়ে, সে ব্যবস্থাটি আপনাকে করতেই হবে। বেশত, স্বামীজীর কাছে যেমন ওরা পড়ছে পড়ুক; তবে এখানেও ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করতে থাকুক। আমি তাহলে ভারি খুসি হব মথুরবাবু!

মথুরবাবু একটু ভেবে তারপর বললেন: বেশ তাই হবে। আমি সাধনাকে একথা বলব চৌধুরী মশাই।

চৌধুরী মশাই গলায় জোর দিয়ে বললেন: বলা নয় মথুরবাবু, ওদের এখানে আসা চাই-ই। ওরা না এলে আমি বুঝব যে, আমার পাঠশালা এখানে খোলাই বৃথা হয়েছে।

সত্যই অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে এই সাধনা। তার স্বাস্থ্যপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ, সুশ্রী কমনীয় মুখ, টানা টানা ডাগর-ডাগর দুটি চোখ একটিবার দেখলেই মনে হয়—প্রতিভার আভা যেন ফুটে বেরুচ্ছে। সে-যুগের ঋষি-কন্যাদের আদর্শে শৈশব থেকে তার

জীবন গঠিত, কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত। রাত্রির শেষকালে যখন শুক্র তারকাটি আকাশ পথে উজ্জ্বল আভা বিকীর্ণ করতে থাকে, সাধনা ঠিক সেই সময় শয্যা থেকে উঠেই প্রাতঃকৃত্য সেরে গুরুর নির্দেশ মত শরীর চর্চ্চা, স্তব স্তোত্রপাঠ ও পুষ্প চয়নে প্রবৃত্ত হয়। তখন থেকেই সে আরম্ভ করে তার দৈনন্দিন কাজের ধারাগুলি। সেই থেকে এক প্রহরের মধ্যেই আশ্রম থেকে দিনের পাঠ সাঙ্গ ক'রে গৃহে ফিরে আসে। কলের মত চলে তার প্রতি কাজ পর পর।

সেদিন সকালে স্বামীজীর আশ্রমে গিয়ে পাঠারম্ভের প্রাক্কালে সাধনা সবিনয়ে বলল : দাদু, জমিদার-বাড়ীতে যে পাঠশালা বসেছে, সেখানে পড়তে যাবার জন্যে আমার ডাক পড়েছে। কর্তার একান্ত ইচ্ছা, সেখানে গিয়ে পড়ি। কি করি বলুন ত ?

স্বামীজী সহাস্যে বললেন : বেশত, যাওনা—ক্ষতি কি ? এখানকার পড়া ত তোমার সকাল সন্ধ্যায় ; এ পড়ায় ত আর বাধা পড়ছে না।

সাধনা : কিন্তু ওখানে কি পড়ব ?

স্বামীজী : এখানে যা পড়ছ, তাই পড়বে। পড়ার জন্যে ডাকলে, না বলতে নেই—এ কথাটাও মনে রেখ।

সেইদিনই সাধনা ছোট্ট ভাইটি সুধীরকে সঙ্গে নিয়ে বড়বাড়ীর পাঠশালায় পড়তে গেল। প্রকাণ্ড দালান, নীচে

মস্ত উঠান। দালানের একদিকে বালক, অন্যদিকে বালিকারা সার দিয়ে বসেছে। বয়স তাদের পাঁচ ছয় থেকে আরম্ভ করে বড় জোর বারো তেরো বছর পর্য্যন্ত। ছেলেদের দিকে সামনে বসেছেন শীর্ণ দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ শিক্ষক যদু পণ্ডিত, মাথায় লম্বা টিকি, ক্ষৌরিত মুখমণ্ডল। আর মেয়েদের দিকে যিনি উপবিষ্ট, তাঁর নাম রামচন্দ্র শর্ম্মা, একমুখ পাকা দাড়ি, মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলিও শনের মত শাদা, সৌম্যমূর্ত্তি, বর্ষীয়ান পুরুষ।

মথুরবাবুর পুত্র-কন্যা পাঠশালায় প্রথম ভর্ত্তি হতে এসেছে শুনেই বড়বাড়ীর সকলে ভীড় করে দেখতে এলো। এর কারণ, এই মেয়েটির সম্বন্ধে লোকে অনেক কথাই শুনে এসেছে। সেরেস্তা থেকে আমলারা পর্য্যন্ত উঠানে এসে দাঁড়ালেন। প্রিয়ভৃত্য শিবুর মুখে খবর শুনে কৌতূহলী হয়ে কানাই চৌধুরী পর্য্যন্ত বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে উঠানের উপরে লম্বা রোয়াকটির উপরে এগিয়ে এলেন—এখান থেকে একটু দূরেই তাঁর নিজের বৈঠকখানা।

সুধীরকে ছেলেদের দিকে পাঠিয়ে সাধনা মেয়েদের সারিতে সবার পিছনে গিয়ে বসল। পণ্ডিত শর্ম্মা মশাই তাকে দেখেই কাছে ডেকে নিলেন। কিন্তু পরীক্ষা না ক'রে ত আর নাম লিখতে পারেন না—তাই জিজ্ঞাসা করলেন: কদ্দূর পড়েছ খুকী?

সবিনয়ে সাধনা উত্তর দিল: পড়ছি ত অনেক দিন। কিন্তু এখানে কি পড়ব দয়া করে বলে দিন।

কথা শুনে খুসি হলেন পণ্ডিত। বললেন: স্বামীজীর কাছে যা পড়ছ, তাই পড়! কথামালা, বোধোদয়, চারুপাঠ—এর মধ্যে কোন্ বইখানা এনেছ?

মৃদু স্বরে সাধনা বলল: ওসব বই পড়া হয়ে গেছে কি না, তাই আনিনি।

শর্মা পণ্ডিত বিস্ময়ের স্বরে বলে উঠলেন: ও-তিনখানাই শেষ হয়ে গেছে? বল কি? তাহলে বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস?

তেমনি শান্ত কণ্ঠে সাধনা উত্তর করল: অনেক আগেই সীতার বনবাস বইও পড়া হয়ে গেছে।

পণ্ডিত মশাই: আর কি কি বই পড়েছ?

সাধনা: বানভট্টের কাদম্বরী, পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, কপালকুণ্ডলা, রাজসিংহ, রামায়ণ, হরিবংশ, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার, মাইকেলের মেঘনাদ বধ, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি—আরো অনেক।

পণ্ডিত মশাই: এখন তাহলে কি পড়ছ?

সাধনা: ভট্টি।

পণ্ডিত মশাই: ওকি বাঙলা?

সাধনা: আজ্ঞে না—সংস্কৃত।

পণ্ডিত রামশর্মার দুই চক্ষু এবার কপালের দিকে ঠেলে উঠল! ও-পাশ থেকে যদু পণ্ডিতও এগারো বারো বছরের এই মেয়েটির মুখে তার পাঠ্য-বইগুলির নাম শুনছিলেন।

পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে জানা নেই, কিন্তু এই যুগল পণ্ডিতের পিতৃদেবের সঙ্গে যে সংস্কৃত বিদ্যার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না এবং এঁরাও ও রসে বঞ্চিত, সে সম্বন্ধে উভয়েই ছিলেন নিঃসন্দেহ।

রাম শর্মার মুখ দিয়ে আর কথা নির্গত হলো না। ইতিমধ্যেই সাধনা তার দপ্তর খুলে কথিত যে চারখানি বই সামনে সাজিয়ে রাখছিল, তাঁর নির্বাক দৃষ্টি সে দিকেই নিবদ্ধ হলো। এই চরম অবস্থায় গৃহস্বামী কানাই চৌধুরী মহাশয় দালানের সামনে এগিয়ে এসে সময়োচিত ব্যবস্থা দিয়ে পণ্ডিত মশায়ের মুস্কিল আসান করে দিলেন।

কানাই চৌধুরী : এখন বুঝতে পারা গেল, সাধনা-মা কেন এ পাঠশালায় পড়তে আসতে চাইতেন না। আজ ওঁকে পীড়াপীড়ি ক'রে আনিয়ে আমরাই বোকা ব'নে গেলাম। কিন্তু তাহলেও, তোমার কেতাবের নাম শুনে ঘাবড়ে যাবার পাত্র অন্ততঃ আমি নই মা! ঐ বই পড়েই আমাদের মনের ধোঁকা কিন্তু কাটিয়ে দেওয়া চাই।

সাধনাও তেমনি মেয়ে, অবস্থাটা সে বুঝেই উদ্দেশ্যে স্বামিজীকে প্রণাম জানিয়ে অসঙ্কোচে পাঠ সুরু ক'রে দিল। চণ্ডী থেকে একটি অধ্যায় প'ড়ে সরল বাংলায় বুঝিয়ে দিল, গীতার কর্মযোগ প'ড়ে তার সারমর্ম এমন সরল ক'রে বলল যে, শুনে সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। এক দিনের এই ব্যাপার থেকেই মধুমতী গ্রামে সাধনা বিখ্যাত হয়ে গেল।

এরপর কানাই চৌধুরী ব্যবস্থা দিলেন : তোমার আসা কিন্তু বৃথা হবে না সাধনা। তবে তুমি এখানে ছাত্রী হয়ে এলেও ছাত্রীদের পড়ার ব্যাপারে পণ্ডিত মশাইকে সাহায্য করবে, আর খানিকটা সময় আমার কাছে ব'সে তোমার ঐ সংস্কৃত পুঁথি প'ড়ে শোনাবে।

এই ব্যবস্থার ফলে কানাই চৌধুরী সাধনার অসাধারণ গুণের বিভিন্ন দিকগুলির পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। মাস খানেকের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, এতদিন পরে এই সাধনা মেয়েটি তাঁর সুপ্ত পিতৃত্বকে নাড়া দিয়ে যেন সজাগ করে তুলেছে। এই মেয়েটীর সেবা, যত্ন, আন্তরিকতা এবং সেগুলির সঙ্গে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভামণ্ডিত চিত্তের বিকশিত আভায় তিনি বুঝি জীবনের পূর্ণতা খুঁজে পেলেন। এর আগে প্রায়ই তাঁর অতৃপ্ত অন্তর থেকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন উঠত—এ ঐশ্বর্য ভোগ করবে কে? কিন্তু সাধনাকে এই ভাবে নিকটে পেয়ে বুঝি সে প্রশ্নের উত্তরও পরে খুঁজে পেলেন এবং সেই সঙ্গে সাব্যস্ত করলেন যে, তাঁর স্নেহময় হৃদয় দিয়ে সাধনাকে আপনার ক'রে নেবেন।

দুই

এমনি অবস্থায়—দীর্ঘকাল থেকে সংস্রবহারা তাঁর একমাত্র ভগিনী নীরদার এক পত্র এসে তাঁর স্নেহস্নিগ্ধ অন্তরে দিল এক প্রচণ্ড দোলা। তরুণ যৌবনে পিতামাতা বর্তমানে কানাই চৌধুরীর দুর্গত জীবন যখন নানাভাবে বিপন্ন—সেই দুর্দিনে ভিটে বাড়ী বাঁধা দিয়ে কলকাতার বড় এক ব্যবসায়ীর ছেলের সঙ্গে ভগিনী নীরদার বিবাহ দেওয়া হয়। কিন্তু বিবাহের পর সে ছেলে শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক কাটিয়ে কিছুকাল চুটিয়ে বড় মানষী করে, তারপর সর্ব্বহারা হয়ে সস্ত্রীক সহর ছেড়ে চলে যায়! এতকাল পরে সেই ভগিনী তাঁকে লিখেছেন:

"দাদা, শুনেছি তুমি নাকি এখন মস্ত বড় লোক হোয়েছ, জমিদারী, কলিয়ারী, টাকা কড়ি, গাড়ী জুড়ি অনেক কিছুই করেছ। এতদিন তোমার সন্ধান পাই নি। তুমিও কোন খোঁজ-খবর আমাদের নাওনি। সংসারে একমাত্র ছেলে "খোকা" ছাড়া আমারও আর কোন সম্বল নেই। নিজের জন্য বলি না, অজানা অসহায় ভাগ্‌নেটার ভার যদি নাও, আমি তাহলে সুখে মরতে পারি। তোমার অভাগিনী বোন—নীরদা।

চিঠি পেয়ে তড়িৎস্পৃষ্টের মত আড়ষ্ট হয়ে পড়েন কানাই চৌধুরী!...তাইত! নীরদা বেঁচে আছে। তার খোকা—আমার ভাগ্‌নে! ও—ভগবান! তাহলে ভোগ করতে আরও

একজন আছে !···কিন্তু খোকা···কত বড় সে, কেমনটি, কত বয়স, কে জানে।···সঙ্গে সঙ্গে সামনে ভেসে ওঠে সাধনার কমনীয় রূপশ্রী, দেবীর মত অপূর্ব দেহ-মাধুরী।

সেই দিনই সাধনাকে বলেন কানাই চৌধুরী—জানো মা, আমার এক বোন আছে, তার নাম নীরদা ; তার ছেলে আমার ভাগ্‌নে। আমি তাদের আনতে যাচ্ছি।

সাধনা সোল্লাসে বলে : তাই নাকি জ্যেঠাবাবু ? কোথায় তাঁরা থাকেন ? কবে আসবেন ? এখানেইত থাকবেন বরাবর ? ···এক সঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করে বসে সাধনা আনন্দের উদ্দীপনায় !

কানাই চৌধুরী বললেন : হ্যাঁ মা, তারা এখানেই থাকবে। আগে ত আনি। এখন তারা বজবজে থাকে। আমি কাল সকালেই যাচ্ছি তাদের আনতে।

সারা পথ ভাবতে ভাবতে যান কানাই চৌধুরী—কি অবস্থায় দেখবেন নীরদাকে···তাঁর সেই আদরিণী বোন নীরো ! আরো বেশী ভাবনা জাগে মনে—নীরদার ছেলেটি কেমন··· কি রকম···কত বড় সে ?···তার খোকার কথার সঙ্গে কেন যে সাধনার নামটি আপনি এসে পড়ে কে জানে ! কিন্তু নীরদার খোকা কি সত্যিই খোকা···না, ঐ তার নাম ? কে জানে ?

ঠিকানা ধরে বজবজ মিলের শ্রমিক লাইনে উপস্থিত হন কানাই চৌধুরী। লাইনের একাংশে কলের বাবুদের বাসা। নীরদার স্বামী এখানকার পাটের কলে কেরাণীর কাজ করতেন।

একটা ফাঁকা জায়গায় কাঠের ডান্-গুলি খেলছিল কতক-গুলি ছেলে। তাদের পরণে ময়লা ছেঁড়া প্যাণ্ট, খালি গা, পায়ে জুতো নেই, দু'তিনজনের গায়ে গেঞ্জি বা হাফ্সার্ট আছে—তাও ছিন্ন ও মলিন। হঠাৎ খেলতে খেলতে কি একটা দান নিয়ে তাদের মধ্যে কলহ বেধে গেল, তার পরেই হাতাহাতি এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ। কানাই বাবু এগিয়ে গিয়ে থামিয়ে দিলেন। যে ছেলেটির বেশী রোখ, খেলার ডাণ্ডাটি অন্যের হাতে থাকলেও সে রিক্ত হস্তেই ঘুসি পাকিয়ে সবেগে ছুটছিল ডাণ্ডাধারী ছেলেটিকে আক্রমণ করবার উদ্দেশ্যে। কানাইবাবু ক্ষিপ্রহস্তে তাকে ধরে ফেলে স্নেহের সুরে বললেন : ছি—খোকা! খেলতে খেলতে কি মারামারি করতে আছে?

ছেলেটি কিছুতেই বাগ মানবে না—হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে চায়। কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বী কানাইবাবুর মুখে 'খোকা' সম্বোধনটি শুনেই হো হো করে হেসে বলে উঠল : খোকাকে দোলায় শুইয়ে দিন স্যার—দুধু খাবে।

ধৃত ছেলেটি তখন চীৎকার করছে : ছাড়ুন বলছি—ভালো হবে না।

আর একটি ছেলে এই সময় শ্লেষের সুরে বলল : সত্যি স্যার, ও শালা সত্যিই খোকা—দিননা গালে দুটো থাপ্ড়া…

কানাইবাবুর বুকটা হঠাৎ ছাঁৎ করে উঠল। তিনি সেই দুটি ছেলেকে ধমক দিয়ে ধৃত ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে বললেন :

ছি—থামো। চটছ কেন? আমিত কিছু বলিনি। আচ্ছা, এখানে রজনী রায়ের বাসা কোথায় জান?

দূরের ছেলেটিই খপ্ করে জবাব দিল: ঐ খেড়ে খোকার বাবা স্যার—পটল তুলেছে গেল বছর···

প্রশ্ন শুনেই ধৃত ছেলেটি কানাইবাবুর মুখের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে এতক্ষণ চেয়ে ছিল। এখন বলল: আপনি?

কানাইবাবু: তোমার নাম কি সত্যিই খোকা? তুমি কি তাহলে রজনীর ছেলে?

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে স্বীকার করল। কানাইবাবু পুনরায় তাকে প্রশ্ন করলেন: আচ্ছা, নীরদা তাহলে—

ছেলেটি এখন উৎফুল্ল মুখে বলে উঠল: আমার মা। আপনি কি তাহলে আমার মামাবাবু—মার চিঠি পেয়ে··

কানাইবাবু এখন দৃঢ় হস্তে খোকাকে কোলে তুলে নিয়ে সহর্ষে বললেন: হ্যাঁ বাবা, আমি তোমার পাষণ্ড মামা। আমাকে নিয়ে চল তোমার মায়ের কাছে।

সেই লাইনে খোলার দু'খানি ঘর নিয়ে নীরদার ক্ষুদ্র সংসার। স্বামীর মৃত্যুর পর একখানি ঘর ছেড়ে দিয়েছেন; এখন—একখানি ঘরই সম্বল। মিল থেকে সামান্য মাসোহারা আর বাবুদের সাহায্যে কোন রকমে দিন চলে। কানাইবাবু ভেবেছিলেন, নীরদা অসুস্থা; কিন্তু সুস্থ অবস্থায় তাঁকে দেখে আশ্বস্ত হলেন। ভগিনীর দুঃখের বেদনা আচ্ছন্ন করে এই আনন্দই তাঁকে অভিভূত করল যে, নীরদার খোকা সত্যই

দুগ্ধপোষ্য খোকা নয়—গেল বৈশাখে ১৪ বছরে পড়েছে—দিব্য স্বাস্থ্যবান, নধর কান্তি, হৃষ্টপুষ্ট, প্রিয়দর্শন ছেলে।

কিন্তু একটি বিষয়ে তিনি দমে গেলেন—শিক্ষা ও সাহচর্য্যের দিক দিয়ে খোকার দৈন্য খুবই মর্মান্তিক ; বয়সের তুলনায় শিক্ষার পথে অনেক পিছিয়ে আছে, কুসংসর্গের ফলে প্রকৃতিও অনম্র ও রূঢ় হয়ে উঠেছে। করপোরেশনের প্রাইমারী বিদ্যালয়ে সামান্য কিছু পড়াশোনা করেছে সে। জিজ্ঞাসা করতে খোকাই বলল : কথামালা পড়ি—একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল···আর, ইংরিজী বি-এল-এ-ব্লে···

কানাইবাবু বললেন : মধুমতীতে গিয়ে তোমাকে ভালো ভাবে পড়াশুনা করতে হবে। আর তোমার খোকা নামটি বদলাতে চাই।

মামার দিকে প্রখর দৃষ্টিতে চেয়ে ছেলেটি বলল : বা-রে, তাহলে আমাকে সবাই কি বলে ডাকবে ?

মৃদু হেসে কানাইবাবু বললেন : নাম একটা দেওয়া যাবে বৈকি ; বেশ, সে নাম এখনি দিচ্ছি—আজ থেকে তোমার নাম হলো—নিতাই।

নীরদাও সহাস্যে বললেন : বেশ মানাবে আর মিলবে। মামা কানাই, ভাগ্নে নিতাই।

বজবজ বাজার থেকে ভগিনী ও ভাগনের জন্যে কাপড়-জামা ইত্যাদি আনিয়ে—দেনা পত্র সব চুকিয়ে যখন তাদের নিয়ে কানাইবাবু সেই বস্তী থেকে বেরুলেন—দুধারে লোক জমে

গেছে দুঃখিনী নীরদার সৌভাগ্য দেখবার জন্যে। মেয়েরা বলছে : ছেলের হাত ধরে ভাগ্যধরী হয়ে চললে দিদি রাজা ভাইয়ের রাজপুরীতে !

সাধনার কথা কানাইবাবুর মুখে পথেই শুনেছিলেন নীরদা সেই সঙ্গে ছেলে নিতাইও। এখন স্বচক্ষে বড় বাড়ীর বিশাল আয়তন দেখে এবং অতুল ঐশ্বর্যের নিদর্শন পেয়ে নীরদা, যেমন চমৎকৃত হলেন, তেমনি সাধনার প্রতি কানাই বাবুর গভীর স্নেহ-প্রীতি এবং এ বাড়ীতে এই অনাত্মীয়া মেয়েটির প্রতিপত্তি দেখে তেমনই ঈর্ষায় মুষড়ে পড়লেন।

সাধনার সঙ্গে নিতাইয়ের চোখোচোখী হতেই কানাইবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন : এই আমার ভাগনে নিতাই। বেশ বাড়ন্ত, আর খুব দুরন্ত, কিন্তু পড়াশোনায় নিতান্ত কাঁচা—যাকে বলে গবাকান্ত ! তোমাকেই এর শিক্ষার ভার নিতে হবে সাধনা !

নিতাইকেও কানাইবাবু বললেন : এই সাধনার কথাই পথে বলেছিলুম। এর পড়া শুনলে অবাক হয়ে চেয়ে থাকবে।

কথাটা শুনেই নিতাই চমকে উঠে চোখ পাকিয়ে সাধনার পানে তাকাল, সেইসঙ্গে তার মনের মধ্যে মামার মন্তব্যটা মোচড় দিয়ে জানাল—ধ্যেৎ ! মামা বলে কি ? আমার চেয়ে কত ছোট, তায় মেয়েছেলে—আমাকে পড়াবে ? নিতাইয়ের হাতখানা নিস্‌পিস্ করতে থাকে ; বজবজে এ-রকম কত মেয়েকে সে চাঁটি মেরে দুরস্ত করেছে।

. ওদিকে ভগিনী নীরদার মনেও বিষের জ্বালা ধরেছে —দাদার যেমন কথা! বেটা ছেলে, একরত্তি মেয়ের কাছে খাটো হয়ে থাকবে—কোথাকার উনি বিদ্যা-ঠাকরুণ গো?

মা ও ছেলের মনে মনে এই নীরব মন্তব্য যখন তাল গোল পাকাতে থাকে, কানাইবাবু সেই সময় নীরদাকে বললেন: এই আমাদের সাধনা নীর! এরই কথা আসবার সময় পথেই বলেছিলুম। বিদ্যেয় মা আমার সরস্বতী; ওর পড়া শুনলে বুঝবে, এ বয়সে কত শিখেছে।

কেউ প্রশংসা করলে সাধনা অস্থির হয়ে ওঠে, নিজেকে তখন অত্যন্ত বিপন্না জেনে অন্য কথা পেড়ে আত্মপ্রশংসার প্রসঙ্গটা চাপা দেয়। কানাইবাবুর কথার পীঠেই সে তাঁকে শুধালো: আচ্ছা জ্যেঠামণি, ইনি যখন আপনার বোন, আমি ত তাহলে এঁকে পিসিমা বলতে পারি?

প্রসন্ন মুখে কানাইবাবু বললেন: নিশ্চয়ই, নীরকে তুমি পিসিমাই বলবে। কথার সঙ্গেই নীরদার দিকে চেয়ে বললেন: সাধনা আমাকে জ্যেঠামণি বলে কিনা; ওর বাবার চেয়ে আমি বছর কয়েকের বড়ই হবো—

· 'তাহলে আমার উচিত আপনাকে প্রণাম করা।' বলেই সাধনা এগিয়ে গিয়ে নীরদার সামনে বসে হেঁট হয়ে প্রণাম করল। কানাই বাবুও এই সঙ্গে তার ভক্তির আদানে আপ্যায়িত হলেন।

ভক্তি নিবেদনের পর সাধনা উঠে দাঁড়াতেই কানাইবাবু সহাস্যে বললেনঃ এ সুবাদে নিতাইও তোমার দাদা হচ্ছে সাধন-

সপ্রতিভ কণ্ঠে সাধনা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বলল: ভালোই ত; আমি ওঁকে নিতাই দা বলব। আমার ওপর ঠাকুরের কি দয়া দেখুন জ্যেঠামণি, দাদা বলতে কেউ ত ছিলেন না, তিনিই এনে দিলেন।

কেন কে জানে, কানাইবাবুর মুখে সাধনার প্রসঙ্গ শুনে অবধি নীরদা ঠাকরুণ সেই যে মুখভার করেছিলেন, সে মুখে এ পর্য্যন্ত আর হাসি ফোটেনি; তারপর তাঁর ছেলেকে হেনস্তা করে তার পড়ার ভার এই একরত্তি মেয়েটার ওপর দাদা দিতে চান শুনে সে গাম্ভীর্য আরও গাঢ় হয়ে ওঠে। এমন কি, সাধনা তাঁর সঙ্গে পিসিমা সম্পর্ক পাতিয়ে প্রণাম করলেও তাঁর মুখ থেকে একটা কথাও নির্গত হয় নি। কিন্তু নিতাই-প্রসঙ্গে এই কথাগুলি সাধনার মুখে শুনেই তিনি মুখখানি ঈষৎ মুচকে বলে উঠলেনঃ অ-মা, এই বয়সে মেয়েটি ত বেশ পাকা পাকা কথা বলতে শিখেছে দেখছি!

উল্লাসের সুরে কানাইবাবু বললেন: তবে বলছি কি— কথা ওর শুনবে পরে। শুধু কথা নয় নীর, হেন কাজ নেই, সাধনা যেটা না জানে। বেশী কি বলবো—আমার নিজের জন্যে কি দরকার, কোন্ জিনিষটি না হোলে আমার অসুবিধে হয়, দু'বেলা খাওয়ার সময় কোন্ রান্নাটি আমার ভালো লাগে,

সাধনা মা'র সে সবই জানা আছে। এতবড় বাড়ী, মহলের পর মহল, কত ঘর দালান, য়্যাদ্দিনে ভুতের বাসা হোত ; কিন্তু সাধনার জন্যে প্রত্যেকটি ঝক্ঝক্ তক্তক্ করছে। এক পাল ঝি-চাকর থাকতেও ওদের আমলে যে হাল হয়েছিল বাড়ীর— কি বলবো ? সাধনা মার সঙ্গে জানা শোনা হোতে, ওরই দেখা-শোনার জন্যে সে ভোল বদলে গেছে, এখন রান্নাঘরের রাঁধুনী থেকে চাকর-চাকরাণী মজুরাণী কারুর সাধ্যি নেই যে ফাঁকি দেবে! এত গেল গেরস্থালীর কথা ; এরপর কারুর অসুখ-বিসুখ হোলে, মা আমার ছুটে এসে বুক দিয়ে পড়বেন—তা সে আমিই হই, আর চাকর-চাকরাণীদেরই কেউ হোক, সেখানে সেবা শুশ্রূষার বাছ্‌বিচার ওঁর নেই। অথচ নিজেদের সংসার আছে, মা নেই, আর পোষ্যও অনেকগুলি ; ওকেই সব দেখতে হয়। তারপর নিজের পড়া আর এক পাল মেয়েদের পড়ানো ; সে সব রেখে এ বাড়ীর ভারটিও কিভাবে ওঁকে নিতে হয়েছে, সে ত শুনেছ।

নীরবেই শুনছিলেন নীরদা, কিন্তু কথাগুলো যেন কাঁটার মত বিঁধছিল তাঁর দুটি কানে। আড়চোখে এক একবার আলোচ্য মেয়েটির পানে তাকান, আর ভাবেন—ছুঁড়ি দেখছি দাদাকে গুণ করেছে, নৈলে এমন করে ওর গুণের ব্যাখানা করেন ? আচ্ছা—দাঁড়াও, আগে জেঁকে বসি এ ভিটেয় ; তারপর তোমাকে যদি বিল্বিপত্তর শুঁকিয়ে সরাতে না পারি ত আমার নীরদা নামই মিথ্যে।

এদিকে কানাইবাবুর কথা থামতেই সাধনা খপ্ করে নীরদাকে উদ্দেশ করে আবদারের সুরে বলল : আপনি যখন এসেছেন পিসিমা, এ বাড়ীর ভারটি আপনি হাতে করে নিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করুন। আপনারা আসাতে আমার যে কি আনন্দ হয়েছে। বাড়ীতে গিয়েও সোয়াস্তি পাই না, রাতে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাতে পারি না, এত বড় বাড়ীতে জেঠামণি একলা, এই ভাবনায়—

নীরদা বাধা দিয়ে বললেন : একলা বলছ কেন বাছা, এক পাল ঝি-চাকর যাঁর মাইনে করা রয়েছে, তাঁর জন্যে ভাবনার কি আছে ?

হাসিমুখে সাধনা জবাব দিল : আছে বৈকি পিসিমা, মাইনে করা লোকজন সবাই কি আঁতের টানে দরদ দিয়ে দেখে ? ঘুমোলে ওদের জ্ঞান থাকে না ; সারাদিন খাটা খাটুনীর পর বিছানায় শুলেই অজ্ঞান। আপনার জন কি তা পারে ? এই আপনি এসেছেন, নিতাই দা থাকবেন কাছে, জ্যেঠামণির আর কোন অসুবিধাই হবে না, আমিও বেঁচে গেলুম।

মাথা নেড়ে কানাইবাবু হাসতে হাসতে বললেন : ও কথা বলে তোমার কিন্তু সরে যাওয়া চলবে না সাধনা—এখন থেকেই সেটা বলে রাখছি। নীর আমার বোন, তুমিও ওকে পিসিমা বলেছ, ভার নেবার যা নিক ও, কিন্তু তোমার কাজ ঠিক থাকবে। এই যে ও বাড়ীতেও হালে এক পিসিমা তোমার

এসেছেন—সংসার তিনি মাথায় করে নিয়েছেন শুনেছি, কিন্তু তা বলে কি সব ছেড়ে ছুড়ে দিতে পেরেছ—বলো ?

নীরদা এই সময় জিজ্ঞাসা করলেন : আপনার পিসি ?

কানাইবাবু বললেন : সাধনার সেই পিসির গল্পটা তোমারও শোনা উচিত নীর, তাহলে তুমি সাধনাকে আরো ভালো করে বুঝতে পারবে। ওর সেই পিসি এই গাঁয়েরই মেয়ে, গ্রাম সুবাদে সাধনার বাবাকে ছেলেবেলায় দাদা বলতেন তিনি ; নাম হোচ্ছে—কালিদাসী। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে সুখীই হয়েছিলেন, স্বামী ভালো চাকুরী করতেন, ছেলে পুলে অবিশ্যি হয়নি তাঁর। বছর দুই আগে বরাত ভেঙে যায়, বিধবা হন। তারপর তাঁর শ্বশুরও মারা পড়েন। তখন কালি-দাসীর আর কষ্টের অন্ত থাকে না। ভাসুর, দেওর ও জায়েদের কাছে যেন বোঝা হয়ে পড়েন। কথায় কথায় উনি নাকি সাধনার বাবার সুখ্যাতি করতেন তাদের কাছে, বিশখানা গাঁয়ের লোক তাঁকে কলির যুধিষ্ঠির বলেন, কত তাঁর সুনাম সুখ্যাতি। শ্বশুর যতদিন বেঁচে ছিলেন, কালিদাসীকে কেউ হেনস্তা করেনি। তিনি যেতে সবাই নিজ মূর্ত্তি ধরলেন ; একদিন স্পষ্টই তাঁকে বললেন—'আর কেন, স্বামী-শ্বশুর দু'য়ের মাথাইত খেয়েছ, এখন মানে মানে বাপের বাড়ীতে গিয়ে ওঠ।' কালিদাসীর স্বভাব খুব নম্র ; নরম হয়ে বললেন—'বাপের ভিটেয় কেউ যদি থাকত, তাহলে কি তোমাদের গলগ্রহ হয়ে থাকি ? কিন্তু আমার যে ও কুলে কেউ নেই।' এর উত্তরে

ওঁরা বললেন—'কেন তোমার যুধিষ্ঠির ভাই ত রয়েছে, জাঁক-জমক করে কত বড়াই করতে—তার কাছেই যাও না।' এর পর এমনি ব্যাভার তাঁরা করতে লাগলেন যে, একদিন সত্যি সত্যিই কালিদাসী শ্বশুরের ভিটে থেকে বিদেয় নিয়ে চলে এলেন এ গ্রামে। সন্ধ্যার সময় পথের ধারে পাড়ার পুকুরঘাটে চাতালের ওপর অবসন্ন হয়ে বসেছেন—কতকাল পরে জন্মস্থানে এসেছেন ; কেউ চিনতে পারল না, কিন্তু তাঁকে ঘিরে শুনতে লাগল দুঃখের কথা। আমাদের সাধনা মাও ঠিক সেই সময় গা ধুতে ঘাটে গিয়েছেন। কিন্তু যেই বুঝলেন মানুষটি কে, আর কি অবস্থায় তিনি পড়েছেন, তখনই ছুটে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে, তারপর হাত দু'খানা ধরে তুলে বলেন—'আপনি ঠিক জায়গায় এসেছেন পিসিমা, কিন্তু আপনার বাড়ীতে না গিয়ে ঘাটে বসে দুঃখ করছেন কেন বলুন ত—চলুন।' কালিদাসী ত অবাক, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকেন। তখন পাড়ারই এক মেয়ে তাঁকে জানিয়ে দিলেন—'তুমি যে যুধিষ্ঠির ভাইয়ের কথা বলছিলে, তাঁর মেয়ে সাধনা। দেখ ঠাকুরের কি দয়া, তুমি আসবে জেনেই ও যেন তোমাকে নিতে এসেছে।' সাধনা তখন কি বলেছিল জান নীর—আমি সে কথা ওর বাবার মুখে শুনেছি, আর মনে করে রেখেছি। ও পিসিকে প্রবোধ দেবার ছলে বলে—'মানুষের ইচ্ছেয় কি কিছু হয় পিসিমা, যা করবার তিনিই করেন। জানেন, আমার বাবার বড় দুঃখ—মা নেই বলে আমাকে দেখতে কেউ নেই;

অথচ আমি নাকি সবাইকে দেখে বেড়াই। স্বর্গ থেকে আমার মা'ও হয়ত এই কথা ভাবেন। ওঁরা হচ্ছেন পুণ্যাত্মা, তাই ঠাকুর ওঁদের ইচ্ছা পূর্ণ করতেই আপনাকে এনেছেন।'

সাধনা কথাগুলি শুনতে শুনতে ঘাড়টি বেঁকিয়ে বলে উঠলো: জ্যেঠামণি, আপনি কি সব কথা মুখস্থ করে রেখেছেন?

সহাস্তে কানাইবাবু জবাব দিলেন: দামী কথা কানে এলেই যে মুখস্থ হয়ে যায় সাধনা মা, তুমি ত বাজে কথা বল নি, যা বলেছিলে, প্রত্যেক কথাটাই দামী, তাই মনে ধরে রাখি—ভুলতে দিই না!

এরপর নীরদার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে কানাইবাবু বললেন: হ্যাঁ, যা বলছিলুম—সাধনার সেই পিসির মুখে এখন সাধনার সুখ্যাতি ধরে না। বলেন—'আমার হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে নিজে করবে, একাদশীর দিন ঠায় আমাকে বসিয়ে রাখবে, আর কথায় ত ওর সঙ্গে পারবার জো নেই, যা ধরবে তা করবেই। এত যত্ন আমি জীবনে কখনো পাইনি, এমন মেয়েও কখনো দেখিনি।' তাই বলি নীর, তুমিও আমার সাধনা মাকে বুঝে আপনার করে নিও, তোমার মুখেও আমি যেন এমনি সুখ্যাতি শুনি।

ভগিনী ও ভাগনেকে নিয়ে বড় বাড়ীতে প্রবেশ করতেই পূজার দালানের সামনে সাধনার সঙ্গে সকলের দেখা হয়ে যায়। কানাইবাবুও এই সুযোগে এদের প্রাথমিক পরিচয়-পর্বটি শেষ

করে দিলেন। সাধনার প্রকৃতি তাঁর অজানা নয়; কোথায় তার আনন্দ, কিসে বিরাগ, তিনি সে সব ভালোভাবেই জানেন। আর, ওদিকে অনেকদিন ছাড়াছাড়ি হলেও ভগিনীর প্রকৃতির সঙ্গে কিছু না কিছু পরিচয় ত তাঁর আছেই, তারপর যে কদর্য পরিবেশে দীর্ঘকাল তাঁর সাংসারিক জীবনযাত্রা অতি-বাহিত হয়েছে, নিজের চোখেই ত তার কিছুটা দেখে এসেছেন, বিশেষতঃ মাতা-পুত্রের স্বভাব, তাদের কথাবার্তা ও চালচলনে ইতিমধ্যেই যতটুকু জেনেছেন, সাধনার মত মেয়ের সঙ্গে এদের গরমিল হওয়াও অসম্ভব নয় বুঝেই তিনি গোড়াতেই সাধনার কথাটা বিশদভাবে মা ও ছেলে উভয়কেই শুনিয়ে দিলেন—এই মেয়েটিকে নীরদা মায়ের স্নেহ দিয়ে আপনার করে নেবেন, এই আশায়।

কিন্তু তাঁর এ আশা মনেই থেকে গেল। গোড়া থেকেই নীরদা এই মেয়েটির সম্বন্ধে যে ভুল ধারণা করেছিলেন, তাঁর মন থেকে তা মুছল না। সাধনাও বুঝেছিল, এদের মনে গলদ কোথায়, আর কি জন্যে! সে তার বুদ্ধিদীপ্ত মন দিয়ে মা ও ছেলে তুজনেরই মনের সন্ধান পেয়েছিল, কিন্তু তাই নিয়ে কোন নালিশও করল না জ্যেঠামণির কাছে, কিম্বা এমন কোন কথা নীরদা বা নিতাইকে বলল না, যাতে কোনরূপ কথান্তর হয় বা মনোমালিন্য ঘটে। সাধু দাতুর কাছে এই বয়সেই সে শিক্ষা পেয়েছে, কি করে মানুষকে ভাল বাসতে হয়, আর মানুষ ভালো না হলেও কিভাবে ভালবেসে তাকে ভাল করা যায়।

এ-অবস্থায় একদিন সাধনা বলে: জ্যেঠামণি, এক কাজ করুন, বাড়ীতে ভালো ভালো মাষ্টার রেখে আপনার ভাগনের পড়ার ব্যবস্থা করে দিন। আমি রুটিন বেঁধে দেব—দেখবেন, এক বছরে কত শিখে ফেলেছে।

কানাইবাবু বলেন: সে যা হয় হবে—আসলে মা, তোমাকেই ওকে দেখতে হবে।

প্রথমে কথা হয়—নিতাই পাঠশালায় ছেলেদের দিকে পড়বে। পড়ার ধারা সাধনা ঠিক করে দেবে। এ ব্যবস্থা কিন্তু নিতাইয়ের মনে ধরে না; সে ভাবে, সাধনা যেখানে মেয়েদের দিকে পড়ায়, সেখানে পড়ুয়া হয়ে সে যদি পড়ে, তার মান থাকবে না। ওমনি নিতাই কোট ধরে বসলো যে, ও পাঠশালায় সে পড়বে না। নীরদাও ছেলের আব্দার সমর্থন করলেন।

পড়াশোনার এই প্রসঙ্গ নিয়ে সাধনার সঙ্গে নিতাইয়েরও একদিন বেশ কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। নিতাই কিছুতেই সাধনাকে প্রাধান্য দেবে না, তার তুলনায় নিজেকে ছোট ভাববে না। সাধনা শিক্ষয়িত্রীসুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে তাকে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝাতে গেল; কিন্তু নিতাইয়ের পক্ষে সেটা 'উল্টা বুঝিলি রাম' গোছের হয়ে—সাধনাকেই আঘাত দিল। সাধনা কানাইবাবুকে জানাল: জ্যেঠামণি, নিতাইদা ভাবেন, আমি তাঁকে পড়ার কথা বলে বাহাদুরী দেখাচ্ছি। উনি রাগ করেন—আমি আর কিছু বলব না।

কানাইবাবু বলেন : তুমি রাগ করলে যে মা ওর কিছুই হবে না। আমার মুখ চেয়ে ওটাকে মানুষ করতেই হবে।

এর পর তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন যে, তাঁর বৈঠকঘরে ঘণ্টাখানেক তারা দুজনে এসে বসবে—সাধনা পড়বে, নিতাই শুনবে ; আবার নিতাই পড়বে, সাধনা শুনবে।

কিন্তু নিতাইয়ের দুর্ব্বুদ্ধিচালিত দুরন্তপনার জন্য অল্প দিনের মধ্যে এ ব্যবস্থায়ও পদে পদে বাধা পড়তে লাগল। সাধনা কারুর অন্যায় সহ্য করতে পারত না ; নিতাইয়ের অনুষ্ঠিত কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই সংঘর্ষ বাধল।

এর পর অন্যদিক দিয়ে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো যে, কানাইবাবু যে আশঙ্কা করেছিলেন—তাই সত্য হয়ে দাঁড়ালো।

তিন

ভগিনী ও ভাগিনেয়কে বড়বাড়ীতে আনবার পর কানাইবাবু একদিন তাঁর বা'র-মহলের বৈঠকখানায় আমলাবর্গকে আহ্বান করে ওঁদের সম্পর্কে অতীতের কাহিনীটি শুনিয়ে দিলেন। সাধারণত দেখা যায়, সামান্য অবস্থা থেকে যাঁরাই ভবিষ্যতে অসামান্য হয়ে ওঠেন, শৈশবের দারিদ্র্যক্লিষ্ট দুর্গত দিকটা লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখাই সঙ্গত মনে করেন। কিন্তু কানাইবাবু যে প্রকৃতির মানুষ, অপ্রিয় সত্যকে সসম্মানে স্বীকার করে চলমান জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতেই বারবার তিনি অভ্যস্ত। স্তব্ধ হয়েই সেরেস্তাশুদ্ধ সকলে সে কাহিনী শুনলেন :

ভাই-বোন সহরতলীর এমন এক বংশ আশ্রয় করে ধরিত্রীর আলো দেখেছিলেন—প্রতিষ্ঠা বা খ্যাতির দিক দিয়ে গর্ব করবার মত কোন নিদর্শনই তার ছিল না। কঠোর দারিদ্র্য ও দারুণ অভাবগ্রস্ত সংসারে তাঁদের শৈশব ও কৈশোর অতিক্রান্ত হয়। তার মধ্যে এইটুকুই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, বর্ণগত অহমিকা এবং প্রতিবাসীদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাতাপিতা উভয়েই কোন রকমে শাকান্নের সংস্থান করে এসেছেন বরাবর—কারুর কাছে ভিক্ষার দানটি নেবার জন্যে হাত পাতেন নি। পিতা প্রত্যহ সকালে সহরতলী থেকে তিন ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে কলকাতার বড়বাজারে এক মাড়োয়ারী

ব্যবসায়ীর দোকানে হাজির হতেন—চাকরী করতে নয়, একশো টাকার মত কাপড় চোপড় নিয়ে বাঙালী পাড়ায় বাড়ী বাড়ী ঘুরে ফিরি করে বিক্রীর উদ্দেশ্যে। রাত আটটা আন্দাজ ফিরে আসতেন বাড়ীতে—সেইভাবে পায়ে হেঁটে। তখনও সহরতলী থেকে সহরে যাতায়াতের জন্য সস্তা ভাড়ায় বাসের চলন হয়নি। সারাদিনের ফিরির পর দোকানে গিয়ে তাদের প্রাপ্য বিক্রীর টাকা ও মজুদ মালপত্র বুঝিয়ে দিয়ে তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী ফিরতেন। এ ভাবে যে উপার্জন করতেন, কোন রকমে সংসারটি চলতো; তা' ছাড়া মাও তাঁর ঘর-গৃহস্থালীর কাজের উপর সংসারের চাকা ঠেলে আরো কিছুটা সুসার করে দিতেন। পাড়ায় ছিল গোরুর একটা খাটাল; সেখান থেকে সস্তায় গোময় আনিয়ে ঘুঁটে দিতেন বাড়ীর উঠানে, নোনাধরা দেওয়ালের গায়ে। সেই ঘুঁটে কতকগুলি বাঁধা ঘরে সরবরাহ করতেন। নীরদাও কোমরে কাপড় জড়িয়ে সে কাজে মা'কে সাহায্য করত। ছেলের ভারি ঝোঁক পড়াশোনার দিকে, কিন্তু ক্লাশের মাইনে আর পড়ার বই-পত্র যোগাবার সময় অস্থির হ'তে হোত বাপ-মা দু'জনকেই। এরই প্রতিকারের আশায় মা অসংকোচে ঘুঁটের ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং তার ফলে ছেলের পড়াশোনার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহে সমর্থা হন। ছেলের প্রকৃতিও পিতামাতার আদর্শে শৈশবে পঠদ্দশা থেকেই স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। অবসরকালে খেলাধুলা ছেড়ে মায়ের কাজে হাত লাগায়; এর জন্য 'ঘুঁটেউলির ছেলে' অপবাদ-

রটলেও দৃকপাত করে না। এমনি সময় বিধাতা সহসা বাদী হলেন, কলকাতার পথে ফিরি করবার সময় পিতা মটর চাপা পড়ে হাসপাতালে যান এবং প্রাথমিক চিকিৎসার পর সেখান থেকে এম্বুলেন্স করে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ বাড়ী পাঠিয়ে দেন। প্রাণে বেঁচে আসেন, কিন্তু চলবার শক্তি হারান। সেই অবস্থায় তাঁর কি আক্ষেপ—'অক্ষম করে কেন আমাকে বাঁচিয়ে রাখলে ঠাকুর ?'

শয্যাশায়ী রুগ্ন গৃহস্বামীকে আশ্বাস দিয়ে স্ত্রী-পুত্র দুজনেই কোমর বেঁধে দাঁড়ালেন। ছেলে মাকে বললে—'আমার পড়ার জন্য ভেবনা মা, সে খরচ আমিই চালিয়ে নেব ; তা' ছাড়া তোমার কাজেও মাথা দেব—পড়াশোনার সঙ্গেই।' মা তখন মেয়ে নীরদার ওপর সংসার আর স্বামীর ভার দিয়ে বেরুলেন উপার্জনের ধান্ধায়। পাড়ার লোক অবাক হয়ে দেখে—বাড়ীর গিন্নী নাবালক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সহরের বড় বড় আড়ৎ থেকে ঘর-গৃহস্থালীর নানারকম জিনিষপত্র সওদা করে পাড়ায় পাড়ায় ফিরি করে তারি আয়ে সংসার চালাচ্ছেন, অভাবের কথা কেউ টের পায় না। ছেলেও সকালে বিকালে স্থানীয় বাজারে বসে কোমরে গামছা বেঁধে তরি-তরকারির বেসাতি করে—অথচ ঠিক সময়ে ইস্কুলে হাজিরা দেয় এবং ক্লাশে বরাবরই সে সবার ওপরে, যাকে বলে—ফার্ষ্ট বয় !

এই অবস্থার ভেতর দিয়েই ছেলে সহরতলীর হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে জলপানি পেলে। ঘুঁটে-

উলির ছেলের ‘এলেম’ দেখে পাড়ার লোকের তাক লাগে, খবরের কাগজে তার নামের সঙ্গে ছবি ছেপে বাপের ও গ্রামের নাম রাষ্ট্র করে দেয়। এদিকে নীরদা বাড়ন্ত হয়ে ওঠে, আর রাখা যায় না। কিন্তু জলপানি পাওয়া ভায়ের সুবাদে মধ্য কলকাতার কাঁসারিপাড়া থেকে হঠাৎ একটা সম্বন্ধ আসে। ছেলের বাপের মস্ত কারবার, ইমারৎ, বাড়ী, নামডাকও খুব। এক কথায় সম্বন্ধ পাকা হয়ে যায়। কিন্তু পড়শীদের চোখে ঘুম নেই ; যেচে গিয়ে কত কি জানিয়ে আসে, নীচ-বৃত্তির কথা তুলে ভাংচি দেয়। পাত্রের বাবা অবিশ্যি কথাগুলি গায়ে মাখেন নি—যেহেতু, বড় হবার আগে তিনিও পেতল-কাঁসার বাসন ফিরি করে বেড়াতেন ঘরে ঘরে ; কিন্তু পাত্র গেল বিগড়ে। তখন ঘটকের কথামত আলাদা হাজার দেড়েক টাকা কবলে পাত্রের সঙ্গে রফা করতে হয় পাত্রীপক্ষকে। তারই ধাক্কায় পাড়ার এক সুদখোর মহাজনের কাছে রেজিষ্টারী কোবালায় বাস্তু-বাড়ীখানা বন্ধক পড়ে। সেই বিয়ের পর দুটো বছরের মধ্যেই সব ওলটপালট হয়ে যায়। মেয়ের বাপ-মা দু’মাসের আড়া-আড়িতে মারা পড়েন ; তাঁদের চিকিৎসা আর শ্রাদ্ধশান্তিতে দেনার ওপর দেনা চাপে, অসহায় অবস্থায় ছেলেকে কলেজ ছাড়তে হয়। সুযোগ পেয়ে সেই মহাজনও ভিটে-বাড়ী নিলাম করে বেনামীতে কিনে নেয়। ঘুঁটেউলির ছেলের সৌভাগ্য দেখে যাঁরা একদিন বিধাতাকেও দুষেছিলেন, তাঁরাই সেই দুর্দিনে তার দুর্গতি দেখে

আনন্দে ফেটে পড়েন; বলেন—'এমনি করেই তিনি দর্পীর দর্প ভাঙেন!' ছেলেটি অবিশ্যি সে সব কথায় ভেঙে পড়ে নি; কিন্তু সর্বগ্রাসী সেই মহাজন দরদ দেখিয়ে যখন তাকে ডেকে বলেন—'তিনকুলে কেউ ত আর নেই, যাবে কোন চুলোয়? পেটভাতায় বরং আমার বাড়ীতে থেকে কাজ-কারবার দেখাশোনা কর।' তখন বেচারীর মনে হয়, যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিলেন ঐ মহাজন। অমনি তার গলা থেকে একটা শক্ত জবাব বেরিয়ে আসে—'যে ভাগ্যের দেমাকে আমাকে আপনি এ কথা বললেন, যদি আমার কর্মযোগ থাকে, সেই ভাগ্য একদিন আমাকে ধরা দেবে, আর সেদিন আমার মুখের পানে আপনি তাকিয়ে থাকবেন—এমনি অসঙ্গত কথা শোনবার জন্যে।' আশ্চর্য্য যে, কথার সঙ্গে সঙ্গে টিক্ টিক্ শব্দে জ্যেষ্ঠি ডেকে ওঠে, আর কাছেই কোন বাড়ীতে ঠিক সেই সময় পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ায় শাঁখও বাজে।

এর ঠিক পঁচিশ বছরের পর সেই দাম্ভিক মহাজনের সৌভাগ্যে ভাঁটা পড়ায় পাটের কারবার, ঘর-বাড়ী ও সম্পত্তি বাঁধা পড়ে। তখন নিলামে সে-সব খরিদ করে নতুন মালিক দখল নিতে আসতেই বৃদ্ধ গৃহস্বামী সবিনয়ে তাঁর আর্জী জানালেন যে, তাঁকে একটা মাস মাত্র সময় দেওয়া হোক, তারপর তিনি বাড়ী ছেড়ে চলে যাবেন। আগন্তুক মালিক তখন তাঁর মুখের উপর প্রসারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গাঢ়স্বরে বললেন: আমাকে নিশ্চয়ই আপনি চিনতে পারেন নি, আর

কৌতূহলী হয়ে এখানে যাঁরা জমায়েৎ হয়েছেন, তাঁরাও জানতে পারেন নি যে, আমি কে? কিন্তু আমি সকলকে চিনেছি; এখন পঁচিশ বছর আগের একটা ঘটনার কথা আমি আপনাদের প্রত্যেককে স্মরণ করতে বলছি।

অবাক বিস্ময়ে প্রত্যেকেই শ্রদ্ধাভাজন মানুষটির মুখের কথা শোনেন, ততোধিক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন তাঁর প্রশান্ত মুখ-খানার দিকে। কি এমন ঘটনা স্মরণ করতে বলছেন ইনি? অথচ, উপেক্ষা করার সাধ্য নেই। শুধু পল্লীর এই মহাজনটির যথাসর্বস্বই ইনি ক্রয় করেননি, কালেক্টরীর যে তৌজীভুক্ত এই অঞ্চলটি, তার ষোল আনাই ক্রয় করে মালিক হয়েছেন; সুতরাং নূতন ভূস্বামীরূপে ইনি এখন সবার শ্রদ্ধেয় গণ্যমান্য ব্যক্তি।

সকলকে নির্বাক দেখে আগন্তুক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন —'ঘুঁটেউলির ছেলে'-র কথা আপনাদের মনে পড়ে কি? আমি জানি, এই পাড়াতেই তিনি থাকতেন। তাঁর ভিটে বাড়ী—'

বাকি কথা বলার আর প্রয়োজন হলো না; নামটি শোনামাত্র প্রায় সকলের দৃষ্টি সেই সর্বহারা বৃদ্ধ মহাজনটির দিকে নিবদ্ধ হলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—'আর বলতে হবে না, সে ঘটনা সবাই জানে। আমিই তার ভিটে নিলাম করে বেনামীতে ডেকে নিয়েছিলুম।'

মুখখানি গম্ভীর করে আগন্তুক বললেন: তাহলে সেদিন আপনি সেই ছেলেটিকে যে কথা বলেছিলেন, আর সে তার যে

জবাব দিয়েছিল, নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে ? সেদিন থেকে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে সেই ছেলে কর্মযোগীর মত অর্থ-সাধনায় ব্রতী থাকে। তাতে সিদ্ধ হয়ে আজ সে ফিরে এসেছে সেদিনের ঘটনাটা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে। কিন্তু ভয় নেই, পেট-ভাতায় আপনাকে আজ আমি কাজ করতে বলব না, সে সামর্থ্যও আপনার নেই। বাড়ীও আপনাকে ছাড়তে হবে না—সপরিবারে যেমন আছেন, থাকুন। এর উপর আপনাদের জন্যে মাসিক একশো টাকা হিসেবে ভাতা বরাদ্দ করে দেওয়া হলো।' সেদিন আপনিই আমাকে কর্মযোগে দীক্ষা দেন, এ তারই দক্ষিণা।'

সকলেই তখন বুঝতে পারলেন, এই ব্যক্তিই সেদিনের ঘুঁটেউলির ছেলে, বর্তমানে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও জমিদার কানাই চৌধুরী। এরপর পৈতৃক ভিটেকে কেন্দ্র করে বিস্তর টাকা ঢেলে তিনি সেখানে ঘুঁটেউলি মা ও ফেরিওয়ালা বাপের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে এক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে তাঁর পুরাতন নিন্দুকদের উপর নূতন ধরণের প্রতিশোধ নিলেন।

পিতামাতার মৃত্যুর পর কানাই চৌধুরীর যখন ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে, প্রায় সেই সময় ভগিনী নীরদার শ্বশুরের মৃত্যু হওয়ায়, তাঁর স্বামী রজনী রায় কারবার ও ধনসম্পত্তি হাতে পেয়ে চুটিয়ে বাবুয়ানী করছিলেন। বিয়ের পর সেই যে নীরদা শ্বশুরবাড়ী যান, স্বামীর কড়াকড়িতে তাঁকে বাপের বাড়ী পাঠানো হয়নি—সেই থেকে বাপ, মা বা ভাইয়ের সঙ্গে

দেখা-সাক্ষাতের সুযোগও ঘটেনি নীরদার। স্বামী রজনী রায় বিয়ের পরেই শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ঘুচিয়ে দেন; ফিরিওয়ালা শ্বশুর, ঘুঁটেউলি শাশুড়ী, আলু-পটলওয়ালা সম্বন্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে তাঁর মত ধনী ও মানী লোকের মান খর্ব হবে, তুর্নাম রটতেই বা কতক্ষণ! সুতরাং বিয়ের পর নীরদার সঙ্গে কানাই চৌধুরীর প্রথম দেখা—বজবজের সেই বস্তীর বাসায়, প্রায় ত্রিশ বছর পরে।

সেরেস্তা-শুদ্ধ সকলেই নিঃশব্দে এই বিচিত্র কাহিনী শুনছিলেন। মধুমতী ষ্টেটের ব্যাপারে যদিও কানাই চৌধুরীর বিস্ময়াবহ কার্যকলাপের সঙ্গে এঁরা সকলেই পরিচিত ছিলেন, তথাপি তাঁর অতীত জীবনের কাহিনী যেন আরো মর্মান্তিক, আরো অনেক শিক্ষনীয় তথ্যে পূর্ণ।

সেরেস্তার সদর নায়েব ফটিক ঘোষালও আমলাদের সারিতে শ্রোতার স্থান অধিকার করেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে বক্তার মুখে মধ্য কলকাতার কাঁসারীপাড়া নামটি শুনেই তাঁর সর্বাঙ্গের লোমগুলি সজারুর গায়ের কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠেছিল। সেই সঙ্গে একটা মতলবও তাঁর মাথায় অঙ্কুর উদ্গত করতে থাকে। কাহিনী শেষ হলেই তিনি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: সিমলে-কাঁসারীপাড়ার রায়েদের বাড়ীতেই তাহলে হুজুরের ভগিনীর বিয়ে হয়েছিল?

কথাটা শোনবামাত্র কানাই চৌধুরী পাল্টা প্রশ্ন করলেন: আপনি ওদের জানতেন নাকি?

ফটিক ঘোষাল এ প্রশ্নে কৃতার্থ হয়ে বললেন : আজ্ঞে, শুনেছি ওঁদের কথা—বামুন হয়েও অশ্বিনী রায় পেতল-কাঁসার ব্যাপার করে কাঁসারীদের তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলেন, আর ঐ ব্যাপারেই ত আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হন।

কানাই চৌধুরী একটু গম্ভীর হয়ে বললেন : তা হবে। তবে গাছে কলা আর ফলেনি। বুড়ো চোখ বোজবার পর ছেলে মালিক হয়ে সব শেষ করে দেয় ক'টা বছরেই, শেষে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। আমি তখন আবার কেঁচে গণ্ডূষ করেছি। রজনীকে ডেকেছিলুম—আমার সঙ্গে মিশে কাজ করতে। তাতে তাঁর কি তম্বী—আমার সঙ্গে মিশে ফিরিওয়ালা হবেন? নিজে ত দেখা করেননি, আমাকেও ডাকেননি অন্ততঃ নীরুকে দেখবার জন্যে। সেই সময় খবর পাই—কি একটা চাকরী পেয়ে নীরুকে নিয়ে কলকাতার বাইরে গেছেন। সেই থেকে কেউ কারুর খোঁজ আর রাখিনি, ওদের কোন খবরও পাইনি। এতকাল পরে নীরুই প্রথম খবর দেয় বজবজ থেকে। সে ত শুনেছেন সব।

মথুরবাবুও বৈঠকখানায় কানাইবাবুর কাছেই বসেছিলেন। তিনি এই সময় ঘোষালকে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি ওঁদের খবর কি সূত্রে জানলেন বলুন ত?

ফটিক ঘোষাল বললেন : আজ্ঞে আমার শ্বশুরবাড়ী যে ঐ কাঁসারীপাড়ায়; স্ত্রীর কাছ থেকে ওঁদের কথা শুনেছিলুম।

একজন আমলা এই সময় বলে উঠলেন : ঘোষালমশাই

হিসেবি মানুষ স্যার। নিজের ছেলেমেয়েকে কলকাতায় শ্বশুর বাড়ীতে রেখে খরচ কমিয়েছেন।

কানাই চৌধুরী সহাস্যে বললেন: সে ত ভালোই করেছেন। ছেলেমেয়ে কলকাতার আবহাওয়ায় মানুষ হচ্ছে।

বৈঠক ভাঙলে ফটিক ঘোষাল মাথায় নূতন একটা ভাবনা নিয়ে বাসায় চললেন। বড় বাড়ী থেকে খানিকটা তফাতে পাড়ারই এক গৃহস্থ বাড়ীর দু'খানি ঘর ভাড়া নিয়ে সপরিবার তিনি বাস করেন। স্ত্রী মোক্ষদা কলকাতার মেয়ে; বিচক্ষণ ফটিক ঘোষাল নিজের বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে মনের মত তৈরী করে নিয়েছেন। এখন স্বামীর ইশারা ও ভ্রূভঙ্গি দেখেই মোক্ষদা ঠাকরুণ তাঁর মনের কথা বুঝতে পারেন।

ঘরে প্রবেশ করেই ঘোষাল দেখেন—মোক্ষদা দেবী তক্তপোষের এক পাশে গালে হাত দিয়ে বসে কি ভাবছেন; কোলের উপরে একখানা খোলা চিঠি—ডাকঘরের ছাপ দেওয়া খামখানিও সামনে পড়ে আছে।

স্বামীকে দেখেই ঘোষাল-গৃহিণী বিষাদের সুরে বললেন: দাদা চিঠি লিখেছেন—তাঁর চাকরী গেছে, সংসারে ভারি টানা-টানি। তাই লোক দিয়ে ছেলেমেয়েকে এখানে পাঠাচ্ছেন, শীগ্গীর তারা এসে পৌঁছাচ্ছে।

ভয়ে ভয়েই খবরটা মোক্ষদা দেবী স্বামীকে শোনালেন; তাঁর ধারণা ছিল, স্বামী খুবই ক্রুদ্ধ এবং ক্ষুব্ধ হবেন। কিন্তু তাঁর

মুখের ভাব ও ভঙ্গিতে তার কোন চিহ্ন না দেখে চমকে উঠলেন। এই অবস্থায় ঘোষাল তক্তপোষের উপর বসতে বসতে বললেন : ভগবান যা করেন ভালোর জন্যেই। আসতে আসতে আমিও ভাবছিলাম যে, ছেলে-মেয়েকে এখানে আনবার ব্যবস্থা করব। সে কষ্টের লাঘব হলো—পয়সা খরচ করে আর কলকাতায় যেতে হলো না। এখন যা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক-ঠাক্ জবাব দাও দেখি।

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে স্বামীর মুখের পানে চেয়ে থাকেন মোক্ষদা ঠাকরুণ—এ্র ধরণের কথা শুনে। সেই চাহনি থেকেই পত্নীর মনোভাব বুঝে ফটিক ঘোষালও সঙ্গে সঙ্গে নিজের মতলবটি খুলেই বললেন সব। তার মোটামুটি মর্ম এই যে—মোক্ষদা যখন কাঁসারীপাড়ার মেয়ে, আর ঐখানেই এককালের বড়লোক বামুন-কাঁসারী অশ্বিনী রায়ের বাড়ী এবং তাঁরই ছেলে রজনীবাবু যখন ছিলেন কানাই চৌধুরীর ভগিনীপতি, আর—তাঁর ভগিনী নীরদা ঐ বাড়ীর বধূ, তখন নিশ্চয়ই তাঁদের সঙ্গে মোক্ষদার জানাশোনা থাকা উচিত। শুধু তাই নয়, একটা সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল এটাও ঠিক।

এভাবে এমন একটা প্রসঙ্গ উঠতেই মোক্ষদা হত-চকিত হয়ে ক্ষণকাল নীরব থেকে, তারপর স্মৃতির সাহায্যে অতীতটা দেখবার চেষ্টা করে যা বললেন, তার মর্ম হচ্ছে—বাপের বাড়ী থাকতে তিনি ওঁদের কথা শুনেছেন সত্যি, ছেলেবেলায় কর্তাকেও দেখেছেন বটে, কিন্তু ছেলে বা বৌ-এর সঙ্গে চাক্ষুষ

দেখা তাঁর কখনো হয়নি। তা ছাড়া, ওঁরা খুব দেমাকে ব'লে পাড়ার লোকের সঙ্গে ওঁদের বনিবনাও ছিল না মোটেই।

ফটিক ঘোষাল এর পর শক্ত হয়ে গৃহিণীকে বললেন: ওকথা ভুলে যাও—মন থেকে একদম মুছে ফেল। ওদের সঙ্গে তোমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল; কাজে কর্মে যাওয়া আসা চলত। বুড়োর ছেলে রজনীবাবু গ্রাম-সুবাদে তোমার দাদা হতেন, সে হিসেবে তাঁর স্ত্রী, অর্থাৎ আমাদের কর্তা কানাইবাবুর বোন তোমার বউদি হন। অর্থাৎ কিনা, উনি ছিলেন সেখানকার বউড়ি, আর তুমি ছিলে ঝিউড়ি। কাজেই ওঁর চেয়ে তোমারই জানবার কথা বেশী, বউ-মানুষ—উনি ত বাড়ীর অন্দরে ঘোমটা দিয়ে থাকতেন। এখন ঠাকুরের দয়ায় য়্যাদ্দিন পরে আবার দেখা-শোনা। এইভাবে কথাগুলো মহলা দিয়ে নাও, আজ বিকেলেই বড় বাড়ী গিয়ে নীরদা ঠাকরুণের সঙ্গে সাবেক সম্পর্কটা ঝালিয়ে তাঁকে মাত করে আসা চাই। কথাটা বুঝেছ?

মুখ টিপে হেসে মোক্ষদা বললেন: এর পরও যদি না বুঝি, তাহলে বৃথাই তোমার সঙ্গে এতকাল ঘর করছি। বাব্বা! কথা পাড়বার ধরণ দেখে—

ঘোষাল অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলেন: বাজে কথার সময় এখন নেই, অনেক কাজ। কি বুঝেছ বলত শুনি?

মোক্ষদা এ অবস্থায় চতুরা ছাত্রীর মত এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললেন: বড় বাড়ী গিয়েই ঠাকরুণকে ঢিপ করে একটা পেরণাম ঠুকে বলব—কি বৌদি, চিনতে পারেন? তাঁর সাধ্যি

কি চিনবেন, কিন্তু তখনি ছ্যার্ ছ্যার্ করে রায় বাড়ীর পুরোনো কথা, সেই সঙ্গে দু-চারটে বানানো গল্প শুনিয়ে একেবারে তাক্ লাগিয়ে দেব। তারপর—

বাধা দিয়ে ফটিক ঘোষাল প্রসন্নমুখে বললেন : থাক্ থাক্, আর বলতে হবে না, তুমি ঠিক কাজ গুছিয়ে ফিরবে বুঝেছি। তবে মিথ্যেকার গল্পগুলো বরং আমিই বানিয়ে দেব—কর্তার কাছ থেকে কিছু কিছু মাল-মশলা পেয়েছি কিনা!

কি ভেবে এই সময় মোক্ষদা বললেন : ঠাকরুণের কথা ত জানলুম। কিন্তু ছেলেমেয়ে কলকাতা থেকে আসছে শুনে আহ্লাদটা হলো কি জন্যে, তা ত বললে না?

মুখখানার এক বিচিত্র ভঙ্গি করে ঘোষাল বললেন : কথাটা তলিয়ে ভাবলে আর জিজ্ঞেস করতে না। কর্তা মথুরবাবুর মেয়ে সাধনাকে সোনার চোখে দেখে আসছে বরাবর সে ত জানো? কিন্তু বোন আর ভাগনের ত আর কর্তার মতন চোখ নয়, সাধনা মেয়েটার ওপর ওঁদের দুজনেরই বিষ-দৃষ্টি পড়েছে। ছেলেটার সঙ্গে খালি খালি ছুঁড়ি কথা কাটাকাটি করে, আর ঐ ছুঁড়িকে দেখ্লেই মা নাকি মুখ ঘুরিয়ে চলে যান। এখন—

তাড়াতাড়ি মোক্ষদা বলে উঠলেন : বুঝেছি গো বুঝেছি। আমাদের রমেশ আর স্বপ্না এলেই মা ও ছেলের সোনার দৃষ্টি যাতে ওদের ওপরে পড়ে, সেই ফিকিরে আছ। ও! তুমি দেখছি অদ্ভুত, সত্যিই অদ্ভুত!

চার

বড় বাড়ীর সংস্পর্শে এসে নীরদা দেবী প্রথম প্রথম হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। এত বড় বাড়ী ; মহলের পর মহল, বড় বড় ঘর, লম্বা লম্বা দালান, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অঙ্গন, তাঁকে যেন গোলকধাঁধায় ফেলে আড়ষ্ট করে দেয়। বাবা! এ কি বাড়ী—না একখানা গেরাম! অথচ তাঁর দাদা এতবড় বাড়ী জুড়ে একাই বাস করছেন! চাকর দাসী পাচক দারোয়ান না হয় আছে, বাইরের সেরেস্তায় আমলা গোমস্তারা থাকে, কিন্তু তা হলেও ভিতর মহলে সেঁধুলেই মনে হয়, ঘর-দালান-উঠানগুলো যেন হাঁ করে গিলতে আসছে। আরো তিনি লক্ষ্য করেন—এতবড় বাড়ীখানার কোথায় কি আছে, দাদার সে দিকে হুঁসই নেই ; কিন্তু বাইরের নিঃসম্পর্কীয়া একটা মেয়ে এ-বাড়ীর আগাগোড়া সবই জানে, সমস্ত বাড়ীখানা সে যেন তার নখ-দর্পণে ছকে রেখেছে। নীরদা যখন দাদাকে বলছিল—'বাড়ীখানা আমাদের ভাল করে দেখিয়ে দাও দাদা, আমাদের কাছে ত এ-বাড়ী গোলকধাঁধার মত।' সে-কথার উত্তরে দাদা কিনা অম্লান বদনে সাধনা মেয়েটিকেই ডেকে বলে দেন—'পিসিমা আর নিতাইদাকে সঙ্গে করে বড় বাড়ীর মহলগুলো দেখিয়ে আনত মা, আমার চেয়েও এ-বাড়ী তোমার বেশী চেনা কিনা, তাই তোমাকেই এ-ভার দিচ্ছি।' সেই

থেকেই ত তিনি বুঝতে পারেন, এ-বাড়ী যেন সাধনা মেয়েটির নখ-দর্পণে রয়েছে।

এ ত গেল বাড়ীর কথা। তারপর ঘর-সংসার ও হেঁসেলের অবস্থা দেখেই নীরদা দেবীর চোখে বুঝি পলক পড়ে না—এদিকেও ঐ সাধনা মেয়েটার ব্যবস্থামত সব চলেছে! সকালে নানা কাজে ব্যস্ত থাকে বলে আগের দিন সে নিজের হাতে রাঁধুনীর হেপাজতে ভাঁড়ার বা'র করে দিয়ে যায়—রান্নার পদগুলি পর্য্যন্ত সেই সঙ্গে বলে দেয়, আর সেই ভাবেই রাঁধুনীকে রাঁধতে হয়। সেই সব রান্নার উপরও পাঠশালা থেকে একটু সময় করে নিয়ে হন্ত দন্ত হয়ে হেঁসেলে এসে নিজের হাতে তাকে কর্ত্তার জন্যে নতুন কিছু না কিছু রাঁধতেই হবে। রাঁধুনীই ভনিতা করে সাধনার এই কাজগুলির কথা নীরদাকে শোনায় আর শুনতে শুনতে তাঁর মনটা বুঝি বিষিয়ে উঠতে থাকে। তখন রাঁধুনীর সামনেই গজ গজ করে বলেন: এসব হোচ্ছে আদিখ্যেতা, দাদার মন জুগিয়ে সো হবার ফন্দী। নৈলে তুমি বাছা মায়ের বয়সী, রান্নার কাজ করে বুড়িয়ে গেলে, এখন ঐ এক ফোঁটা মেয়ে তোমাকে হেনস্তা করে এইভাবে চাল চালে! দাদারও যেন বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে!

রাঁধুনী ঠাকরুণও সুযোগ পেয়ে মুখ বেঁকিয়ে বলে: ও বাবা! ও কথা আর কও কেন দিদিরাণী! যতন করে যতই রাঁধি গো, কিছুই কত্তাবাবুর মুয়ে লাগেনি, আর ওনার হাতের

রান্না একেবারে অমর্ত! সাধন-মা বলতে রাজাবাবু যেন অজ্ঞান, খাবার সময় কাছে না বসলে খাওয়াই হয় না!

নীরদা চাপা গলায় ঝাঁঝিয়ে বলেন: শক্ত হয়ে আগে বসি, তোমাদের কাছে জেনে শুনে সব নিই, তার পর সব দেখাবো মজা! হেঁসেলে ঢোকা—ভাঁড়ার গুছিয়ে দেওয়ার আস্পর্দ্ধা ভেঙে দেবো।

সাধনা কিন্তু সেইদিনই ভাড়ার ঘরের চাবি নীরদা দেবীর হাতে দিয়ে বলল: আপনি এলেন পিসিমা, আমিও বাঁচলাম। রাতে ঘুমাতে পারতাম না—মন পড়ে থাকতো বড় বাড়ীর দিকে। আপনি ধীরে সুস্থে সকালেই ভাঁড়ার বার করে দেবেন, বামুন ঠাকরুণের কাজের আসান হবে।

ভাঁড়ার ঘরের চাবি আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে নীরদা একটু গম্ভীর হয়েই বলেন: দাদার যেমন ভুলো মন, নিজের বোন ভাগনে থাকতেও ছাগল দিয়ে যব মাড়িয়ে এসেছেন য়্যাদ্দিন! এই দ্যাখনা—ভাঁড়ারের ভার দিয়েছেন তোমার ওপর ছেড়ে—এখনো যার পুঁথির মালা গেঁথে পুতুল খেলার বয়েস পার হয়নি। তারপর, আইবুড়ো মেয়ে হেঁসেলে সেঁধিয়ে সখ করে রাঁধে—সেই রান্না ওঁর পাতে পড়ে, মুখে ওঠে! অ-মা! শুনে অবধি ঘেন্নায় মরি।

মুখখানি ম্লান করে অপরাধীর মত ভঙ্গিতে সাধনা জিজ্ঞাসা করে: আইবুড়ো মেয়ে শুদ্ধাচারে রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধলেও কি দোষ হয় পিসিমা?

ঝাঁঝিয়ে উঠে পিসিমা উত্তর করেন : হয়না ? শোনোনি, দীক্ষিত দেহে ইষ্টিমন্তর জ'পে তারপর হেঁসেলের হাঁড়িতে হাত দেবার ক্ষমতা হয় মেয়েদের, তবে সে রান্না দেবতা-ব্রাহ্মণকে দেওয়া যায় !

সাধনা একটু শক্ত হয়ে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলে : আমি কিন্তু শুনেছি পিসিমা, পূজা-পর্বে ঠাকুরের ভোগ রাঁধবার সময় রাঁধুনিকেই ও রকম বাছ্‌বিচার মানতে হয়। কিন্তু রোজকার ঘর-সংসারে আজকাল তা হয় না পিসিমা ; কুমারী মেয়ের হাতের রান্না কোন্ বাড়ীর বাপ মা মাসি পিসি খান না বলুন ?

ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন পিসিমা, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ করে বলেন : ঐ ত তোমাদের দোষ বাছা, দু'পাতা পড়তে শিখে আর শাস্তর মানতে চাওনা। আমি কিন্তু এসব অনৈরণ চোখে দেখতে পারব না বাছা, তা বলে রাখছি।

মৃদু হেসে সাধনা বলে : আপনি যখন এসেছেন পিসিমা, এরপর অনৈরণ হবেই বা কেন ? জেঠামণির সুখ-সুবিধার জন্যেই ত' আমাকে পাঠশালা থেকে ছুটে আসতে হ'ত হেঁসেলে। আর তো তার দরকার হবে না।

নীরদা দেবী ভেবেছিলেন যে, এই দজ্জাল মেয়েটার হাত থেকে ভাঁড়াড়ের চাবি ছাড়িয়ে নিতে, আর হেঁসেলের এলাকা থেকে সরিয়ে দিতে তাঁকে বিস্তর ঝামেলা পোহাতে হবে, দাদার কাছেও রীতিমত দরবার চলবে, কিন্তু এত সহজে যে কাঁটাটা সরে যাবে, সেটা তিনি ধারণা করতেই পারেন নি।

খবর নিয়ে তিনি আরও আশ্বস্ত হলেন যে, মেয়েটাও ঘটনার পর বাড়ীর কর্তাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা না বলেই বাড়ী চলে গেছে। এইখানেই এ মেয়েটিকে মনে মনে চিনে নিয়ে নীরদা দেবীর নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তাঁর বিচিত্র প্রকৃতি তাঁকে সে সুযোগ দেয় নাই—একই মাতৃগর্ভজাত ভ্রাতা-ভগিনীর প্রকৃতিগত পার্থক্য ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টিতে যতটুকু ধরা পড়েছে, তাতেই বুঝতে পারা গেছে যে, সহৃদয় ভ্রাতার মনোবৃত্তির তুলনায় ভগিনীর মনটি কত ছোট।

পরদিন মধ্যাহ্নভোজনে বসেই কানাইবাবু বুঝলেন যে, কোন ব্যঞ্জনই সাধনার হাতের পরশ পায় নাই; তার নির্দেশ নিয়েও পাক হয় নাই! ভোজনের শেষের দিকে নীরদা নিজেই একখানি থালার উপর গরম দুধের বাটি ও মিষ্টান্নের রেকাবিখানি রেখে পরিবেশন করতে এসে থমকে দাঁড়ালেন; এক নজরেই লক্ষ্য করলেন যে, সাজানো অন্ন-ব্যঞ্জনের অধিকাংশই অভুক্ত রয়েছে। কানাইবাবু তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: সাধনা বুঝি আজ আর রান্নায় হাত দেয়নি নীর?

দুধের বাটি ও মিষ্টান্নের পাত্র থালা থেকে তুলে যথাস্থানে রাখতে রাখতে মুখখানা বিকৃত করে নীরদাও প্রশ্নের উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করলেন: ও মা, সেই জন্যেই বুঝি ভাত ব্যানুন কিছুই দাদার মুখে রুচল না?

কানাইবাবু আরো গম্ভীর হয়ে দুধের বাটিটা পাতে তুলে নিলেন, কোন কথা বললেন না আর। নীরদা আড়চোখে

দাদার মুখভঙ্গি লক্ষ্য করে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুরে বললেন: তাহলে সাধনার হাতের রান্না বুঝি দাদার চেনা হয়ে গেছে?

দুধের বাটিতে একটা চুমুক দিয়ে কানাইবাবু বললেন: সেটা কি খুবই আশ্চর্য্য বলতে চাও নীর? ও মেয়েটা যে আমার হাড়-হর্দ সবই জেনে ফেলেছে, আমার রুচি-অরুচি ওর মুখস্থ হয়ে গেছে কিনা—তাই ওর হাতের রান্না দেখলেই চিনতে পারি।

দাদার কথায় নীরদার মুখখানা ভারি হয়ে উঠল, একটু তিক্ত সুরেই তিনি বললেন: আর তুমি কি খেতে ভালবাস, কিসে তোমার রুচি, নিজের বোন হয়েও কি আমি তা জানিনা? সে কথা ভুলিনি বলেই যত্ন করে রেঁধে তোমার পাতে দিয়েছি, তুমি কিন্তু একটা কিছু তুলে পুরোও খাওনি। এতে কি মনে হয় বলত?

সহজকণ্ঠে কানাইবাবু এ কথার উত্তরে বললেন: মা'র হাতের সে রান্না এখনো মুখে লেগে আছে নীর! সামান্য মশলা—আদা, ধনে-মরিচ বাটা, গোটা লঙ্কা দু' একটা, ছিটে ফোঁটা ঘী, আর তেজপাতা বেটে দিতেন সম্বরা—তাতেই মনে হোত অমৃত। আর্জ বড় মানুষ দাদার জন্যে সেই আলুর দম রাঁধতে তুমি এলাহি কাণ্ড করেছ নীর—হেন মশলা নেই যা পড়েনি এতে; আর ঘী ঢেলে সিদ্ধ করেছ বললেই চলে! কিন্তু রাঁধবার সময় এ কথাটি তোমার মনে হয়নি যে, লক্ষ্মীর কৃপা পেলেও আমার রুচি বদলায় নি। জানো, ফেন ভাত,

আলু ভাতে আর একটু ডাল—এই খেয়ে পঁচিশটা বছর ধরে লক্ষ্মীর সাধনা করেছি। বড় বাড়ীর মালিক হবার পর এই ঘরে খেতে বসে চমকে উঠি প্রথম দিন—এবাড়ীর আগেকার মালিক রায় বাবুরা রাজসিকভাবে সাজানো যে সব খাবারের সামনে বসতেন, এরা আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই আমার জন্যে সেই বিরাট ব্যবস্থা করেছিল। খাওয়া দূরের কথা, দেখেই তখন হাঁফ ধরে গেছে। তারপর, খাদ্যের পদগুলো চোখ বুজিয়ে ছাঁটাই করতে বলে দিই, কিন্তু ওরা কি শোনবার পাত্র—অন্ততঃ দ্বাদশ-ব্যঞ্জনের সঙ্গে অন্নের থালা বাড়ীর মালিকের সামনে না রাখলে কি ওদের মনে তৃপ্তি আসে! আমার খাওয়া নিয়ে সেই টানা-হেঁচড়ার সময় সাধনা-মা এসে পড়ে আমাকে রক্ষা করেন। প্রথম দিনেই খেতে বসে ডুমুরের ডাল্না, আর থোড়-ছেঁছকি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে রাঁধুনীকে শুধালাম—একি কাণ্ড—কার এ কীর্তি বামন ঠাকরুণ! শুনলাম, সাধনা-মা নিজেই ঐ তুচ্ছ বস্তু দুটি সংগ্রহ করে নিজের হাতে রেঁধেছেন—কারুর বারণ শোনেন নি। মাকে হারাবার পর ঐ দুটি ব্যঞ্জনের চেহারা দেখি নি; কিন্তু তা ব'লে তাদের স্বাদ যেন মুখে লেগেছিল—পঁচিশটা বছরেও ভুলিনি। মুখে দিয়ে দেখি—অমৃত! ঠিক মিলে গেছে। সুস্থ মনে তৃপ্তির সঙ্গেই সেদিন খেয়েছিলাম, রাঁধুনীদের সঙ্গে চাকর-বাকর সবাই সেই কাণ্ড দেখে হতবাক আর কি! সেই থেকে মায়ের আমলের চেনা খাবারগুলি একে একে হাজির

হতে থাকে—শুক্তানি, শাকের ঘণ্ট, তরিতরকারি ভাতে, কাঁচা নারকেল কুরোর সঙ্গে চাল কুমড়োর ছক্কা, লাউ-চিংড়ি, বাড়ীতে পাতা দই—কত বলব !

নীরদা গুম হয়ে দাদার কথাগুলি শুনছিলেন। রাঁধুনীর মুখে আগেই মালিকের অদ্ভূত রুচি-প্রবৃত্তির কথা শুনলেও তিনি ভেবেছিলেন, সাধনা মেয়েটির মন রাখবার জন্যেই তিনি তার হাতের সাদাসিধা গরীবানী রান্নাগুলি তোয়াজ করে খেয়ে থাকেন। কিন্তু তিনি ত' তাঁর নিজের বোন—তাঁর চেয়ে বেশী দরদী হয়ে বুঝবে ঐ ডেঁপো মেয়েটা। সেইজন্যে তিনি জাঁক-জমকেই দাদার জন্যে কতিপয় পদ স্বহস্তে রেঁধেছিলেন। কিন্তু তাঁর অদৃষ্টক্রমে 'উল্টা বুঝিলি রাম' হয়ে গেল। উপসংহারে তিনি দাদাকে এই বলে আশ্বাস দিলেন যে, এরপর দাদার রুচি-মর্জিমতই সাদাসিধা রান্না করবেন এবং রাঁধুনীকেও শিখিয়ে দেবেন।

এই ঘটনার পর সাধনার প্রতি নীরদার মনটি আরও বিষিয়ে ওঠে। ছেলে নিতাইকেও তিনি পদে পদে সতর্ক করে দেন, সে যেন ঐ জ্যেঠা মেয়েটার সঙ্গে খুব বেশী না মেশে। একেইত, মামাকে সে যাদু করে রেখেছে, কিন্তু নিতাই যেন ঐ মেয়েটার হাতের পুতুল হয়ে লোক না হাসায়। হাবুল নামে বেঁটে-সেটে অথচ শক্ত-সমর্থ একটি ছোকরা বড় বাড়ীতে পেট-ভাতায় চাকরী করে। লোকটার দেহের মত বুদ্ধিও স্থূল বলে, সবার কাছেই সে অপদস্থ হয়। কিন্তু বোকা হলেও

সে এবাড়ীর অনেক খবর রাখে। নীরদা দেবী দাদাকে ধরে পাঁচ টাকা মাসিক বেতন বরাদ্দ করে তাকে নিতায়ের খাস চাকরের পদে বাহাল করালেন। তার প্রতি হুকুম হলো, ছায়ার মত দাদাবাবুর সঙ্গে থাকবে, সব রকম পরিচর্য্যা করবে, পান থেকে যেন চুণটুকুও না খসে।

মায়ের পরামর্শে অল্প কয়েকদিনেই নিতাই বড় মানুষ মামার ভাগনে রূপে নিজেকে রীতিমত ফাঁপিয়ে ও জাঁকিয়ে তুলেছে। সে জেনেছে, এই সাতমহল বিরাট বাড়ী, মধুমতী এষ্টেট এবং অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সে একাই। বড় সময়েই তারা এসে পড়েছে, নতুবা মামা ঐ সাধনা মেয়েটাকেই সব লেখাপড়া করে দিতেন। এখন এই মেয়েটিকে ছাপিয়ে নিতাইকে মামার কাছে ঘনিষ্ঠ হতে হবে। কিন্তু নিতাইকে সেদিক দিয়ে নিরাশ হতে হয়েছে। মামাই সাধারণ কোন না কোন ঘটনা উপলক্ষ্য করে হাতে-কলমে প্রতিপন্ন করে দিয়েছেন যে, বয়সে দু'তিন বছরের ছোট হয়েও সাধনা মেয়েটি নিতাইয়ের চেয়ে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও আক্কেল বিবেচনায় অনেক বড়! সাধনার আদর্শে ভাগনেটিকে তৈরী করে নেবার উদ্দেশ্যেই কানাইবাবু পাঠশালার ছুটির পর তাঁর বৈঠকখানায় দু'জনকে আনিয়ে সামনা-সামনি বসিয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা করেন, সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

কিন্তু এভাবে সহ-শিক্ষাও নীরদাকে রীতিমত ভাবিয়ে তোলে। যেহেতু, সাধনা মেয়েটি বিদ্যার দিক দিয়ে এই বয়সেই

এত নাম করেছে যে, সবাই তাকে 'সরস্বতী' বলে বাহবা দেয়। তারপর নিতাই প্রথম প্রথম তাকে হেনস্তা করলেও ইদানীং সহ-শিক্ষার সময় সাধনার বিদ্যার প্রখর আলোকে কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। নীরদাও লক্ষ্য করছেন, ভূতের মুখে রাম নামের মত এখন নিতায়ের মুখ দিয়ে সাধনার সুখ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ছে, এটা অবশ্যই ভাববার মতন। তারই মুখে শোনা গল্প কণ্ঠস্থ করে সে নীরদাকে শোনাতে আসে। তাঁর বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, এ সবের গুরু হচ্ছেন তাঁর ঐ ভিজেবিড়ালের মত দাদাটি! তিনি সবার সামনে পরের মেয়ে সাধনাকে বাড়িয়ে, নিজের ভাগনে নিতাইকে ছোট করে দাবিয়ে রাখতে চান! অমনি, ঈর্ষায় নীরদার দুই চোখ জ্বলে ওঠে, তখনি মনে মনে সঙ্কল্প করেন—আমিও দাদার বোন, এক মায়ের পেটে দু'জনে জন্মেছি, দাদার এ চাল আমি ভাঙবই—ঐ দজ্জাল ছুঁড়িকে যেমন করেই হোক আমার ছেলের চক্ষুশূল করে তবে আমার শান্তি।

নিতাইকে তিনি ডেকে বলেন: একটা কথা সব সময় মনে রাখবি বাবা, তুই হচ্ছিস্ বেটাছেলে—পুরুষমানুষ; ঐ সাধি মেয়েটার সঙ্গে তোর অনেক তফাৎ। কথায় বলে—'পুতের মুতে কড়ি, মেয়ের মুখে ঝাঁটা মারি।' ও মেয়েটার বোলচাল বিদ্যে-বুদ্ধি—সবই ওর আদিখ্যেতা। তুই হচ্ছিস—জমিদারের ভাগনে, আর ঐ সাধি তোর মামার চাকরের কন্যে! বয়েস হ'য়ে দাদার ভীমরতি ধরেছে, নৈলে কিনা ওকে

তোর সমান আসনে বসিয়ে তোয়াজ করেন! তুই কিন্তু ভুলিসনি, নিজেকে খাটো করে যেন ওর কাছে নিচু হোস নি, আমি মা—আমার কথা মনে রাখিস।

নিতাই নীরবে মায়ের কথা শুনে মনে মনে আলোচনা করে। নীরদাও উপায় খুঁজে বেড়ান, কি করে ছেলের মনটি বিষিয়ে দেবেন। এমনই সময় একদিন হঠাৎ তাঁর শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কটিকে সহায় করে পরিচিত হতে এলেন ফটিক ঘোষালের পত্নী মোক্ষদা।

সেইদিনই শুভক্ষণে সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি হয়ে গেল এবং ঘোষালগৃহিণী আগে থেকে মহলা দেওয়া ঘটনাগুলি পর পর সাজিয়ে এমন কায়দা করে শোনাতে লাগলেন যে, শুনতে শুনতেই নীরদা আনন্দে বিস্ময়ে বিহ্বলের মত হয়ে বলে উঠলেন : হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন সব মনে পড়েছে ভাই তোমার কথা শুনে! এখন মনে হচ্ছে—যেন আমার শ্বশুর-বাড়ীর সঙ্গে তোমাদের খুব বনিবনাও ছিল, গ্রাম সুবাদে তিনি···

নীরদার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মোক্ষদা বলে উঠলেন : দাদা হতেন যে! ছেলেবেলায় আমরা এক্ সঙ্গে খেলেছি, কত হুল্লোড় করেছি, মোক্ষদা-বোনটির ওপর কি দরদই তাঁর ছিল! ভাই-ফোঁটার কথা এখনো মনে পড়ে, আমার হাতের ফোঁটা আগে না নিয়ে রজনীদা মুখে জলটুকুও দিতেন না। কি ভালোই আমাকে বাসতেন—মা'র-পেটের বোনেরও বাড়া ছিলুম আমি! তারপর বিয়ে হতেই সব চুকে বুকে গেল।

এইভাবে বিনিয়ে বিনিয়ে এমন ভাবে পুরোনো দিনের কথা সব কায়দা করে বলে গেলেন, শুনে নীরদাদেবীও অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং তাঁকেও জোর করে অতীতের স্মৃতি থেকে বার বার সন্ধান করতে হলো—এমনি এক পাড়া-প্রতিবাসিনী দরদিনী বোনের কথা স্বামীর মুখে কবে তিনি শুনেছিলেন! শেষে তাঁকে মানতেই হলো : এখন আমার বেশ মনে পড়ছে ভাই, তোমার কথা হামেসাই বলতেন তিনি। আমি আবার তাই নিয়ে ঠাট্টাঠুট্টিও করতুম। কিন্তু এমনি পোড়া বরাত—চাক্ষুষ পরিচয় হলো তোমার সঙ্গে যখন আমার কপাল পুড়ে গেছে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে চোখে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে নীরদাদেবী কান্নার সুরে ফুঁপিয়ে উঠলেন ; তাঁর দেখাদেখি মোক্ষদার চোখ-মুখও কান্নার ভারে ছল্‌ছল্‌ করতে লাগল।

পাঁচ

একটি দিনেই কয়েক ঘণ্টা আলাপসূত্রে সমপ্রকৃতি দুইটি নারীর মধ্যে সম্প্রীতি নিবিড় হয়ে উঠল। রাত্রে কানাইবাবু ভিতরমহলে আসবামাত্র নীরদা এভাবে সদ্ভাব স্থাপনের কাহিনীটি বেশ ভনিতা করেই তাঁকে শুনিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বললেন: তাই তো বলছিলুম, এমন আপনার জন এত কাছে থাকতে দাদা তো ওদের কথা কিছুই আমাকে বলেন নি। ভাগ্যিস, ঘোষাল মশায়ের বৌ নিজে এসে সম্পর্কের পথটা খুলে দিলেন!

কানাইবাবু গম্ভীর মুখে বললেন: আমি তো বাপু দৈবজ্ঞ নই, যে খড়ির দাগ কেটে খবরটা সংগ্রহ করব! মাঝে একদিন তোমার সম্পর্কে রজনীর কথা উঠতে ফটিক ঘোষাল বলেছিলেন বটে, ওঁরও শ্বশুরবাড়ী ওদেরই বাড়ীর কাছে। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তোমার যে এত দহরম মহরম, সে সব কথা কিছুই বলেন নি—তোমার মুখেই এই প্রথম শুনলাম।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নীরদা বললেন: আমিই কি প্রথমে চিনতে পেরেছিলুম—কতকাল পরে দেখা; তারপর যেই ছ্যার ছ্যার করে দু'বাড়ীর পুরোনো কথা সব শোনাতে লাগল ঘোষাল-বৌ, তখন আর বুঝতে কিছু বাকি রইল না; শুধু কি তাই গা—এই নির্বান্ধব পুরীতে বাপের বাড়ীর দেশের আপন জনের সন্ধান পেয়ে যেন স্বর্গের সিঁড়ি দেখতে পেলুম!

কানাইবাবু বললেন : আমিও বাঁচলাম—তোমাকে তা'হলে আর হাঁপিয়ে উঠতে হবে না ; গল্প করবার দোসর যোগাড় করে নিয়েছ যখন।

নীরদা মুখ টিপে হেসে বললেন : ভগবান আমার মনের অবস্থা বুঝে নিজেই জুটিয়ে দিয়েছেন দাদা ! এখন তোমাকে একটি কাজ করতে হবে, আমি কিন্তু ঘোষাল-বৌকে কথা দিয়ে ফেলেছি।

কানাইবাবু বললেন : কথা যখন দিয়েছ তুমি, তখন আর আমাকে জিজ্ঞাসা করা কেন বল ? বলেই ফেল, কি করতে হবে।

একটু থেমে, মনে মনে কথাগুলি গুছিয়ে নিয়ে নীরদা বললেন : শুনলুম বড় কষ্টেই রয়েছেন ঘোষাল মশাই। পাড়াতেই এক গেরস্তর বাড়ীতে একখানা ঘর ভাড়া করে থাকেন। তাও না হয় কোন রকমে দিন কাটাচ্ছিলেন ; কিন্তু ছেলেমেয়েরা মামার বাড়ী থেকে ওদের কাছে ফিরে আসছে ; য্যাদ্দিন সেখানে থেকেই ভাই-বোন পড়াশোনা করছিল। সময় মন্দা পড়ায় তাঁরা পাঠিয়ে দিচ্ছেন বাপের কাছে। কিন্তু ওখানে তো থাকবার ঠাঁই নেই। শুনেই আমার মনে কি হলো, ঝাঁ করে বলে বসলুম—বেশ তো, আমাদের এতবড় বাড়ী খাঁ খাঁ করছে, কত ঘর খালি পড়ে আছে—তোমরা কেন এখানেই এসে ওঠ না। শুনে মোক্ষর কি আনন্দ দাদা, আমার হাত দু'খানি ধরে কাকুতি করে বললে—তাহলে তো

সত্যিই আমাদের একটা হিল্লে করে দিলে বৌদি, এ বাড়ীতে এসে বাস করা—এ কি কম ভাগ্যের কথা! তা' ওদের ঘরও আমি ঠিক করে রেখেছি দাদা! ঐ যে সাধনা সেদিন নাচ-মহল দেখালে, দিব্যি কৌটোর মতন মহলটির ঘরগুলি ঝক্ ঝক্ করছে, ওদের বেশ আঁটবে। এখন তুমি যদি বল, মত দাও, তবে ওরা কালই জিনিষপত্র নিয়ে উঠে আসে।

শুনতে শুনতেই কানাইবাবুর গম্ভীর মুখখানি আরও নিবিড় ভাবে গম্ভীর হয়ে উঠছিল। নীরদার কথা শেষ হলে তিনি সংযত স্বরে বললেন: দেখ নীর, বড় বাড়ীর মধ্যে অনেক মহল বা ঘর-দালান এখনো পর্য্যন্ত খালি পড়ে আছে; তার কারণ—ঠিকমত কাজের ব্যবস্থাগুলি সব এখনো হয়ে ওঠেনি। কাজ সুরু হলে সব ঘরই ভরে যাবে। তবে ঘর খালি আছে বলেই যে তল্পিতল্পা নিয়ে যে কেউ এসে এখানে বসবাস করতে থাকবে, এমন কোন কথাত ওঠেনি। আমার সেরেস্তায় বাইরের অনেক লোকই চাকরি-সূত্রে আছে। কাছারী-মহলেই তারা রাত্রিবাস করে। তাদের দু'বেলার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও যে সেরেস্তার খরচেই হয়ে থাকে, সে ত তুমি জেনেছ। কিন্তু ওদের মধ্যেও কেউ পরিবারবর্গ নিয়ে এলে, বাইরেই তারা বাসা যোগাড় করে নেয়;—বড় বাড়ীতে ঘর পড়ে আছে ব'লে, কেউ সেদিকে তাকাতেও সাহস করেনি। কিন্তু আজ তুমিই সে নিয়ম ভেঙে দিচ্ছ—এটা মনে রেখ।

আশ্চর্য্য, কানাইবাবুর মুখে এ-ধরণের কথা শুনেও নীরদা-

ঠাকরুণ কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে, বরং আরও অধিকতর সপ্রতিভ কণ্ঠেই বলে উঠলেন ঃ সে যাই হোক দাদা, অন্যে যে যাই ভাবুক, আমার কথা আলাদা। আমি যখন ঘোষাল-বৌকে কথা দিয়ে ফেলেছি, তোমাকে তা রাখতেই হবে। তার পর ভেবে দেখ দাদা, এত বড় বাড়ীতে আমি মেয়েমানুষ কি করে মন টিকিয়ে থাকি বল তো? ঘোষাল-বৌ এলে তবু দুটো কথা বলবার মানুষ পাব! লক্ষ্মীটি দাদা, তুমি খুসি মনে মত দাও।

তেমনি গম্ভীর মুখে কানাইবাবু বললেন ঃ আমার মতের তোয়াক্কা না রেখেই তুমি যখন কথা দিয়েছ, আমি আর কি বলব বল? বেশ কালই তাদের আসবার ব্যবস্থা করে দাও। তবে আগে থেকেই একটা কথা ঐ মহল্লাটির সম্বন্ধে বলে রাখছি শোন—রায়বাবুদের আমলে এ বাড়ীতে প্রায়ই বাঈজীদের নাচ গান হোত। তারা এলে ঐ মহল্লায় বাসা পেত। কাজেই ওখানে ঘর, দালান, উঠান, কূয়াতলা প্রভৃতি বাস করবার মত সব ব্যবস্থাই আছে। একখানা ঘর বড় বড় আয়না দিয়ে, ঝাড়লণ্ঠন ও দেওয়ালগিরি লাগিয়ে সাজানো অবস্থাতেও আছে—ঐ ঘরে বাঈজীরা নাচের মহলা দিত। কেবল ঐ ঘরখানি আমার হুকুমে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে; ওঘর ঐ ভাবেই বন্ধ থাকবে। বুঝেছ আমার কথা?

ঘাড় নেড়ে নীরদা বললেন ঃ বুঝেছি, আর এ গল্প তো তুমি আগেই বলেছিলে দাদা! বেশত, নাইবা ও ঘরখানা ওরা

নিলে, ও ঘর ছাড়াও তো তিন-চারখানা ঘর রয়েছে। তাতেই ওরা বর্তে যাবে। তুমি আমার ভারি মুখ রাখলে দাদা!

উল্লাসিনী ভগিনীর শেষের কথাগুলি গম্ভীর মুখে দাদা নীরবেই শুনলেন। আড়চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে নীরদাও মনে মনে হাসলেন; আর সেই সঙ্গে ভাবলেন যে, লোকে যে যাই বলুক এবং অন্যের কাছে তাঁর এই ভারিক্কী ধরণের ভাইটি যতই কঠিন বা কড়া মেজাজে থাকুন, তিনি যখন এসেই এ সংসারের ভার নিয়ে চেপে বসেছেন, এরপর এই অবুঝ দাদাটির নাকে দড়ি বেঁধে নিজের মর্জির তালে তালে ঘুরিয়ে কাজ বাগিয়ে নিয়ে তবে ছাড়বেন।

এরপর একটা ভালো দিন দেখে ফটিক ঘোষাল সপরিবার একটু আড়ম্বর সহকারেই বড় বাড়ীর বহির্মহলের বিস্তীর্ণ অঙ্গন অতিক্রম করে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট মহলের এলাকার মধ্যে প্রবেশ করলেন। নীরদাদেবীও যেন প্রস্তুত হয়েছিলেন; তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনা করলেন: আসুন ঘোষাল মশাই, আপনি কিন্তু বেশ মানুষ; সব জেনে শুনেও নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন! ভাগ্যিস্ মোক্ষ এগিয়ে এসে সব বলেছিল!

পুত্র নিতাই, তার ভৃত্য হাবুল এবং বড় বাড়ীর পরিচারিকাদের নিয়ে নীরদা দেবী এ মহল্লায় এসে আগন্তুকদেরই প্রতীক্ষা করছিলেন। ফটিক ঘোষাল এতটা ভাবেননি; এখন কর্তার ভগিনীকেও এখানে দেখে এবং তাঁরই মুখ থেকে সাদর অভ্যর্থনার বাণী শুনে আনন্দে বিহ্বল ভাবে একেবারে তাঁর

পদযুগলের সামনে মাথাটি নত করে দক্ষ অভিনেতার মত ভাবার্দ্র কণ্ঠে বললেন : আমাদের যে এত সৌভাগ্য হবে, তা কল্পনাও করিনি। আজ সপরিবারে আমি বড় বাড়ীর আঙিনায় এসে বড়বাড়ীর সর্বময়ী দিদিরাণীর পদাশ্রয় পেলুম। এতবড় দয়ার কথা আমরা কখনো ভুলব না। তবে দিদিরাণী দয়া করে যেন মনে রাখেন—আমরা আপনাদের আশ্রিত হয়ে প্রতিটি হুকুম মাথা পেতে নিয়ে তামিল করবার জন্যেই এখানে হাজির হয়ে আস্তানা পাতলুম।

নিজেকে একটু বিব্রত মনে করেই কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে কুণ্ঠিতভাবে নীরদা দেবী বললেন : আহা-হা, করছেন কি—উঠুন উঠুন ; এমন করে আমাকে লজ্জা দেবেন না।

মাথাটি তুলেই ধীরে ধীরে উঠতে উঠতে ফটিক ঘোষাল বললেন : আপনার চরণের তলায় মাথা ঠেকিয়ে যে আনন্দ আর ভরসা আমি পেয়েছি দিদিরাণী, তাতে আপনার লজ্জা টিকবে না। আশ্রয় যখন দিয়েছেন, তখন এরপর আমাদের তরফ থেকে যদি কিছু ভুলচুক হয়, আপনাকেই যে মানিয়ে নিতে হবে, যদি তেমন কিছু হয়, শাসন করবেন ; কিন্তু তা ব'লে পায়ে ঠেলতে পারবেন না কোনদিনই, আমি স্পষ্ট করে এখনই বলে রাখছি দিদিরাণী !

স্বামীর দেখাদেখি মোক্ষদাও যথাসময়ে নীরদা দেবীর পদ-বন্দনা করে তাঁর পাশটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এঁদের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে নিতাই বিভিন্ন মোটবাহক পরিচারকদের

আনাগোনা উদাস দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল। এ-পক্ষ থেকে ভৃত্য হাবুল ও পরিচারিকারা বাহকদিগকে ভিতরে যাবার পথ দেখিয়ে সাহায্য করছিল।

এমনি সময়ে বাহারী ছিটের পরিচ্ছদে সুসজ্জিত গৌরবর্ণ দুটি ছেলে-মেয়ে এক জোট হয়ে এগিয়ে এলো। পরক্ষণে যেন যন্ত্রচালিত এক জোড়া পুতুলের মত বিচিত্র ভঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে বসে নীরদার পদতলে একসঙ্গে মাথা নত করে প্রণাম জানাল।

হতচকিতভাবে এই প্রিয়দর্শন যুগল মূর্ত্তির পানে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে পরক্ষণে সে দৃষ্টি ফিরিয়ে মোক্ষদার মুখে নিবদ্ধ করে নীরদা জিজ্ঞাসা করলেন : এরা ?

এ প্রশ্নের জবাব দিলেন ফটিক ঘোষাল ; দু' পা এগিয়ে এসে করযোড়ে নিবেদন করলেন : আজ্ঞে, দিদিরাণীরই ভাগনে আর ভাগনী। অধীনের এই দুটিই ইহকালের ভরসা। কলকাতায় কাঁসারীপাড়ায় মামার বাড়ীতে এদের রেখেছিলুম, যাতে শহরের আদব-কায়দার সঙ্গে পড়াশুনা করে মানুষ হয়। কিন্তু ভগবান হঠাৎ তাতে কি মনে করে বাদ সাধলেন জানিনে। রোজগেরে মামার চাকরী নেই, সংসারে টানাটানি পড়েছে, তাই য়্যাদ্দিন পরে ভারটি নামিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। আমরাও এ-বাড়ীতে আসবার জন্যে গোছগাছ করছি, এমনি সময় এরা এসে উপস্থিত। ভাবলুম, এ মন্দের ভালো, দুটিতে দিদিরাণীর সেবাও তো করতে পারবে, আর তাঁর নজরে পড়লে এদের আর ভাবনা কি !

দিব্যি একটি ভঙ্গিতে ঘোষাল মশায়ের ছেলে ও মেয়ে এক-সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। নীরদাদেবী তাদের উপর দৃষ্টি রেখেই ঈষৎ স্নেহের সুরে পার্শ্ববর্তিনী ঘোষাল-গৃহিণীকে বললেন: তাহলে ভাই বলি, আমার মনের টানেই ঠাকুর এদের পাঠিয়েছেন। নিতাইকে নিয়ে আমি ভারি ভাবনায় পড়েছি; আমার মোটেই ইচ্ছে নয় যে. ঐ মথুর ভট্চাযের ডেঁপো মেয়েটার সঙ্গে ও মেশে! কিন্তু কি করি বল ভাই, দাদা আমার ও-মেয়েকে যেন সোনার চোখে দেখেছেন, তাছাড়া আর কে এখানে আছে বল যে ছেলেমানুষ তার সঙ্গে মেলা-মেশা করবে! এখন ঠাকুর আমার মন বুঝে এদের দুটিকে এনে দিলেন। বা! খাসা দুটি সোনারচাঁদ—যেমন ছেলে, তেমনি মেয়ে! পিঠোপিঠি বুঝি?

মোক্ষদা বললেন: না দিদি—ঠিক পিঠোপিঠি নয়, বছর তিনেকের আড়াআড়ি। ছেলে পনেরোয় পড়েছে, আর মেয়ের বয়স এখন তেরো।

প্রসন্ন মুখে ছেলেটির পানে চেয়ে নীরদা জিজ্ঞাসা করলেন: কি নাম তোমার বাবা?

হাত দুটি যোড় করে মিহি গলায় ছেলেটি উত্তর করল: আজ্ঞে, আমার নাম—শ্রীরমেশচন্দ্র রায়।

নীরদা বললেন: তাহলে তোমার ছেলে দেখছি আমার নিতাইয়ের চেয়ে এক বছরের বড়। নিতাই গেল কোথায়?

মায়ের পিছনে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট মনে নিতাই চমৎকার

জামাকাপড় পরা তারই প্রায় সমবয়স্ক বালক-বালিকা দুটিকে লক্ষ্য করছিল; মায়ের আহ্বান শুনে কাছে এসে দাঁড়াতেই নীরদা বললেনঃ শোন, এরা আমাদের আপনার লোক; ঘোষাল মশাই সম্পর্কে তোমার পিসেমশাই, আর ইনি তোমার পিসিমা হন। এঁদের ছেলেমেয়ে—

হঠাৎ মুখের কথাটি ঘুরিয়ে খপ্ করে হাত বাড়িয়ে মেয়েটিকে কোলের কাছে টেনে এনে নীরদা দেবী বলে উঠলেনঃ ভালো কথা, তোমার নামটি তো জানা হলো না মা—

আর বেশী কিছু বলতে হলো না, মেয়েটিই হাসিমুখে বললঃ আমার নাম—মিস্ স্বপ্না রায়।

মিস্ শব্দটির অর্থবোধ না হওয়ায় নীরদা দেবী একটু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ মিস্ কি মা—বুঝলুম না তো?

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল স্বপ্না, সেই হাসির ভিতর দিয়েই বললঃ মিস্ বুঝলেন না? পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা বুঝবে না, সহরে কিন্তু আইবুড়ো মেয়েরা নামের আগে মিস্ বলে, এর মানে হচ্ছে—কুমারী।

মৃদু হেসে নীরদা বললেনঃ ও, তাই বলো! সত্যি, তুমি তো মা অনেক শিখেছ দেখছি! হ্যাঁ মোক্ষ, তোমার মেয়েকে দেখে সত্যিই আমার মন আহ্লাদে ভরে উঠেছে; আর, আমার যে কি ইচ্ছে হচ্ছে, সে কথা এখন আর বলবো না। হ্যাঁ, যা বলছিলুম একটু আগে; নিতাই, তুমি বাবা রমেশকে দাদা বলবে; এক সঙ্গে তোমরা পড়বে, খেলা করবে, মেলামেশা

করবে। আর জানবে—ঐ সাধ্বি মেয়ের চেয়ে এরা দুটিতে তোমার বেশী আপনার।

মোক্ষদাও এই সময় কন্যাকে উদ্দেশ করে বলে দিলেন: আর তুমিও স্বপ্না খোকাবাবুকে দাদা বলবে। শুনেছ তো, এ বাড়ীর গিন্নী-মা ইনি, আমাদের খুব ভালবাসেন, তাই নিজের কাছে এনে রাখছেন। সম্পর্কে মাসীমা হলেও মায়ের বাড়া, ওঁর কাছে গিয়ে সেবা করবে, শুশ্রূষা করবে, যা হুকুম করেন শুনবে, তারপর কলকাতার ইস্কুলে যে-সব নাচগান শিখেছ, ফুরসং পেলেই দেখাবে শোনাবে।

বিস্ময়ানন্দে মুখখানা বিহসিত করে নীরদা দেবী শুধালেন: ওমা, মেয়ে তোমার এই বয়সে নাচগানও শিখেছে নাকি ?

মোক্ষদা সহাস্যে বললেন: কলকাতা সহরে ওগুলো যে শিক্ষার অঙ্গ হচ্ছে দিদি! স্বপ্না নাচে গানে লেখায় পড়ায় খুব নাম করেছে, কত সব মেডেল পেয়েছে। গুছিয়ে গাছিয়ে স্থিতি হয়ে বসি দিদি, সব দেখবেন।

একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে নীরদা দেবী বললেন: আ! শুনে বুকখানা আমার ঠাণ্ডা হোল বোন! ভগবান করুন, মথুর ভট্চায্যের মেয়ে সাধনার দর্প-ভ্যামাক যেন ভেঙে দেয় তোমার মেয়ে! দর্পহারীকে কি কম ডেকেছি—সে মুখ তিনি রাখলেন আজ।

বলতে বলতে নীরদা-ঠাকরুণ হাত দুখানি যোড় করে কপালে ঠেকিয়ে দর্পহারীরও মান রাখলেন।

ছয়

ঘোষাল-পরিবারকে বড় বাড়ীর ভিতরে এনে প্রতিষ্ঠিত করে নীরদা যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। এহেন নির্বান্ধব পুরীতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভগবান যে এমনভাবে সহসা হিতকারী সহায় জুটিয়ে দেবেন, তিনি তা কল্পনাও করেন নাই। ঘোষাল-গৃহিণী মোক্ষদা এখন সদাসর্বদাই নানা কল্প-কথায় তাঁর মনোরঞ্জন করেন, আর তাঁর ছেলেমেয়ে রমেশ ও স্বপ্না কি রকম দরদ দিয়ে তাঁরই আদরের দুলাল খোকার মন যুগিয়ে চলেছে, সে সব তো তিনি স্বচক্ষেই দেখছেন। অবিশ্যি, দাদা কানাইবাবুর সামনে এদের প্রসঙ্গে কোন কথা তুললেই তাঁর মুখখানি যে ভার হয়ে ওঠে, সেটা নীরদা দেবীর সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। তবে মুখ ফুটে তিনি কোনরূপ প্রতিবাদ বা আপত্তি তুলে নীরদার মনে ব্যথাও দেন নাই। এমন কি, মথুরবাবুর মেয়ে সাধনাকে বড় বাড়ীর হেঁসেল থেকে বহিষ্কার করবার পর নীরদা দেবী ভেবেছিলেন, হয়তো দাদার তরফ থেকে আপত্তি উঠবে, তার দরুণ তিনি কৈফিয়ৎ চেয়ে বসবেন। কিন্তু সেদিক দিয়েও তাঁর নিষ্ক্রিয়তায় তিনি আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লেন। এই সূত্রে ঘোষাল মশাই এবং তাঁর গৃহিণী নীরদা দেবীকে বুঝিয়েছেন যে, কর্তার মনের দুর্বল দিকটার সুযোগ নিয়েই তো এইভাবে অনেকে কাজ গুছিয়ে নিয়েছে, এখন তিনি শক্ত হলেই কর্তাও তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে

আসবেন। তবে এখনো পর্যন্ত আর একটা ব্যাপারে মনে মনে তিনি রীতিমত অস্বস্তি বোধ করে চলেছেন—সেটি হচ্ছে, অপরাহ্ণে বাহিরের বৈঠকঘরে কর্তার সামনে বসিয়ে নিতাই ও সাধনার পড়াশোনার নিয়মিত ব্যবস্থা। এখানে কিন্তু এতটুকু খুঁৎ হবার জো নেই—সব কাজ ফেলে নিতাইকে বই-খাতা নিয়ে বাইরের ঘরে হাজির হতে হবে। কানাই বাবু নিজেই শিক্ষা সম্পর্কে নূতন নূতন প্রশ্ন তোলেন, সাধনাকেই তার জবাব দিতে হয়। নিতাই ঠায় বসে বসে চুপটি করে শুধু শোনে। কানাইবাবুর ধারণা, এভাবে শোনা থেকেই নিতাই অনেক কিছু শিখতে পারবে। কিন্তু নীরদা ঠাকুরুণের এটা ভাল লাগে না। এই ব্যবস্থাটি বন্ধ হলেই তিনি যেন নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু সে সুযোগ মিলছে না কিছুতেই; তবে ঘোষাল-গিন্নী বলেছেন—'এর জন্যে ভাববেন না দিদি, রমেশ আর স্বপ্না যখন খোকাবাবুর সঙ্গে মিশেছে, ওরাই সে পথ খুলে দেবে দেখবেন।' কথাটা নীরদার মনে লেগেছে; ঘোষাল-গৃহিণীর ছেলে ও মেয়ে এরই মধ্যে তাঁকে এমনই আকৃষ্ট করেছে যে, তাঁর অন্তরের স্নেহের অনেকখানি এদের প্রতি ছড়িয়ে দিয়েছেন। এখন সাধনা মেয়েটিকে এ বাড়ীর সংশ্রব থেকে সরিয়ে দেবার জন্য তিনিও অস্থির হয়ে উঠেছেন।

রমেশ ও স্বপ্নাকে খেলার সাথীরূপে পেয়ে নিতাইও খুব খুসি হয়েছে। সে নিজেই সাধনাকে ডেকে এনে এদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, এদের বিদ্যা সম্বন্ধে বাড়িয়ে অনেক কথা

বলে ; উদ্দেশ্য, শুনে সাধনা যাতে চমকে ওঠে। কিন্তু সাধনা সে মেয়েই নয় ; প্রথম সাক্ষাতেই সে এই দুটি রত্নকে চিনতে পেরে এমনভাবে কথাবার্তা আরম্ভ করে যে, তারাই অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। তথাপি পাড়াগাঁয়ের এই 'মাষ্টারণী' মেয়েটির সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্যে তারা ফুরসৎ খুঁজতে থাকে। ভাই-বোন নিতাইকে পরামর্শ দেয়—'তুমি বড় লোকের ভাগনে, এত চাকর-বাকর থাকতে তুমি কেন পায়ে হেঁটে বেড়াবে ? ঐ হেবো চাকরটাকে ঘোড়া করে ওর কাঁধে চেপে বেড়াতে পার না ?'

পরামর্শটা সার্থক হলো। নিতাই ভারি খুসি।

সেদিন নিতাই ভিতরে এসে উল্লাসের সুরে বলল : জানো মা, আমার একটা ঘোড়া হয়েছে।

ঘোড়ার কথা শুনে ছেলের মুখের দিকে মা চেয়ে থাকেন। কিন্তু কোন প্রশ্ন নির্গত হবার আগেই রমেশ ও স্বপ্না এসে উপস্থিত! স্বপ্না সহাস্যে বলল : ঘোড়া মানে মা-মণি—মানুষ-ঘোড়া।

নীরদা বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন : সে আবার কি ?

রমেশ এগিয়ে এসে বলল : একটা ভারি মজা হয়েছে মা-মণি! ঐ হেবো চাকরটাকে তো খোকাবাবুর খাস খিদ্‌মতদার করে দিয়েছেন ; আমরা তাই মাথা খেলিয়ে ঠিক করেছি—খোকাবাবুকে ও কাঁধে করে নিয়ে বেড়াবে। কত বড় লোকের ভাগনে আমাদের খোকাবাবু, পায়ে হেঁটে বেড়াবে

কেন? হেবোর কাঁধে চেপে বসবেন, আর ঘোড়ার মতন ওঁকে নিয়ে ছুটবে হেবো।

নিতাই উৎফুল্ল হয়ে বলল: জানো মা, ওর কাঁধে চেপেছিলুম—পাঠশালার ছেলেমেয়েগুলো দেখেই একেবারে অবাক! সাধি কিন্তু চটে গেছে মা!

কথাগুলি নীরদা সানন্দেই উপভোগ করছিলেন। সাধনার কথা উঠতেই চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: কেন—তিনি চটলেন কেন?

স্বপ্না বলল: চাকরের ওপর তাঁর দরদ জেগেছে। এত বড় ধেড়ে ছেলের পক্ষে একটা মানুষের পিঠে চড়ে বেড়ানো নাকি ভারি অন্যায়—তাই তাঁর রাগ হয়েছে।

বিকৃত মুখে নীরদা বললেন: রাগ হলো তো বয়েই গেল। খোকন, তুই ওর চোখের ওপর হেবোর কাঁধে চড়ে বেড়াবি, দেখি ওর রাগে কি হয়?

সঙ্গে সঙ্গে এই নব ব্যবস্থার জন্য রমেশ ও স্বপ্নাকে আদর করে অনেক আশা ভরসার কথা শুনিয়ে দিলেন ঠাকরুণ; সেই সঙ্গে রেকাবি ভরে ভালো ভালো খাবার খাইয়ে পরিতুষ্ট করতেও ভুললেন না।

এখন থেকে নিতায়ের প্রধান খেলা বা সখ হলো হাবুলের পিঠে চড়ে রীতিমত টহল দিয়ে বেড়ানো। পিছন থেকে রমেশ ও স্বপ্না উৎসাহ দেয়। হাবুল ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাকে উত্তেজিত করবার জন্য পিঠে চাবুকও পড়ে।

পাঠশালার ছেলে-মেয়েরা সাধনাকে বলে ঃ খোকাবাবুর এখন ঐ এক খেলা হয়েছে সাধনাদি, চাকরের পিঠে চড়ে বেড়ানো।

সাধনা সংযত ভাবে জানায় ঃ আমিও তাই ভাবছি, চাকরী করতে এসে বেচারীর কি দুর্ভোগ! ছোট ছোট ছেলেমেয়ে লোকের কাঁধে চেপে বেড়াতে ভালবাসে জানি, কিন্তু নিতাইদার মতন ধেড়ে ছেলের এ কাজ খুবই অন্যায়। আশ্চর্য যে ওরও লজ্জা করে না; আহা, ঐ হাবুলের মুখ দেখলে আমার বুক ফেটে যায়।

একটি মেয়ে বলে ঃ তুমি তো কারুর অন্যায় দেখতে পারনা সাধনাদি, তুমি বারণ করতে পার না।

সাধনা জবাব দেয় ঃ তাহলে ওঁর মায়ের সঙ্গে আমার ঝগড়া বেধে যাবে। উনি কিছুতেই যে ছেলের দোষ দেখতে পান না, আমিও চাইনা ঝগড়া করতে; কিন্তু আমাদের সবার চোখে এটা যখন খারাপ ঠেকেছে, এর প্রতিকার হবেই!

এবং সে প্রতিকারটি এর পর একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবেই এসে পড়ল। অবাধে হাবুলের পিঠে যখন তখন উঠে ক্রমশঃ নিতায়ের সাহস এতই বাড়তে থাকে যে, সেদিন বিকালে অন্দর-মহল থেকেই হাবুলের কাঁধে চেপে বসে হুকুম করল ঃ বেশ কদমে চল্। আজ আর দালানে নামছি না, একেবারে মামাবাবুর ঘরে সেঁধিয়ে তাঁর ফরাসের উপর আমাকে নামিয়ে

দিবি। তারপর তুই বাইরে এসে দালানে বসে থাকবি, আমি ডাকলেই ঘরে গিয়ে আমাকে কাঁধে তুলে নিবি—তখন রাস্তায় টহল দেব। দেখে সবার তাক্ লেগে যাবে।

বেচারি হাবুল জানে, আপত্তি বা প্রতিবাদ করলে তার লাঞ্ছনার অন্ত থাকবে না। নীরবেই সে তার নূতন মনিবকে কাঁধে তুলে নিল।

নীচের বৈঠকখানায় তক্তপোষের উপর আস্তৃত সাদা ধবধবে ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসেছেন কানাই চৌধুরী। সামনে বসে সাধনা ছোট দপ্তরটি থেকে পড়ার বইগুলি বার করছে—এমন সময় বাইরে থেকে তালু ও জিহ্বার সংযোগে একটা তীব্র স্বর উঠল : হ্যাট্-হ্যা-ট্-হ্যাট্!

কানাই চৌধুরী সচকিতভাবে সাধনার দিকে চেয়ে শুধালেন : বাড়ীর ভিতরে ঘোড়া এলো কোথা থেকে?

সাধনা ধীরে ধীরে জবাব দিল : মানুষ-ঘোড়া, জেঠামণি!

কানাই চৌধুরীর মুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠল। পুনরায় প্রশ্ন করলেন : মানুষ-ঘোড়া?

গম্ভীর মুখে সাধনা বলল : হ্যাঁ। কেন, আপনি কি জানেন না—জেঠামণি, আপনার ভাগনে ক'দিন থেকেই হাবুলকে ঘোড়া করে তার পিঠে চড়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন? মাটীতে পা দেওয়া ওঁর পক্ষে বোধ হয় এখন অপমান!

কানাই চৌধুরী : আমি তো এর কিছুই জানি না।

সাধনা : কিন্তু এ গ্রামে জানতে কারও বাকি নেই। ঘোড়া

হয়ে বেচারীর কি শাস্তি! মানুষের ওপর মানুষের এ অত্যাচার চোখে দেখা যায় না।

কানাই চৌধুরী: বল কি?

আর বলতে হলো না; হাবুল-ঘোড়া কদমে কদমে পা ফেলতে ফেলতে তার সওয়ারকে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল, তারপর দেখতে দেখতে ফরাসের কিনারায় এগিয়ে এসে হেঁট হয়ে তাকে তক্তপোষের উপর নামিয়ে দিল। এই সময় হাবুলের বামদিকের পাঁজরে সাধনার দৃষ্টি পড়ল; দর-দর ধারে সেখান থেকে রক্ত ঝরছিল। শিউরে উঠে সমবেদনার সুরে সাধনা শুধাল: ওকি! তোমার পাঁজর বেয়ে রক্ত পড়ছে যে!

দৃশ্যটা কানাইবাবুর চোখেও পড়ল। তিনিও সমবেদনার সুরে শুধালেন: কি করে কাটল?

মুখে ম্লান হাসি এনে হাবুল বলল: খোকাবাবু কাঁধের উপরি উঠে 'হ্যাত হ্যাত' কইতি কইতি জুতির গোড়ালি দিয়ে ঠোকর দিলেন কিনা—তাইতে কাইটে গেছে কর্তা!

কিন্তু সাধনা ইতিমধ্যে যে কাণ্ড করে বসেছিল, সেদিকে নজর পড়তে কানাইবাবুও হতচকিত হয়ে উঠলেন। সে তখন তাড়াতাড়ি তার দপ্তর থেকে এক ফালি শুকনো ন্যাকড়া এবং কৌটোয় ভরা একটা মলম নিয়ে হাবুলের পরিচর্যা সুরু করে দিয়েছে। ঘরের একদিকে জলপাত্র ছিল; তার জলে ক্ষতস্থান মুছে পরিষ্কার করে কৌটোর মলম লাগিয়ে দিব্যি একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার এই অপ্রত্যাশিত পরিচর্যা দেখে গাঢ়স্বরে কানাইবাবু বললেন : ভারি আশ্চর্য তো! ফরসা ন্যাকড়া, মলম—এ সব তুমি কি দপ্তরে ভরে রাখো বই-এর সঙ্গে মা ?

সাধনা উত্তর দিল : হ্যাঁ জেঠামণি, এগুলোও শিক্ষার অঙ্গ যে! কখন কি দুর্ঘটনা ঘটে বলা যায় না তো, তাই সঙ্গে রাখা। এই দেখুন না—কেমন কাজে লাগল।

কানাইবাবু : ওটি কিসের মলম, মা ?

সাধনা : খুব সাধারণ জিনিস জেঠামণি, কিন্তু গুণে অসাধারণ। টাট্‌কা নিমপাতা শীলে বেটে ঘীয়ে হালুয়ার মত ভাজাভাজি করে মোমের সঙ্গে মিশিয়ে কৌটোয় ভরে রাখি। কাটা জায়গায় দিলে আর সেফটিক্ হবার ভয় থাকে না—টিংচার আয়োডিনের কাজ করে।

কানাইবাবু এই সময় হাবুলকে লক্ষ্য করে বললেন : তুই এখন যা—বিছানায় শুয়ে থাকগে।

সভয়ে হাবুল বলল : এহানেই হাজির থাকি কর্তা, খানিকটা বাদেই তো খোকাবাবুরে কাঁধে নিয়ে—

হাবুলের এই কথার উত্তরে দৃঢ়কণ্ঠে সাধনাই প্রতিবাদ করল : না। খোকাবাবু এর পর আর কোনদিন মানুষ-ঘোড়ার কাঁধে 'চাবু' করবেন না। তুমি বিছানায় শুয়ে পড়গে।

কথাটা নিতাইয়ের কানে বাজল ; সেও প্রতিবাদ করে উঠল : বা-রে! আমি যাব কি করে ?

সাধনা বলল যেমন করে সবাই যায়—নিজের পায়ে হেঁটে।

এই কথার পিঠেই সে কানাই চৌধুরীকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল: জানেন জেঠামণি, ফরাসীদেশে বড় লোকদের ছেলেরা এক সময়ে ইস্কুলে গিয়ে চুটিয়ে নবাবী করতো। তাদের পিছনে থাকত একটা করে ঘোড়া, তার সইস, আবার ফাই-ফরমাস শুনতে চাকর। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির নাম শুনেছেন তো—গেরস্ত ঘরের ১২।১৩ বছরের ছেলে, ওদের সঙ্গে পড়ত। সেই ছেলে একদিন মাষ্টারদের সামনে দাঁড়িয়ে বলল—'ইস্কুলে যতক্ষণ আমরা আছি, সবাই আমরা সমান। এখানে কারুর বড়মানুষী চলবে না। কেউ সঙ্গে চাকর আনতে পারবে না—কাজকর্ম যা করবার নিজের হাতে করা চাই।' এই কথার পর খুব একটা হৈ-চৈ পড়ল, আর বড়লোকের ছেলেদের নবাবীর পাটও সেদিন থেকে উঠে গেল। আজ আমিও আপনার সামনে বলছি জেঠামণি, আপনার ভাগনে যদি আমাদের সঙ্গে পড়তে চান, আমাদের মতন চালেই ওঁকে চলতে হবে, আমাদের কাছে কোন রকম বড়মানুষী দেখাতে পারবেন না উনি। সবার চোখে লাগে—অন্যায় মনে হয়, এমন কাজ করা কোনদিন ওঁর চলবে না।

সাধনার কথাগুলি শুনতে শুনতেই কানাই চৌধুরী মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠছিলেন। তার কথা শেষ হতেই দৃঢ়স্বরে তিনিও বলে উঠলেন: বেশ বলেছ মা, তাই হবে। এর ওপর

আর কথা নেই। এখনি আমি এর বিহিত করছি। 'হেবো, শোন্—এরপর আর কোনদিন তুই খোকাবাবুকে কাঁধে তুলবি না, কেউ বললেও না। এ আমার হুকুম।

ওদিকে বৈঠকখানার বাইরে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে রমেশ ও স্বপ্না ঘরের ভিতরের কথা সব শুনছিল। কানাইবাবুর হুকুম শুনেই তারা দু'জনে উঠি পড়ি অবস্থায় ভিতর মহলে ছুটল। তারা জানে, এদিন বড়বাড়ীর 'মা-মণি' তাদেরই মহল্লায় এসেছেন—মায়ের সঙ্গে গল্প করছেন। ফটিক ঘোষালের নির্দেশমত এরা ভাই-বোন নীরদাকে 'মা-মণি' বলেই সম্ভাষণ করে। নীরদারও খুব ভাল লেগেছে—'মা-মণি' বলে ডাকাটি। মোক্ষদাকে তাই এদের মিষ্ট ব্যবহারটির প্রশংসা করে বলেন—'হাজার হোক কলকাতায় সহবৎ শিখেছে ত! তাই এমন সুন্দর কথাবার্তা, আর আক্কেল বিবেচনা।'

সেদিন মোক্ষদা ঠাকরুণ বিনিয়ে বিনিয়ে মথুর ভট্চাযের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছিলেন : কর্তাবাবুকে সাদাসিধে মানুষ দেখে বাপ-বেটি দু'জনে মিলে গুণ করেছে দিদিরাণী! নৈলে চাকর হয়ে কিনা মনিবের সমান চালে চলেন? ওঁরা বলেন—'উপরি পাওনাগণ্ডা হলো জমিদারের হাতের পাঁচ, ওর দৌলতেই যত বড়াই; উনি কিনা ওটা বন্ধ করে রেয়তদের সো হলেন। তাদের সঙ্গে সড় আছে নিশ্চয়ই—মালিককে বোকা বুঝিয়ে নিজের পেট ভরাচ্ছেন—ডুবে জল খেলে কে জানতে পারে? কর্তা ত সদাশিব, মথুরবাবুর ওপর সব ভার দিয়েই নিশ্চিন্তি।'

গভীরভাবে মন নিবিষ্ট করে নীরদাদেবী এ হেন হিতৈষিণী আপনার জনের কথাগুলি শোনেন, আর মনের মধ্যে গেঁথে রাখেন। এ সব কথার কোনটি যে মিছে নয়, বাড়িয়ে বলা হয়নি—এ বিশ্বাস তাঁর চিত্তে দৃঢ় হয়ে যায়। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে সমর্থনসূচক ভঙ্গি করে জানিয়ে দিলেন—'আমি এ বাড়ীতে এসেই ও গোষ্ঠীকে চিনেছি গো—যেমন বাপ, তেমনি বেটি, আর ছোট্ট ছেলেটিও যেন ধানি লঙ্কা। ছুঁড়িটাকে কতকটা ঢিট্ করেছি, এর পর ও মিন্‌সেকেও সায়েস্তা করে তবে ছাড়ব। তোমরা যখন সহায় আছ ভাই, আমি কিছু ভাবি না।'

এই আলোচনার মধ্যে স্বপ্না এক রকম ছুটতে ছুটতে এসে বলল: মা, শুনেছ—নিতাইদা'র আজ যা খোয়ার হয়েছে—

উভয়েই চমকে উঠে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। তন্মধ্যে মোক্ষদাই সর্বাগ্রে শুধালেন: সে কিরে?

স্বপ্না তখনো হাঁপাচ্ছিল। নীরদা তাকে সস্নেহে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন: হাঁপাচ্ছিস যে মা—কি হয়েছে বল ত শুনি?

স্বপ্নার আশৈশব অভ্যাস, যা কিছু দেখবে শুনবে, অন্যের কাছে সে সব নিজের মর্জিমত বাড়িয়ে বলা। কাজেই বৈঠক-ঘরের ব্যাপারটি সে এইভাবে এখানে প্রকাশ করল: নিতাইদা'র অপরাধ, তিনি হেবোর কাঁধে চড়ে কর্তাবাবুর বৈঠক ঘরে যান, সাধি সেখানে বসে তাঁর সঙ্গে গল্প করছিল। তারপর হেবো তার কাঁধ থেকে নিতাইদাকে নামাতেই মেয়ে একেবারে

ফুলকো মুখী হয়ে উঠলেন ! বলে কিনা—'চাকর ব'লে ওকি মানুষ নয়? এত হেনস্তা।' কর্তাবাবুও অমনি হুম্‌কি দিয়ে হেবোকে বললেন—'খবরদার বলছি, আর কোনদিন তুই খোকাবাবুকে কাঁধে করবি না।' তারপর গো মা-মণি, মেয়ের মুখ দিয়ে যেন খই ফুটতে লাগল—কর্তাবাবুকেই ঠেস্ দিয়ে বলল—'ফের যদি আপনার আদুরে ভাগনেকে কোনদিন এভাবে বড়মানুষী ফলাতে দেখি, পিটে ঢিট্ করবো।'

স্বপ্নার এই নির্ঘাত বার্তায় কক্ষমধ্যে যেন একটা বোমা সশব্দে বিদীর্ণ হলো।

ঠিক সেই সময় ফটিক ঘোষাল বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে ক্ষুদ্র উঠানটি পেরিয়ে বারাণ্ডায় উঠতেই ঘরের ভিতর থেকে কন্যার চড়া সুরের কথা তাঁর কানে বাজল। বুঝলেন, ঘরের মধ্যে ও-বাড়ীর দিদিমণির অধিষ্ঠান হয়েছে। তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে প্রস্তুত হোয়ে দক্ষ অভিনেতার ভঙ্গিতে ঘরের মধ্যে সেঁধিয়েই মেঝে থেকে বিঘত প্রমাণ উঁচু পর্য্যন্ত মাথাটি নুইয়ে তক্তপোষের উপর উপবিষ্টা দিদিরাণীকে অভিবাদন করে বললেন: কি সৌভাগ্য আমাদের—আজও দিদিরাণীর পায়ের ধূলো পড়েছে! আমি ত ভাবছিলাম, বাড়ীতে এসেই স্বপ্নাকে দিয়ে খবর পাঠাব আপনার কাছে—তা দেখছি, স্বপ্না আগেই এসে গেছে! শুনেছেন ত সব?

নীরদা দেবীর মুখমণ্ডলে বুঝি দেহের সমস্ত রক্ত এসে জমেছিল, মুখের কথা তার আবেগে নির্গত হোতে বাধা

পাচ্ছিল। তথাপি বিকৃত-কণ্ঠে তিনি বললেন : শুনেছি, আর ভাবছি—আমার দাদার আস্কারা পেয়ে রাস্তার ঝরা-পাতা আজ কোথায় গিয়ে উঠেছে।

আনন্দ চেপে রেখে হাত দু'খানা কচলাতে কচলাতে ফটিক ঘোষালও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন : কথার মত কথা বলেছেন দিদিরাণী! আপনি এখানে এসেই ও গোষ্ঠীকে চিনে ফেলেছেন। চাকরের মেয়ে—তার এত তেজ! বলে কি না—নিতাইবাবুর বড় মানুষী চলবে না, ওঁর সঙ্গে সমান চালে চলতে হবে। আর, হুজুর কিনা—

মোক্ষদা দেবীও এই সময় স্বামীর কথাটাকে গুরুত্ব দেবার উদ্দেশ্যে বলে ফেললেন : হুজুরকে যে গুণ ক'রে গোলাম করে ফেলেছে গো! সেই কথাই ত দিদিরাণীকে বলছিলুম—

স্বপ্না মুখখানা ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল : তুমিও তা'হলে সব শুনেছ বাবা?

ফটিক ঘোষাল উত্তর করলেন : হাওয়ার মুখে ও-খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে যে—কারও জানতে আর বাকি নেই। কিন্তু শুনেই আমার সর্বশরীর রাগে নিস্‌পিস করে ওঠে, সেই জন্যেই ত ছুটে আসছি—দিদিরাণীকে সব জানিয়ে এর একটা বিহিত করব বলে। এসে দেখি দিদিরাণী নিজেই—

নিজের কথা উঠতেই দিদিরাণী একটু গম্ভীর হয়ে বললেন : স্বপ্নার মা'র সঙ্গে নিরিবিলিতে খানিকক্ষণ গল্প করব বলেই

এসেছিলুম—মনের কথা বলবার ত আর মানুষ পাই না। ওমা, একটু পরেই স্বপন হন্ত-দন্ত হয়ে এসেই ত ঐ খবর দিলে!

মুখখানা বেশ কঠিন করে মোক্ষদা বললেন: আপনি এখন খুব শক্ত হোন দিদি! এই দেখুন না, আমার ছেলেমেয়ে এখানে আসা অবধি, ও-মেয়ের কি আক্রোশ গো! এরা ভাই-বোনে খোকাবাবুর তোয়াজ করে ব'লে—নাক মুখ সিঁটকে পাঠশালার ছেলেমেয়েগুলোর কাছে লাগানো হয়—এরা হোচ্ছে খোসামুদে, চাটুকার! আসলে একে হিংসে ছাড়া আর কি বলি বলুন!

ফটিক ঘোষাল কথাটা যেন লুফে নিয়ে জোর দিয়ে বলতে লাগলেন: হিংসেই ত! এই যে দিদিরাণীর কৃপায় বড় বাড়ীর বুকে আশ্রয় পেয়েছি, এর জন্যে সেরেস্তা-শুদ্ধ লোকের গায়ে যেন জ্বালা ধরেছে। এর ওপর আমাদের আরো অপরাধ—মনিবের মতনই আপনাদের মানি; আমার স্ত্রী-পুত্র-মেয়ে—এরা সবাই জানে—আপনাদের খেয়েই মানুষ। নিমকহারামী করতে আমরা জানিনে—এই হোচ্ছে আমাদের দোষ গো দিদিরাণী, তার জন্যে কত কথা!

নীরদাদেবী তেমনি গম্ভীর ভাবেই বললেন: আমি সব জেনেছি ঘোষাল মশাই—সবই জেনেছি। লোক চিনতে আমার বাকি নেই। দাদা খালি টাকাই উপায় করেছেন, সংসারী ত হ'ন নি—মানুষ চিনবেন কি করে? কিন্তু যখন এ-সংসারে সেঁধিয়েছি, ওঁর চোখ খুলে দেবই। তখন দেখবেন

এই মানুষের আর এক মূর্তি! গুণ অমনি করলেই হলো! আমি বুঝি বানের জলে ভেসে এসেছি? আচ্ছা খোকা আসুক, তার মুখেও সব শুনি, তখন বিহিত একটা করতে হবে বৈকি। আপনার জন হয়ে আপনি যখন সহায় আছেন, আমি কিচ্ছু ভাবি না। এখন তা'হলে উঠি বৌ!

শেষের কথাটা মোক্ষদাদেবীকে লক্ষ্য করে বলেই নীরদা ঠাকরুণ উঠে পড়লেন। ফটিক ঘোষাল শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠল: স্বপন, তুমি সঙ্গে যাও—মা-মণিকে পৌঁছে দিয়ে এস।

নীরদাদেবী বাধা দিয়ে বললেন: না, না, ওকে আর ছুটোছুটি করতে হবে না—এ দিকের পথ আমার চেনা হয়ে গেছে।

'চলুন, আমি সিঁড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি দিদি!'

বলতে বলতে মোক্ষদাও নেমে পড়ে নীরদাদেবীর পিছনে পিছনে চললেন। ঘোষালও হাত দু'খানা কচলাতে কচলাতে সময়োপযোগী দু'চারটে মনে লাগবার মত রচা-কথার ফোড়ন দিতে দিতে উভয়ের অনুগমন করলেন।

সাত

বাইরের ঘরের ব্যাপারটির কথা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করবার জন্য নীরদাদেবী তাড়াতাড়ি উপরে চলে এলেন বটে, কিন্তু খোকার দেখা পেলেন না; দেখলেন, তাঁর ঘরের সামনে দরদালানের এক পাশে, হাবুল বসে বসে ঝিমুচ্ছে। নীরদা দেবীর সাড়া পেয়েই সচকিত ভাবে উঠে দাঁড়াল। অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে তার পানে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: খোকাবাবু কোথায়? তুই তাকে ছেড়ে এখানে এসে ঘুমুচ্ছিস্ যে বড়?

কাঁচুমাচু অবস্থায় হাবুল যা বলল, তাতে সাধনাই যে তাঁর পুত্রকে 'পিটে টিট করে দেবে বলেছে, এমন কথা নেই, বরং কর্তাবাবুই তাকে হুকুম করেছেন যে, এখন থেকে সে আর যেন খোকাবাবুকে কাঁধে করে না বেড়ায়।

এর পর তার কোমরে সাদা কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা দেখে জিজ্ঞাসা করতে তার উত্তরে যে-সব কথা শুনলেন, স্বপ্না ত সে সম্বন্ধে কিছুই তাঁকে বলেনি। বুঝলেন, খোকার জুতোর ঠোক্করে গায়ের চামড়া কেটে রক্তপাত হোতেই এ অনর্থ ঘটেছে; সাধি দরদ দেখিয়ে পটি বেঁধে দিয়েছে, তাই দেখে কর্তার সমস্ত রাগ খোকার ওপর গিয়ে পড়েছে। নিজের মনে ব্যাপারটি বুঝে নীরদা দেবী স্থির করলেন, আজকের এই কাণ্ড নিয়ে আর বেশী হৈ-চৈ করা ঠিক নয়। তিনি ত শুনেছেন, কর্তার মুখ থেকে যে-কথা বেরিয়ে যায় তার

নড়চড় কখনো হয় না। কাজেই, কর্তার ওপর আর কথা না তোলাই উচিত।

মনে মনে এই সাব্যস্ত করেই তিনি হাবুলকে বললেন: খোকাবাবুকে কাঁধে করতে তোর কষ্ট হয়, খোকাবাবু তোকে মারধোর করে, এ সব কথা আমাকে বলিস্ নি কেন? আমি তা'হলে ওকে কাঁধে নিয়ে বেড়াতে তোকে বারণ করে দিতুম। এর পর আর ওকে কোনদিন কাঁধে তুলবি নি। শরীরটা যখন তোর ভাল নয়, ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকগে যা।

হাবুল অবাক হোয়ে ভাবে, ভূতের মুখ দিয়ে আজ রাম নাম বেরুল যে! এমন মিষ্টি কথা এই ঠাকরুণটির কড়া মুখে কোনদিন ত সে শোনে নি! হাবু বেরিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় নীরদাদেবী আবার তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন: দাদাবাবু কোথায় গেছে বললি নি ত?

হাবুল ফিরে দাঁড়িয়ে বলল: ঐ যে রমেশবাবু এয়েছেন, তেনার সাথে বেইরে গেলেন যে!

'হুঁ! আচ্ছা, তুই যা এখন।' বলেই নীরদাদেবী গৃহমধ্যে প্রবেশ করলেন।

এ-বাড়ীতে আসার পর দাদার আজিকার হুকুমটি শুনে অবধি নীরদাদেবীকে উদ্বিগ্ন হোতে হয়েছে বৈ কি। তাঁর ব্যবস্থার ওপর এভাবে কোনদিনও তিনি চড়া সুরে কখনো আপত্তি করেন নি। এ অবস্থায় দাদার হুকুমের ওপর এখন কি বলবেন, কেমন করে নিজের মান রাখবেন, এই চিন্তাই

এখন প্রবল হয়ে ওঠে। পালংকের উপর বসে নিজের মনে নানা প্রকার জল্পনা করছেন, এমন সময় কর্তার খাস ভৃত্য শিবু ঘরের দরজার কাছ থেকে বলল: দিদিমা, কর্তাবাবু ওপরের ঘরে এসেছেন ; আপনাকে একবার ডাকছেন।

দাদা আজ অসময়ে সন্ধ্যার আগে ভিতরে এসেই ডেকেছেন শুনে নীরদাদেবীর বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করে উঠল। দাদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কাজই ত করেছেন এর আগে, কিন্তু এভাবে কোনদিন কথা ওঠেনি, আর তাঁর মনেও এমন আতঙ্ক হয়নি। যাই হোক, আস্তে আস্তে উঠে পা টিপে টিপে দু-তিনটে দালান ও বারাণ্ডা পার হয়ে দাদার ঘরে সেঁধুলেন। তখনো তাঁর বুকের ভিতরটা কাঁপছে।

ওদিকে ভাগনের ব্যাপারে তাকে শাসন করে এবং সাধনার পক্ষ নিয়ে হাবুলের উপর চড়াসুরে হুকুম দিয়ে মথুরবাবুও মনে মনে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। মথুরবাবু আসতে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। একথা সেকথার পর এদিনের অপ্রীতিকর ব্যাপারটি তুলে মথুরবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন—কাজটা কি ভালো করেছি ?

মথুরবাবু সমর্থনসূচক উত্তর দেন—নিশ্চয়ই। এতে সন্দেহ করবার কি আছে ?

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে কানাইবাবু উত্তর দেন—আমার এই ভাগনে আর ভগিনীকে নিয়ে সংসারে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তাতে নিজের স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধিও বুঝি

হারাতে বসেছি। সাধনা মা তাঁর বুদ্ধি দিয়ে আমার অবস্থাটা বুঝেই জানতে পেরেছেন, সব থাকতেও আমি আজ কতবড় অসহায়।

অবস্থাটা কিছু কিছু সাধনার কাছেই জেনেছিলেন মথুরবাবু, তারপর শুধু তিনি নন, সেরেস্তাশুদ্ধ প্রায় সকলেই জেনেছেন যে, বজবজের বস্তী থেকে নিজের বিধবা ভগিনীটিকে এ-বাড়ীতে আনার পর থেকেই তাঁদের কর্ত্তাবাবুর শান্তির সংসারে ক্রমে ক্রমে অশান্তির একটা ছায়া পড়ছে।

মথুরবাবু সব বিষয়ে স্পষ্ট বক্তা হলেও এ সম্বন্ধে কর্ত্তাকে কিছুই বলেন নি। এবাড়ীতে তাঁর কন্যার যে প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা ছিল, কর্ত্তার পুত্রবতী ভগিনীর আসার পর ক্রমশঃ সেটি যে হ্রাস পাচ্ছে, এ-খবর সেরেস্তার সকলেই জেনেছে। কিন্তু এ-অবস্থায় কর্ত্তা নিজেই যে ওদের প্রভাবের আওতায় পড়ছেন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেটা উপলব্ধি করেও মথুরবাবু এই ভেবে নীরব থাকতে বাধ্য হন যে, পাছে কথা ওঠে—নিজের স্বার্থহানির আশঙ্কাতেই তিনি কর্ত্তাকে তাঁর অতি আপনার জনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য উত্তেজিত করছেন। অথচ, এই সহৃদয় মহাপ্রাণ মানুষটি মথুরবাবুকে তাঁর একান্ত হিতার্থী জেনে সমস্ত ভার তাঁর উপর সমর্পণ করে যখন নিশ্চিন্ত, সে ক্ষেত্রে তাঁর অন্তরের গুরুভারটি লাঘব করতেও কি তিনি বাধ্য নন? এই দ্বন্দ্ব যখন চলেছে, সেই সময় কানাইবাবু এই প্রথম মথুরবাবুর কাছে তাঁর জীবনের সমস্যাময় পরিস্থিতিটির কথা

উল্লেখ করেন এবং এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম আলোচনার অবকাশ ঘটে।

কানাইবাবু নিজেই কথাটা তুলতে মথুরবাবু সুস্পষ্ট ভাবেই তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন—আমি যখন আপনার সব কিছু দেখা শোনার ভার নিই, সে সময় পারিবারিক ব্যাপারটা না থাকায় কোন সমস্যাই ছিল না। আপনাকেও বাড়ীর ভিতর থেকে উৎপন্ন কোন রকম সমস্যার ভারে বিব্রত হোতে হয় নি। কিন্তু ঘটনা চক্রে ভগিনী ও ভাগনেকে পেয়ে একটা সংসার যখন পাততে হয়েছে, আর ওরাও আপনার স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, তখন সমস্যাও উঠবে, আর তাই নিয়ে ছোট খাট সংঘাতও হবে। এ ক্ষেত্রে আপনার বিচার-বুদ্ধির উপর এর নিষ্পত্তি নির্ভর করছে। আপনি শক্ত হোলে কোন কথা নেই, নতুবা কিছুতেই এর নিষ্পত্তি হবে না, একটা না একটা ঘটনা উঠে আপনাকে করবে জ্বালাতন, আপনিও নিজেকে পদে পদে একান্ত নিরুপায় ভেবে অস্থির হয়ে উঠবেন।

কানাইবাবু সহর্ষে বলে উঠলেন: বা! আপনি খাসা কথা বলেছেন, আর আমার রোগটাও ঠিক ধরে ফেলেছেন। সত্যিই আমি নিজেকে আজ খুবই দুর্ভাগা আর নিরুপায় মনে করছি। হ্যাঁ, আপনি ঐ যে শক্ত হবার কথা বলছেন, তা যদি হোতে পারতুম, তাহলে তো কোন কথাই ছিল না। কিন্তু দেখুন মথুরবাবু, আজ আপনাকেই বলি, অর্থ উপার্জ্জনের সময় যেমন শক্ত হয়েছিলুম আমি, সেটা মিটে গেলে শক্ত হয়েছি কোনখানে

জানেন—উপার্জিত অর্থকে রক্ষা করবার কিম্বা আয়কর কোন কাজে লাগাবার ব্যাপারে। এ ছাড়া আর সব দিকেই আমি একেবারে হাল্কা। সেদিন গল্প শুনেছেন ত, পৈতৃক ভিটে-বাড়ী যে লোক দেনার দায়ে কিনে নিয়েছিল, তাঁর যথাসর্বস্ব হাতে এলেও শক্ত হতে পারি নি। এই দেখুন না, বিয়ের পর থেকে বোনের পাট একরকম চুকেই গিয়েছিল; আমার অত আপদ বিপদে বোন বা তার স্বামী কোন খোঁজ খবরই নেননি। তারপর, সেই বোন যখন বস্তী থেকে একান্ত অসহায় অবস্থায় চিঠি লিখলেন, পেরেছিলুম কি চুপ করে থাকতে? সেখানে যে হালে মা আর ছেলেকে দেখেছিলুম, সে আর কহতব্য নয়। কিন্তু বোনটি—যদি এখানে এসে এখানকার পরিবেশ দেখে আমার দৃষ্টান্ত নিয়ে চলতে অভ্যস্ত হোতেন, ছেলেটিকেও ঠিক আমার হাতে সঁপে দিতেন, তাহলে কোন কথাই আজ উঠত না। কিন্তু বোনটি এসেই ওর ছেলেকে মামার সর্বস্বর ভাবী মালিক ভেবে ওরই স্বার্থের দিকে চেয়ে চারধারে বেড়া লাগাতে স্থুরু করে দিয়েছেন। যাকেই ভাবছেন স্বার্থের পরিপন্থী, তার ওপরেই খড়্গাহস্ত হয়ে উঠছেন। অথচ আমিও বুঝছি—যত বাড়াবাড়িই করুক, শক্ত হোয়ে ওকে দশ কথা শুনিয়ে দেবার সাধ্যও আমার নেই। এই হচ্ছে এখন সমস্যা।

মথুরবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বলেন—তাহলে আমাকেও বলতে হচ্ছে চৌধুরী মশাই, সমস্যাটি সোজা নয়। ওঁর যেরকম প্রকৃতি, আমি যতখানি জেনেছি, আর আপনার

কাছে শুনেছি, তাতে খোসামুদেরাই ওঁর কাছে প্রশ্রয় পেয়ে উৎপাত আরম্ভ করবে, তখন আপনার পক্ষেও তাদের সায়েস্তা করা সম্ভব হবে না। তাহলে কি করে আপনি সামলাবেন?

কানাইবাবু বললেন,—সেই পরামর্শই করব বলে আপনাকে ডাকিয়েছি। আমার এখন কথা হচ্ছে মথুরবাবু, নিতাই ছোকরাটিকে গড়ে পিটে মানুষ করে তোলা। তার হদিস জানে আপনার মেয়ে। এই বয়সে আমি ও মেয়ের যে বিদ্যা বুদ্ধি বিবেচনা দেখিছি, তাতে মনে হয়—একমাত্র ওরই পক্ষে এ কাজ সম্ভব। আপনার মেয়েই আমাকে বলেছে, ওর মাথা থেকে দুষ্টবুদ্ধিটাকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে শুভবুদ্ধি যোগান দিতে হবে, আর এ কাজ নাকি সম্ভব। আমি তাই সাধনার ওপর ওর ভার চাপিয়ে এই কথা বলতে চাই—অজ্ঞান অবোধ আহাম্মুখ এই ভেবে ওকে শোধরাতেই হবে। এর জন্য হয়ত আমাকে অনেক দুর্বাক্য শুনতে হবে, আত্মসম্মানে আঘাতও লাগবে, এমন সব অবস্থাও হয়তো আসতে পারে, মা ও ছেলে দু' তরফ থেকেই, কিন্তু সাধনা মাকে পাঁকাল মাছের মত কাদার ভিতরে থেকে নিজেকে কাদা এড়িয়ে কাজ করে যেতে হবে। এর জন্যে আমার সমস্ত মন ওদিকে পড়ে থাকবে, আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে মহামায়ার কাছে প্রার্থনা চলবে, সাধনা-মা সব ঝড় ঝাপটা কাটিয়ে শেষ পর্য্যন্ত ঐ গাধাটাকে যাতে সত্যিকার মানুষ করে তুলতে পারে। তখন বুঝবেন, ভবিষ্যতের একেবারে শেষ দিকটায় একটা

উঁচু কল্পনায় আমি কি ছবি এঁকে রেখেছি! কিন্তু এখন সে কল্পনাই থাকুক। সাধনাকে আমি যদি বলি, সে রাখবে আমার কথা, কিন্তু তার আগে আপনাকেও আমার বলা উচিত।

মথুরবাবু বলেন—সাধনা যদি সত্যই এ দায়িত্ব নিতে চায়, আমি বরং উৎসাহ দেব। আর, যে শিক্ষা সে পেয়েছে, সেদিক দিয়ে এও একটা মস্ত পরীক্ষা।

মথুরবাবুর কথায় প্রসন্ন হয়ে কানাইবাবু তখন বলেন—এইখানে আপনারও মহত্ত্ব। আমি জোর করে বলতে পারি, সাধনার ওপর যে ভার আমি চাপাতে চাইছি, তার উল্টো দিকটার কথা ভেবে কোন বাপই তাকে এগুতে দিত না। কিন্তু মেয়ের ওপর আপনার দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলেই, আপনি সম্মত হলেন। তবে আমিও মাথা খেলিয়ে আমার বোনটিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এমন কিছু আশার আলো দেখাব, যার জন্যে সেও সাধনার ওপর দরদ দেখাবে—ভাল চোখেই ওকে দেখবে।

এভাবে আলোচনার পর মথুরবাবু যখন উঠতে যাবেন, সেই সময় হঠাৎ মনে পড়ায় কানাইবাবু উৎসুক ভাবে বলে ওঠেন: ভাল কথা, একটা টাট্টু ঘোড়ার সন্ধান করতে হবে মথুরবাবু—একটু তাড়াতাড়ি।

মথুরবাবু একটু বিস্মিত হয়ে জানতে চান—ঘোড়া কি হবে? কার জন্যে?

হাসি মুখে কানাইবাবু উত্তর করেন—নিতায়ের জন্যে। এখন থেকে তাকে ঘোড়ায় চড়া শিখতে হবে। এ আমার

সাধনা-মা'র যুক্তি। আজকের এই ব্যাপার দেখেই মনে মনে কি ভেবে যাবার সময় আমাকে বললেন—'মানুষ-ঘোড়ার পীঠে বাবুর চড়া বন্ধ করায়, ওঁর মা কিন্তু আগুন হয়ে উঠবেন। আপনিও তাঁকে একবারে ঠাণ্ডা করে ফেলুন—ঘোড়া একটা আনিয়ে তার পীঠে চড়বার ব্যবস্থা করে দিয়ে। এতে ওর বুদ্ধিও খুলবে, মনের জড়তাও কেটে যাবে।' এই ধরণের উন্মনা ছেলেদের পক্ষে এটা নাকি উত্তম প্রতিষেধক। সেই জন্যেই আপনাকে বলেছি মথুরবাবু!

ঘোড়ার ব্যবস্থা করবেন জানিয়ে মথুরবাবু তখন তাঁর সেরেস্তায় যান, কানাইবাবুও অন্য দিনের চেয়ে অনেকটা আগে ভিতর মহলে প্রবেশ করেন। চুপি চুপি নিজের ঘরে গিয়েই সেখান থেকে শিবকুমারকে দিয়ে নীরদাকে ডেকে পাঠান— একথা আগেই বলা হয়েছে।

উভয়েই পরস্পরের মনোগতিটা নির্ণয় করতে ভুলের পথ ধরেছিলেন। কানাইবাবু ভেবেছিলেন, ওভাবে নিতাই ও হাবুলের উপর হুকুম জারী করায় তাঁর ভগিনী নীরদা নিশ্চয়ই গুম হোয়ে বসে আছে—অভিমান করে হয়ত কাছেও আসবে না। কিন্তু বুদ্ধিমতী সাধনা সেই ঘটনা প্রসঙ্গে তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে অসহায় জেঠামণির দুর্বল মনটিকে চাঙ্গা করবার জন্যে যে যুক্তি দেয়, সেইটিই এখন তাঁর একমাত্র ভরসা হয়ে দাঁড়ায় এবং তারই ওপর নির্ভর করে নিজেই নীরদাকে তাঁর ঘরে আহ্বান করে মনে মনে দুর্গানাম জপতে লাগলেন।

সত্ত্যগতা আশ্রিতা কৃপাপ্রার্থিনী ভগিনীর তুষ্টির জন্য অতুল ঐশ্বর্যশালী এবং স্বোপার্জিত সম্পত্তির একমাত্র স্বত্বাধিকারী বর্ষীয়ান ভূস্বামী ও শিল্পপতি কানাই চৌধুরীর দুর্বলচিত্তের এরূপ চাঞ্চল্য ও উদ্বেগ থেকেই এই মানুষটির স্নেহ-প্রবণ চিত্তের রূপটিও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। ওদিকে নীরদার মনে এ ব্যাপারে প্রথমে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল, হাবুলের সঙ্গে সংলাপের পর তার যে রূপান্তর ঘটে এবং তার মনো-গতিও ভিন্ন পথ ধরে, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। মনের এই উদ্বেগময় অবস্থায় দাদার আহ্বান শুনেই সে চমকে উঠল। হাবুল সম্বন্ধে জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত হয়েই বিচারাধিনীর মত সসঙ্কোচে সে দাদার ঘরে প্রবেশ করল।

কানাইবাবু প্রস্তুত হোয়েই ছিলেন। নীরদা কক্ষে প্রবেশ করবামাত্র সহজকণ্ঠে প্রথমেই বলে উঠলেন ঃ দেখ নীর, তোমার ছেলের যখন ঘোড়ায় চড়বার এত সাধ, আমি তার জন্য একটা আরবী টাট্টু ঘোড়া আনাবার ব্যবস্থা করেছি। দু'চার দিনের মধ্যেই এসে পড়বে।

ঘরে ঢোকবার সময়ে নীরদার বুকের ভিতরটা কাঁপছিল; এখন এই কথাটা শুনে সেই ধুকপুকুনি বুঝি দুটো ভাবধারার চাপে স্তব্ধ হয়ে গেল। এ কি কথা তিনি শুনছেন? সত্য না পরিহাস? দাদা কি তাঁকে এই শুভ সংবাদ দেবার জন্যে সত্যিই ডেকে এনেছেন? কিম্বা, ছেলের নকল ঘোড়ায় চড়ার বাতিক দেখে ঠাট্টা করলেন! কিন্তু এখানে এসে অবধি দাদার

যে প্রকৃতি তার জানা হয়ে গেছে, সেখানে ত কোন দিনই তাঁকে মিথ্যা বলতে, কিম্বা হাল্কা হোতে দেখা যায় নি! তথাপি, নীরদার মুখের ভাবে কোনরূপ পরিবর্তন এল না—ম্লান মুখেই দাদার মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

অপাঙ্গে ভগিনীর মুখখানা লক্ষ্য করে কানাইবাবুও উদ্বিগ্ন হোলেন। তবে কি চালটা ব্যর্থ হলো! সুতরাং তিনি পুনরায় খবরটা আরো একটু খুলে বললেনঃ হেবোর কাঁধে চড়ে ঘোড়ায় চড়ার সখ দেখানো, আর—ভুধের সাধ ঘোলে মেটানো, সমান কথা। ওর যদি ঘোড়ায় চড়বার সখ হোয়ে থাকে, আগেই আমাকে বলতে পারত। সাধনাই ত আমার চোখ খুলে দিলে।

সাধনার নামেই নীরদার মুখ দিয়ে কথা ফুটল, জিজ্ঞাসা করলেনঃ তার মানে? আমিত শুনেছি, সাধনার কথাতেই তুমি—

ভগিনীর কথায় তিনি বাধা দিয়ে বললেনঃ ঠিক। সাধনার কথাতেই হেবোর কাঁধে চড়া বন্ধ করে ঘোড়ার পিঠে চড়বার ব্যবস্থা করেছি। সাধনাই ত বললে—এ ভালো দেখায় না জেঠামণি, লোকে ঠাট্টা করে। তার চেয়ে ছোট দেখে একটা ঘোড়া আনিয়ে দিন—চড়তে শিখুক; সবাই বলুক—বড় লোকের ভাগ্নে বলে এবার মানিয়েছে। শুধু মুখের কথা নয়—তাড়তাড়ি ঘোড়া কিনে আনবার জন্য মথুর বাবুকে হুকুম দেওয়া পর্য্যন্ত হয়ে গেছে।

ক্ষণকাল দাদার মুখের পানে নীরবে চেয়ে থেকে, তারপর নীরদাদেবী সহসা বললেন : সাধনা বলেছে খোকার জন্যে ঘোড়া আনাতে ?

গম্ভীর মুখে কানাই চৌধুরী বললেন : হ্যাঁ।

পরক্ষণে দরজার কাছে দণ্ডায়মানা ভগিনীর মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করে স্নেহার্দ্রস্বরে কানাইবাবু বললেন : এখানে এসে ব'স, অনেক কথা আছে।

কানাই চৌধুরী তাঁর শয়ন কক্ষে এসে খাটের উপরেই বসতে অভ্যস্ত ছিলেন। নীরদাও তাঁর আহ্বানে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে খাটের এক প্রান্তে বসে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি দাদার মুখে সংলগ্ন করলেন।

ওদিকে নীরদা কানাইবাবুর আহ্বানে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার একটু পরেই নিতাই একলা ফিরে এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু মাকে দেখতে না পেয়ে পরিচারিকাকে তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করতেই সে সঠিক খবর দেয়। মামাবাবু মাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠিয়েছেন শুনে নিতাই প্রথমে একটু দমে যায়। তারপর মনে মনে কি ভেবে চুপি চুপি পা টিপে টিপে মামাবাবুর ঘরের মুক্ত দরজাটির ঠিক পাশে এসে দাঁড়ায়। নীরদাও সেই সময় ঘরের মধ্যে আসেন এবং কানাইবাবু ঘোড়ার কথা তুলে তাঁর কথা আরম্ভ করেন। সুতরাং নিতায়ের পক্ষে এ ভাবে আড়ি পেতে গোড়া থেকে সব কথা শোনবার সুযোগ ঘটে। খুব সন্তর্পণে

কান দুটি খাড়া করে সে ঘরের ভিতরের কথাগুলি যেন গিলতে থাকে !

কানাইবাবু বললেন ঃ আমার কথাগুলি আগে মন দিয়ে শোন, তারপর যদি তোমার বলবার কিছু থাকে মন খোলসা করে বলবে। তুমি ত জান, গরীব হোলেও তখন আমাদের সংসারটি ছিল শান্তির। বাবা মা দু'জনেই পয়সা উপায় করতেন স্বাধীন ভাবে খেটে খুটে। আমরা ভাইবোনও ওঁদের আদর্শে খাটতে লজ্জা পেতুম না। তুমি গোবর মেখে ঘুঁটে দিতে, তার তদ্বির করতে, গোরু বাছুর দেখতে, আমিও পড়া-শোনার সঙ্গে অবসর সময়ে বাজারে ব'সে তরি-তরকারী বেচে সংসারকে সুসার করতে চেষ্টা করতুম। হিংসা-হিংসি ভাব কোনদিন ত আমাদের মধ্যে ছিল না। বেশ মনে পড়ে, মা আমার পাতে যদি কোনদিন মাছের মুড়ো দিতেন, আমি সরিয়ে রেখে বলতুম—এটা নীরকে দিও মা, দু'দিন বাদে পরের বাড়ী যাবে—কে ওকে সেখানে মুড়ো খাওয়াবে ! তারপর ঘরবাড়ী বাঁধা রেখে বড় লোকের বাড়ীতে তোমার যখন বিয়ে দেওয়া হলো, আমিই তাতে বেশী উৎসাহ দিই। আমিই বলেছিলুম—বাড়ী একদিন খোলসা হবে, কিন্তু এমন সম্বন্ধ টাকার জন্যে ভেঙে গেলে আর আসবে না। বাস—সেই শেষ। আমরা গরীব বলে, আমাদের বাপ মা খেটে খুটে সংসার চালান শুনে, তোমার স্বামী আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। চল্লিশ বছর আর দেখাশোনার সুযোগ হলো

না আমাদের মধ্যে। আমি ঐ চল্লিশটা বছর ধরে একই ভাবে লক্ষ্মীর সাধনা করে এই অবস্থায় আসি। তখন ভাববার সময় হলো—এসব সম্পত্তি ভোগ করবে কে? কেউ বল্লেন, বিয়ে করুন; কেউ পরামর্শ দিলেন, দত্তক নিন। এমনি সময়ে মথুরাবাবুর মেয়ে সাধনাকে পেলুম। প্রথম দিনেই যখন তার বিদ্যার পরিচয় পাই, তার মধ্যে দৈবী শক্তির একটা ছায়া দেখি, সত্যই তখন বিহ্বল হয়ে পড়ি। তারপর ক্রমে ক্রমে তার স্বাভাবিক ভক্তি শ্রদ্ধা যত্ন আক্কেল বিবেচনা দিয়ে ঐ মেয়েটি আমাকে একেবারে আপনার করে নিলে, তখন মনে এলো—যদি আমার ছেলে থাকত, কিম্বা আমাদের বংশের কোন ছেলে পেতুম, তাহলে সাধনাকে কুলবধূ করে মনের সাধ মেটাতুম। কিন্তু ছেলে কোথায়? তখন ঠিক করলুম—সাধনাকে কাছে রেখে তাকে উপলক্ষ করে, এ সম্পত্তি যাতে সার্থক হয়, তাই করব। কিন্তু একই সঙ্গে আর একটা চিন্তা গোল বাধিয়ে দিল—সাধনা ত বরাবর এ ভাবে থাকবে না, বড় হোলেই বিয়ে দিতে হবে, পরের ঘরে সে চলে যাবে। তখন কি হবে? বাইরের লোক আমার এত কষ্টে উপার্জিত সম্পত্তির মালিক হয়ে বসবে? এই নিয়ে তখন কি ভাবনা, এক একদিন ঘুম ভেঙে যায়, আর আমি আকাশ-পাতাল ভাবি। এমনি সময়ে পেলুম তোমার চিঠি। আহ্লাদে চেঁচিয়ে উঠি—তাহলে নীর এখনো বেঁচে আছে, তার খোকাও আছে? চিঠিখানা সাধনাকে দেখাতেই সেও আহ্লাদে যেন

নেচে উঠল ; আমাকে বলল—শীগগির যান জেঠামণি, তাঁদের আনুন। তারপর বজবজে তোমাদের বস্তীতে গিয়ে যখন দেখলুম—তোমার ছেলে নামে খোকা, কিন্তু বয়সে ঠিক তেমনি, আমি যেটা চেয়েছিলাম—একদিন যা ভেবেছিলাম। ওখানে তোমার ছেলেকে দেখে সেই কথাটাই মনে পড়ল। তখনি মনের মধ্যে সেই কথাটা জেগে ওঠে—নীরর ছেলে, আমার সাধনা—এরা তুজনেই ত আমার তুর্ভাবনা মিটিয়ে দিতে পারে! বয়স আর আকৃতির দিক দিয়ে বে-মানান হবে না, কিন্তু প্রকৃতি আর প্রতিভায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। তাই আমি সাব্যস্ত করি—সাধনাকে সামনে রেখে নিতাইকে মনের মতন করে গড়ে পিটে নেব—ওকে সব দিক দিয়ে চৌকোস করে তুলব। তাই তোমরা এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই সাধনাকে বলি—মা, নিতাই অনেক পিছিয়ে আছে, ও যাতে এগুতে পারে, তোমার মত তাড়াতাড়ি অনেক কিছু শিখতে পারে, তোমাকে সে ব্যবস্থা করতেই হবে। কিন্তু আজ বড় তুঃখেই বলতে হোচ্ছে, গোড়া থেকেই তুমি ওকে সুনজরে দেখনি। ও কিন্তু তোমাকে নিজের পিসির মত ভক্তি করে। তারপর নিতায়ের শিক্ষার দিকে ওর যথেষ্ট লক্ষ্য। এই আজকের কথাই বলি, ঐ ঘটনার পর, সবাই চলে গেলে, সাধনাই আমাকে বলল ঃ নিতাইদার যখন ঘোড়ায় চড়ার সখ হয়েছে, আপনি ওকে একটা ভাল ঘোড়া কিনে দিন। আমি প্রথমে ভাবি, বুঝি ঠাট্টা করছে, কিন্তু পরে যে সব কথা বললে,

তাতে আমিও আকৃষ্ট হলাম। ওরই পীড়াপীড়িতে তখনই মথুরবাবুকে ডেকে ঘোড়া কেনবার কথা বলতে হলো। তাহলেই বোঝ, নিতায়ের ওপর ওর কত দরদ। হ্যাঁ, এখন আসল কথাটাই বলি, অবিশ্যি সাধনা একথা জানে না। জানেন শুধু আমার অন্তর্যামী আর এখন জানছ তুমি। কিন্তু হুঁসিয়ার, আর কেউ জানবে না।

নীরদা এতক্ষণ একভাবে চুপ করে দাদার কথাগুলি শুনছিল। এই সময় তাঁর গোপন কথাটি বলবার প্রাক্কালেই তিনি খপ্ করে বলে ফেললেন ঃ তুমি যা বলতে চাইছ, এখনো যদি সেকথা জানতে না পারতুম দাদা, তাহলে এক ভাবেই মুখ বুজিয়ে থাকতুম। তোমার ঐ আসল কথাটি হচ্ছে—নিতাইকে দেখেই তোমার মনের দুর্ভাবনা কেটে যায়, তখনই মনে মনে সাব্যস্ত করে ফেল—ওর সঙ্গেই তোমার সাধনার বিয়ে দিয়ে তোমার সাধ মেটাবে; সেইজন্যই সাধনাকে সামনে রেখে নিতাইকে লেখাপড়ায় লায়েক করে তুলতে উঠে পড়ে লেগেছ।

নীরদার দিকে বদ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কানাই চৌধুরী বললেন ঃ তুমি ত অবুঝ নও, তাই সহজেই জেনেছ। আমাকে আর ভনিতা করে বলতে হলো না। কিন্তু এই জানাটাই তো বড় কথা নয়, এর পরের কথা এখন তোমার মুখেই আমি শুনতে চাই। এখন তোমার কি মত সেইটে আমাকে বল।

নীরদা একটু থেমে, মনে মনে একটু ভেবে, পুনরায় থেমে থেমে বলতে লাগলেন: তুমি যদি আগেই তোমার মনের কথা বলতে দাদা, তাহলে তোমার মতেই আমি মত দিতুম, সাধনাই নিতায়ের বৌ হবে ভেবে, ওকেও সেই নজরে দেখতুম। কিন্তু দাদা, তোমাকে বলি—ও মেয়ের যত গুণই থাক, ওর ধিঙ্গিপনা আমার ভাল লাগে না, যেন উনিই সবজান্তা, আর কেউ কিছু জানে না। তারপর ট্যাঁক ট্যাঁক করে কথা বলা—যা আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে। এই জন্যেই ও মেয়ে আমার মনে ধরে নি দাদা—একথা তোমাকে স্পষ্টই বলছি। তবে, তুমি হোচ্ছ বাড়ীর কর্ত্তা, তুমিই সব করবে, তুমি যদি সাধনার বাবাকে কথা দিয়ে থাক—

কানাইবাবু এখানে দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করলেন: না—আগেই ত বলেছি, আমার মনের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, আমার মনকে কথা দিয়েছি। কিন্তু কানাইবাবু বা সাধনা—এদের কাউকে ঘুণাক্ষরেও একথা জানাইনি। আর কি করেই বা জানাতে পারি? শিক্ষা সংস্কৃতি পেয়ে নিতাই সাধনার যোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত আমি একথা ওদের কাউকে বলা প্রয়োজন মনে করিনি; শুধু তোমাকেই কথাটা জানিয়ে রাখলুম। এটা উপস্থিত আমাদের মধ্যেই রইল—আর কেউ যেন না শোনে। তোমার মনোভাবও আমি বুঝলুম। তবে আমিও চেষ্টা করব, সাধনা যাতে তোমার মনে ধরে, তুমি ওর ব্যবহারে খুসি হয়ে ওকে কাছে টেনে নিতে পার।

যদি এটা সম্ভব হয়, তখন আবার আমাদের কথা হবে। তবে যেভাবে এখন নিতাইয়ের পড়াশোনা চলেছে, তুমি যেন তাতে বাধা দিও না, এই অনুরোধ আমার রইল।

ভ্রাতা ভগিনীর কথা এদিন এখানেই শেষ হলো। বাইরে দাঁড়িয়ে নিতাই কথাগুলি আগাগোড়া সবই শুনল। এর পরও দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ভেবে, তাড়াতাড়ি সে নিজের ঘরে পালিয়ে গেল।

নীরদা দেবীও অতঃপর সংসারের কাজকর্ম দেখার কথা তুলে উঠে পড়লেন।

আট

শয়নকক্ষে ফিরে এসে নীরদা দেবী দেখতে পেলেন, খোকা অর্থাৎ নিতাই খাটের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে আছে ; কে বলবে বা ভাববে যে, একটু আগেই সে মামাবাবুর মহলে তাঁর ঘরখানির দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ভিতরকার কথা সব শুনছিল। অসময়ে ছেলেকে শয্যায় দেখে মা শঙ্কিত কণ্ঠে শুধালেন : এ সময় শুয়ে পড়েছিস কেন রে—শরীর ভাল আছে ত ?

বলতে বলতেই এগিয়ে গিয়ে ছেলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ডান হাতখানি তার কপালে ঠেকিয়ে গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করলেন। ছেলেও হাসতে হাসতে বিছানার উপর উঠে বসে বলল : মা যেন আমাকে খোকা ভেবেছেন—অবেলায় শুয়ে পড়েছি দেখে অসুখ করেছে ভেবে গা দেখছেন ! ভাগ্যিস্, এখানে আর কেউ নেই, থাকলে কি মনে করত বল দেখি ?

নীরদাদেবী মুখে হাসি এনে বললেন : মনে আবার করত কি রে ? বড় হবি যখন, ছেলেপুলে হলে তখন বুঝবি—ছেলের ওপর মা-বাপের কত দরদ।

খপ্ করে এ সময় নিতাই বলে ফেলল : আমাকে একটা ঘোড়া কিনে দেবে মা ?

শুনেই মনে মনে চমকে উঠে মা বললেন : ঘোড়া ?

নিতাই মুখখানা ফুলিয়ে বলল : তা ব'লে খেলাঘরের ঘোড়া নয়—বজবজে থাকতে কতবার চেয়েছিলুম, দাওনি। এবার চাইছি জ্যান্ত ঘোড়া—বুঝলে ?

নীরদা দেবী স্মিতমুখে বললেন : বুঝেছি—তখন দিইনি ব'লে এখন উল্টো চাপ দিচ্ছিস্—সুদ শুদ্ধু উসুল করতে চাস, এই ত ? তা ঘোড়া নিয়ে করবি কি ?

উৎফুল্ল মুখে নিতাই জানাল : কেন, চড়বো। জানো মা, হাবুলের কাঁধে চড়ি ব'লে, সবাই নিন্দে করে ; আর— হাবুলেরও কষ্ট হয়। এরপর ঘোড়ায় চড়ে বেরুলে সবার থোঁতামুখ ভোঁতা হয়ে যাবে। ঘোড়ার এলে হাবুল তার তোয়াজ করবে। বল—দেবে একটা ঘোড়া কিনে ?

অতীতের কথা নীরদা দেবীর মনে পড়ে যায়—বস্তীর এক পড়শীর ছেলে সুবল তার কোন আত্মীয়ের কাছ থেকে কাঠের একটা ঘোড়া উপহার পায়, সেই ঘোড়া দেখে তার খেলার সাথীরাও ঐরকম এক একটা খেলনা পাবার জন্য জিদ ধরে বসে। মায়ের কাছে খোকার তখন কি আব্দার। কিন্তু সেই ঘোড়ার দাম তিন টাকা শুনে, তিনি সেদিন মুখ ভার করে নিজের অদৃষ্টকে দুষেছিলেন। আজ সেই তাঁর খোকা এমন একটা ঘোড়া চেয়েছে—যত টাকাই তার দাম হোক, আটকাবার কথাই উঠবে না, এবং সেজন্য আজ আর তাঁর মুখখানা ভার হবার কথাও নয়। দিব্য প্রসন্নভাবেই তিনি বললেন : তোর মন বুঝেই যেন মামাবাবু তোর জন্যে একটা

টাট্টু ঘোড়া কেনবার জন্যে ফরমাস দিয়েছেন, এইমাত্র আমাকে ডেকে বললেন।

কৃত্রিম আনন্দের রেখা সারামুখে ফুটিয়ে নিতাই তড়াক করে খাট থেকে নেমে বলল: তাই নাকি? তাহলে এক্ষুনি খবরটা সবাইকে শুনিয়ে আসি—সাধি, স্বপ্না, রমেশ—

বাধা দিয়ে নীরদা দেবী বললেন: থাম। ঘোড়া আসুক, তখন ত সবাই দেখবে; আগে থেকে ওপরপড়া হয়ে বলে বেড়াবার কি দরকার? ব'স্ এখানে—তোর সঙ্গে কথা আছে।

খাটের কিনারা ঘেঁসে বসে নীরদা দেবী নিতাইকেও পাশে বসালেন, তারপর জিজ্ঞাসা করবার ভঙ্গিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুধালেন: শোন্ খোকা, তোর ভালর জন্যই দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, না লুকিয়ে স্পষ্টাপষ্টি আমাকে জবাব দে—

মা যে হঠাৎ এধরণের প্রশ্ন করে বসবেন, নিতাই সেটা কল্পনাও করেনি। এরপর তার মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল' না—মায়ের মুখের পানে মুখখানা তুলে একদৃষ্টে শুধু চেয়ে রইল।

নীরদাদেবী প্রথমেই জানতে চাইলেন: আচ্ছা খোকা, সাধিকে তোর কেমন লাগে? সত্যি করে বলবি—কিচ্ছু লুকুবি নি।

দিব্য উৎসাহের ভাবেই নিতাই বলল: সাধির আর সব

ভাল মা, খালি ওর গুরুমশাইগিরি আমার ভাল লাগে না। ওতো আমার চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু ওর কথা শুনে ব্যাভার দেখে, মনে হয় আমার চেয়েও যেন বড়। বজবজে ওর চেয়ে কত বড় বড় ছেলেমেয়ে ভয়ে আমার কাছে কাঁটা হয়ে থাকত, আর এখানে সাধি যেন গুরুমশাই—আমি তার পোড়ো। এই নিয়ে রমেশ দা, স্বপ্না আমাকে কত টিটকিরি দেয়, কিন্তু মামাবাবুর জন্যে আমাকে মুখ বুজে থাকতে হয় মা!

নীরদাদেবী বুঝলেন, সাধনা সম্পর্কে ছেলের ব্যথা কোনখানে। ওকে পছন্দ করলেও বিয়ের দিক দিয়ে ঐসব পাকামোপনার জন্যে নীচু হয়ে থাকতে হয়। অমনি দাদার উপর তাঁর অভিমান জেগে ওঠে—নিজের ভাগনেকে খাটো করছেন, কোথাকার কে একটা মেয়েকে বাড়াবার জন্যে। হাজার হোক, বেটাছেলে, পুরুষ মানুষ, দুখানা বই পড়ে নায়েক হয়েছে বলে একটা মেয়েকে কেউ কখনো এমনি করে বাড়ায়? ঘোড়া দেবার সখ হয়েছে, তার মানে—ইচ্ছে, ভাগনে ঘোড়ায় চড়ে; কিন্তু সেখানেও ঐ সাধি—সে বলেছে বলেই যেন উনি মত করেছেন। নীরদা দেবীর প্রসন্ন মনটি পুনরায় বিষিয়ে ওঠে।

নিতাই মাকে নীরব দেখে এই সময় তার একান্ত ঈপ্সিত কথাটি খপ করে বলে ফেলল: খুব ভাল হয় মা, মামাবাবুকে বলে তুমি যদি সাধির মাষ্টারীগিরি বন্ধ করাতে পার—

নীরদা জিজ্ঞাসা করলেন: তাতে কি হবে?

সোৎসাহে নিতাই বলল : তাহলে পড়া নিয়ে, শেখানো নিয়ে ও আর মাতব্বরী করতে পারবে না। ঐ যে বড় দালানে দু' দুটো মাষ্টার মশাই পড়াতে আসেন, ওঁরাই পড়ান না, না হয়—আরো একটা মাষ্টার আনান মামাবাবু; কিন্তু সাধি ওখানে মাষ্টারী করবে কেন ? আর—সত্যি বলছি মা, বিকেলে মামাবাবুর সামনে বসে সাধি তার বিদ্যে ফলাবে, মামাবাবু তার জন্য বাহোবা দিয়ে শোনবার জন্যে আমাকেও তাড়া দেবেন, এগুলো কিন্তু ভারি বিশ্রী লাগে।

মুখখানা শক্ত করে নীরদা দেবী ছেলের কথাগুলি যেন গিলছিলেন। এই সময় সহসা জিজ্ঞাসা করলেন : কি হলে তোর ভাল লাগে শুনি ? ঠিক করে বল !

মায়ের কথায় উৎসাহ পেয়ে নিতাই জবাব করল : তাইত বলছি—সাধি যদি স্বপ্নার মত মেলামেশা করে, গল্প শোনায়, তাহলে বেশ হয়। বিকেলে মামাবাবুর ঘরে পড়ার পাটটা তুলে যদি দিতে পার, তাহলে আর কিছু করতে হয় না—সাধি ওখানে গিয়ে বড় বড় বই পড়বেন, আর মামাবাবু শুনতে শুনতে বলবেন—মানে বুঝিয়ে দাও। তারপর আমাকে বলবেন—শুনলে ত ? কি বুঝলে বল ? আমি কি বুঝিনা—সাধিকে বাড়াবার জন্যে যত সব—হুঁ।

মায়ের যেখানে ব্যথা, সেইখানটিতে খোঁচা দিয়ে মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলিয়ে নিতাই তার কথাগুলি বলতেই নীরদাদেবী আবার জ্বলে উঠলেন। এরপর তিনি আর কোনদিকে চেয়ে

বিচার করবার চেষ্টা না করেই খরমেজাজে বললেন: তুই ঠিক ধরেছিস—সাধিকে বাড়াবার জন্যেই ওঁর ঐ সব আদিখ্যেতা! নৈলে, কে কোথায় দেখেছে—বেটাছেলেকে হেনস্তা করে মেয়েছেলেকে সবার সামনে বাড়িয়ে তাকে আস্কারা দেওয়া! আর সেই ছেলে তাঁর আপন ভাগনে। পরের মেয়ের সামনে আপন ভাগনেকে খাটো না করে তাকে বড় করবার, বিদ্বান করে তোলবার পথ কি আর নেই? বড় বড় মাষ্টারদের চেয়েও কি সাধি বিদ্যেয় বড় নাকি? দাঁড়াও, আমি ওঁর ভুল সব ভেঙে দিচ্ছি—

মায়ের এই মূর্ত্তিকে নিতাই পর্য্যন্ত ভয় করে। তার জানা আছে, একান্ত অসহায় অবস্থার মধ্যেও তার মা ছেলের পক্ষ নিয়ে পড়শীদের সঙ্গে কিরূপ উগ্রমূর্ত্তিতে কলহ করতেন। সে নিজেই কলহের উপলক্ষ হলেও শেষে ভয় পেয়ে আপন মনে আফ্‌শোষ করত—কথাটা ওভাবে মিথ্যে করে মা'র কাছে না লাগালেই হ'ত! এদিনও মায়ের সেইরূপ মূর্ত্তির আভাস পেয়ে সে শঙ্কিত হয়ে ভাবতে থাকে—এই নিয়ে সাধনার সঙ্গেও তার মুখ দেখাদেখি পাছে বন্ধ হয়ে যায়! খানিক আগে মামাবাবুর মুখে সাধনাকে উপলক্ষ করে তাঁর যে সঙ্কল্প সে শুনেছিল, তাতে একটা অভিনব তৃপ্তি পায়। সত্যিই যদি একদিন সেটি সত্য হয়, নিজেকে সে ভাগ্যবান মনে করবে। কিন্তু সে স্থির করতে পারে না, মামার মুখে কথাটা শুনে মা কি ভাবে নিয়েছেন। হয়ত, সাধনার কথা উঠতেই পড়ার

ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে ওসব কথা বলা তার পক্ষে উচিত হয়নি ; সে না বললে ত মা এত রেগে উঠতেন না। কিন্তু সত্যিকথা বলতে কি, পড়ার দিক দিয়ে সাধনার অতটা বাড়াবাড়িও তার পছন্দ নয়। এখন মায়ের চেষ্টায় যদি সেটা বন্ধ হয়ে যায়, তাতে ক্ষতি কি! তবে সাধনার সঙ্গে তার যোগাযোগটা অন্য দিক দিয়ে থাকিলেই হলো। এখন সেই চেষ্টাই তাকে করতে হবে!

দুষ্টবুদ্ধি নিতাই ছেলেটির মাথায় খুব খেলে। ঝাঁ করে একটা কথা বানিয়ে বলে যেমন সে ঝগড়া বাধাতে ওস্তাদ, তেমনি সেটি যেই শিখা বিস্তার করে ওঠে, তাড়াতাড়ি একাই তাতে শান্তিজল ছড়িয়ে নেভাবার কৌশলটিও সে জেনে রেখেছে। তাই অসামান্য বুদ্ধিমতী সাধনার দৃষ্টিতে তার দোষগুণ দুটিই ধরা পড়ে গেছে। সে জানে, নিতাই ছেলেটি বুদ্ধি খাটিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এমনভাবে বাহাদুরী দেখাতে পটু যে, সেটা ধরা পড়লেও তার সাজাবার কৌশল সকলকে অবাক ক'রে দেয়। নিতায়ের নানাবিধ দুষ্টবুদ্ধির কথা কানাইবাবু যেমন সাধনার কাছ থেকে জেনেছেন, তেমনই তারই কাছে আশ্বাস পেয়েছেন যে, শিক্ষার সাহায্যে নিতায়ের ঐ দুষ্ট-বুদ্ধিকে শুভবুদ্ধিতে পরিণত করা সহজ না হলেও অসম্ভব নয়। সেই জন্যই এই অশিষ্ট ছেলেটির মনের গতি যাতে শিক্ষার আলোকে সুষ্ঠুপথে অগ্রবর্ত্তী হয়, তারই উপযুক্ত ব্যবস্থায় তিনি অবহিত হ'লেও ঘটনাচক্রে মা ও ছেলের পক্ষে সেটি 'উল্টা বুঝিলি রাম' প্রবচনের মত হয়ে ওঠে।

নির্বাক অবস্থায় নীরদাদেবী মুখখানা শক্ত করে কিছু জল্পনা করছেন বুঝতে পেরেই নিতাই ঝাঁ করে বলে উঠল ঃ তবে একটা কথা তোমাকে বলি মা, সাধির গুরুমশাইগিরি বন্ধ করবার কথা বলেছি বলে, তুমি যেন ভেবনা মা—আমি তার সঙ্গে আড়ি দিতে চাই। আমাদের দেখাশোনা, ভাবসাব সে সব ঠিক থাকবে, ওর ভাইটিকে নিয়ে যাতে আমাদের সঙ্গে খেলে—

ছেলের মুখে পাল্টা প্রস্তাবটি শুনেই মায়ের গম্ভীর মুখে হাসি ফুটল। শক্ত মুখখানাকে হঠাৎ একটু সহজ করে তিনি বললেন ঃ ও! সাধির কাছে পড়ব না, অথচ তাকে ছাড়বও না—এ কথার মানে কিরে খোকা? তাহলে রাগ তোর সাধির ওপর নয়, যত রাগ ওর বিছের ওপর, এই তো?

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে নিতাই চুপ করে কোঁচার খুঁটের কাপড় পাকাতে লাগল। অপাঙ্গে ছেলের নির্বাক মুখভঙ্গির দিকে চেয়ে নীরদা সহসা খুব সহজ হয়ে সোজা ভাবেই জিজ্ঞসা করলেন ঃ তাহলে সাধিকে তোর ভাল লাগে বল?…চুপ করে রইলি কেন, জবাব দে?

মায়ের মুখের পানে একবার চেয়েই পরক্ষণে মুখখানা নীচু করে নিতাই জবাব দিল ঃ ভাল না লাগলে ভাব করবার কথা বলি কখনো…তাহলে ত আড়ি করে দিতুম, যাতে আর দেখা না হয়।

ছেলের এই মুখভঙ্গির দিকেই চেয়ে থেকে মা পুনরায় শুধালেন : কেন, ঘোষাল মশায়ের মেয়ে স্বপ্নাও ত এসেছে ; তার সঙ্গে বেড়াস, খেলা করিস, দিব্যি ভাবও নাকি হয়েছে—তবে ? নাই বা সাধি—

মুখখানা এবার ভার করে মায়ের কথায় বাধা দিয়ে নিতাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল : না মা, সাধির সঙ্গে আড়ি হয় আমি তা চাই না। ওর কথা অনেক সময় বুঝতে পারি না, মন রেখে কথা বলতে সাধি জানে না, তবু শুনতে ভাল লাগে। আর, আমি বলছি মা—যাতে আমার ভাল হয়, আমিও ওর মতন পড়া শোনা করি—সাধি কিন্তু তাই চায়।

মা জিজ্ঞাসা করলেন : আর—স্বপ্না ? তার কথা তো কিছু বললি না ? সে তো দিব্বি গান গায়, নাচে, ছড়া কেটে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়—তবে ? নাই বা সাধি এল !

মুখখানা গম্ভীর করে নিতাই বলল : ওর কথা আলাদা, ঠিক যেন ফানুস। প্রথমেই চমকে দেয়, বেশ লাগে, কিন্তু হরদম চোখের সামনে এলে কি আর ভাল লাগে ? একই রকমের আলো, মনে হয় সরে গেলেই বাঁচি।

মুখ টিপে হেসে বললেন : ওমা, স্বপ্না তোর কাছে ফানুস হলো—তাই ওকে ভাল লাগে না ? আর সাধি ? সে বুঝি দেয়ালগিরির আলো…কাঁচের ভিতরে জ্বলে বলে—

নিতাই বলল : না, না, তা কেন—সাধি যেন হাউই, কাউকে ভয় নেই—নিজের জোরেই চলে। ওর মেজাজ দেখলে

রাগ হয় ; কিন্তু মা, তবু ভাল লাগে। আর, ওর মুখের কথা ঠিক যেন ধানি লঙ্কার ঝাল, কাঁচা আম থেঁতো করে খাবার সময় লঙ্কার ঝালে মুখ যেন পুড়ে যায়, তবুও ঝাল চাই, নৈলে সে আচার বোদা লাগে।

ছেলের মুখে এই সব কথা শুনে মা হতচকিত হয়ে চেয়ে থাকেন। তাঁর মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কথাই সরে না। সাধনার মুখে ঘর-গৃহস্থালী সম্বন্ধে কোন কোন কথা শুনে এই ভাবেই অবাক হয়েছিলেন এবং তখন তাঁর মনে হয়েছিল, এই বয়সেই মেয়েটা একেবারে পেকে গেছে। কিন্তু এখন নিজের ছেলে দুটি মেয়েকে লক্ষ্য করে যে ভাবে উপমা দিয়ে তাদের প্রকৃতির পরিচয় দিল, বিশেষ করে সাধনার সামর্থের যে ব্যাখ্যানা করল, তাতে নিজের অনুমানশক্তিতে তিনি এইটুকু উপলব্ধি করলেন যে, এখনই সাধনার সঙ্গে তেমন বনিবনাও না হোলেও তারই সঙ্গের প্রভাবে এভাবে কথা বলতে শিখেছে। এর পর স্বপ্নার মত সাধনাও যদি খোলাখুলিভাবে খোকার সঙ্গে মেশে, পড়াশোনা নিয়ে ওদের মধ্যে কোনরকম বাধ্য-বাধকতা না থাকে, তাহলে ও মেয়ে তাকে একবারে যাদু করে ভেড়া বানিয়ে ফেলবে। এ অবস্থায় তাঁরও ভাববার অনেক কিছুই আছে।

এখন ছেলেকে কিছু বলা প্রয়োজন ; সেও শোনবার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে। এ সব ব্যাপারে নীরদারও বুদ্ধি বেশ খোলে। তিনি ছেলেকে উদ্দেশ করে সহজ ভাবেই বললেন :

বেশ, সাধির সঙ্গে তোমার পড়াশোনার পাট যাতে বন্ধ হয়, সে ব্যবস্থা আমি যেমন করে হোক করব। তার পরে কিন্তু সাধির সঙ্গে যদি না বনে, আর সেই দজ্জাল মেয়ের ব্যাভারে সত্যি সত্যিই তোমার মনে জ্বালা ধরে, তখন যেন কাঁদতে কাঁদতে নালিশ করবার জন্য আসতে না হয়।

উৎফুল্ল মুখে চোখ দুটো বড় করে নিতাই মায়ের মুখের দিকে তাকাল।

নয়

সাধনা মেয়েটির নিত্যকার কাজগুলি বাঁধা-ধরা নিয়মে যেন কলের মত চলে। সেই-যে রাত চারটের আগেই বিছানা থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে ছোটভাই সুধীর এবং প্রতিবাসী আরো গুটিকয়েক বালকবালিকাদের নিয়ে সে তার কাজ আরম্ভ করে, রাত ন'টার আগে তার আর ছুটি নেই। পাড়ার গুটিকয়েক উৎসাহী ছেলেমেয়ে সাধনার কাছে আসে শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে। সাধনা প্রথমেই জানিয়ে দেয়, 'আমার কাছে যদি শিক্ষা চাও, আমার কথা মেনে চলতে হবে। প্রথম কথা, ঘড়িতে চারটে বাজলেই বিছানা ছেড়ে উঠতে হবে; তারপর তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে এ-বাড়ীতে আসবে। বেলা ন'টা পর্য্যন্ত এখানে থাকবে—সাধুজীর আশ্রম থেকে আমি ফিরে এলে, পড়া দিয়ে তার পর ছুটি।

এই নিয়ম মেনেই তারা আসে। বিছানা ছেড়ে উঠেই সাধনা উঠানে ছড়া-ঝাঁট দিয়ে পাড়ার সেই মেয়েগুলির মুখ চেয়ে দরজা খুলে রাখে। তারা এলেই এক সঙ্গে বাগানে যায়—পনের মিনিট ধরে সাধু দাদুর শিক্ষার ধারায় সেখানে শরীরচর্চা ও কতিপয় আঙ্গিক আসনের সাধনা চালায়। তারপর সকলে মিলে বাগান থেকে ফুল তোলে। মায়ের ছবিতে নিত্য তাজা ফুলের মালা গেঁথে পরিয়ে দেয়—সাধুজীর জন্যেও অর্ঘ্য সাজিয়ে মালা গেঁথে নিয়ে যায়। ফুল তোলার পর সমান

ভাবে ভাগ করে নিজের ভাই সুধীর ও পাড়ার পড়ুয়াদের কিছু কিছু খাবার খেতে দেয়। রাতেই পিসিমার সাহায্যে এই সকালের খাবার তৈরী করে রাখে—ভিজা ছোলা, আদার কুচি, মুড়ি, নারকেল নাড়ু; কোনদিন বা খৈ-মুড়কি, ছোলা-গুড়, তিলের চাক্তি—এমনি সব পাল্টাপাল্টি তালিকা। তারপর বাইরের ঘরে পল্লীর সেই বালিকাগুলির সঙ্গে ভাইটিকেও পড়ার পাঠ এবং অঙ্ক ও হস্ত-লিপির নির্দেশ দিয়ে তাকেও শিক্ষার উদ্দেশ্যে সাধুর আশ্রমে যেতে হয়। যাবার আগে মায়ের ছবিতে মালা পরিয়ে দেওয়া, গড়গড়ার জল বদলে তাওয়াদার তৈরী কলকেটি তার মাথায় বসিয়ে নলটি শয্যাশায়ী পিতার হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করা, পিসিমা কালিদাসী ও গৃহভৃত্য নবদাকে ডেকে দেওয়া—এগুলির দিকেও তাকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

ঠিক একটি ঘণ্টার মধ্যে প্রাতঃকৃত্য, স্নান, প্রসাধন এবং এই কাজগুলি সমাধা করে, হাতে ফুলের সাজি, আর বাম কাঁধে বইএর দপ্তরটি ঝুলিয়ে এবং সেই সঙ্গে তার দীর্ঘ দেহের চেয়েও লম্বা লাঠিখানা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে যখন বাড়ীর সামনের রাস্তা ধরে সাধুর আশ্রমের দিকে রওনা হয়, তখনো দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠেনা—দূর আকাশে দু'-চারটি তারাও মিট মিট করে জ্বলে; কাকের কর্কশ ধ্বনি ও অন্যান্য পাখীর কাকলি তখনো পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ প্রকৃতির বুকে চাঞ্চল্যের শিহরণ তোলেনি। পল্লী-গ্রামের পথ—দু'ধারে

মাঠ, বাগান, ক্ষেত, খামার, সেই সঙ্গে গৃহস্থদের বাসভবন। তখন এই কিশোরী পথচারিণীর উদাত্ত কণ্ঠধ্বনিই পথের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দেয়; শোভাময়ী ঊষাও যেন আনন্দে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে' আপনাকে প্রকাশ করতে থাকেন সেই সুরধারার তালে তালে ঃ

নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

এই পরিচিত স্তোত্র শোনবার জন্য পথপার্শ্বের গৃহস্বামীরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন এবং দূরাগত ধ্বনির আভাস পেয়ে বিছানা থেকেই পরিজনদের উদ্দেশে বলে ওঠেন, 'ঐ সাধনার গলা শোনা যাচ্ছে, তাহলে ভোর হয়েছে। ওরে, তোরা উঠে পড়—উঠে পড়।'

এই একই ধারায় সাধনার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্রাহ্ম-মুহূর্তকাল পুরাকালের আশ্রমবাসীদের আদর্শে অতিক্রান্ত হয়।

খানিক পরে লাঙ্গল-জোল ও মই-বলদ নিয়ে দু'এক জন চাষীকে এই পথে দেখা যায়। দূর থেকে তারাও সাধনাকে দেখে সম্ভ্রমের সুরে বলে—'যেমন লায়েক বাঁপ, তেমনি তেনার বিটি—ফজিরে নিকতি যান সাধুজীর দরগায়।'

ওদিকে সাধু আনন্দস্বামীও তাঁর আশ্রমসন্নিহিত নদীতে প্রাতঃস্নান সেরে ঐ স্তোত্রটি পাঠ করতে করতে আশ্রমে ফিরে আসেন ঠিক এই সময়। মনোরম স্থান, পুরাণবর্ণিত ঋষিদের

আশ্রম যেন। প্রাণবন্ত বংশগুচ্ছের বিচিত্র তোরণ ও প্রাচীর, ভিতরে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ; একদিকে একটি বৃহৎ নিমগাছ, অন্যদিকে নানাবিধ ফুলগাছ, মাঝখানে পরিচ্ছন্ন স্থানটুকু ঝকঝক করছে। উপরে চণ্ডীমণ্ডপ—উঠান থেকে মণ্ডপে ওঠবার সিঁড়িগুলিও চমৎকার—তালগাছের সরল কাণ্ড কেটে তৈরী, উপরে গাঢ়ভাবে পীচের প্রলেপ দেওয়া। আটচালার স্তম্ভ বা খুঁটিগুলিও এই প্রণালীতে নির্মিত। এর দু'পাশে পর্ণশালা, পিছনে পুষ্করিণী ও তার চারদিকে উদ্যান—চারদিকে বেত্রলতা-বেষ্টিত বংশপ্রাচীর।

স্নানান্তে প্রতিদিনই প্রত্যুষে আশ্রমে এসে আনন্দস্বামী চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যস্থলে আস্তৃত মৃগচর্মের আসনখানির উপর বসে ধ্যানমগ্ন হন। অভ্যাসমত সে-দিনও আসনে উপবিষ্ট, দুই চক্ষু মুদ্রিত; এই সময় সাধনা সান্নিধ্যে এসে সন্নিহিত পর্ণাসনে বইএর দপ্তর ও ফুলের সাজি নামিয়ে রেখে গুরুপদে অর্ঘ্য দিতেই তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন, যেন এরই প্রতীক্ষা করছিলেন। সাধনা গুরুর কণ্ঠে মাল্যদান করেই পদতলে মাথাটি নত করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে গুরুও প্রসন্ন চিত্তে শিষ্যার মাথায় হাতখানি রেখে আশীর্ব্বাদ করেন: মনস্বিনী হও, শুভবুদ্ধির সঞ্চার হোক, মাতৃ-এষণার বিকাশ করে বিজয়িনী হও।

এই বয়সেই সাধনা গুরুর কাছে মানুষের প্রাণধর্ম্মের স্বাভাবিক গতির রহস্য জ্ঞাত হয়েছে। সে জেনেছে যে, জীব

মাত্রেই বাঁচতে চায়। বাঁচার জন্য জীব বা মানুষের যে চেষ্টা বা সংগ্রাম, তারই নাম প্রাণৈষণা। এষণার সহজ অর্থ হচ্ছে দাবী। উপনিষদ এই দাবীকেই এষণা বলেছেন। প্রাণৈষণার পরেই আসে অন্নৈষণা; অর্থাৎ বাঁচবার জন্য চাই অন্ন। এর পর যৌন-এষণা, পুষ্টির পর প্রয়োজন জীব সৃষ্টির। এর পরের কথা হচ্ছে—মাতৃ-এষণা। সৃষ্ট সন্তানের প্রতি মমতাবোধ মাতার পক্ষেই সম্ভব। উপনিষদের মতে মাতৃ-এষণা থেকেই মানবতার অঙ্গস্বরূপ স্নেহ, মমতা, সুখ, শান্তি, আনন্দ প্রভৃতি মানুষের শুভবুদ্ধিগুলির উদ্ভব হয়ে থাকে। মা নিজের সন্তান বা অত্যন্ত প্রিয়জনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে যে-ভাবে নিজেকে জড়িয়ে দেন, তেমনি মাতৃএষণার মর্ম বুঝতে পারলে সেই মা বা নারীর পক্ষে মানুষ মাত্রকেই নিজের সন্তান বা প্রিয়জনের মত প্রিয় মনে করা সম্ভব হতে পারে। এই মাতৃ-এষণা হিংসামূলক মনোবৃত্তি, স্বার্থপরতা ও যাবতীয় নীচতার পরিবর্তে মানুষের মনে মানবতার সঙ্গে শুভবুদ্ধির সঞ্চার করে। এখন স্বামীজী সকাশে উপনিষদের এষণা সম্পর্কে সাধনার পরম শিক্ষাই চলেছে। যখন যে বিষয়ে শিক্ষা চলে, শিক্ষনীয় বাক্যেই গুরু ছাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করেন। বাঙলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত এই তিনটি ভাষাতেই সাধনার শিক্ষা চলে—পাঠ্যগ্রন্থ স্বামীজীই ছাত্রীর মেধা অনুসারে নির্ব্বাচিত করেন। তিনি স্বয়ং অভিজ্ঞ ও কৃতবিদ্য। সাধনা যখন তিন বৎসরের শিশু, তখন থেকেই স্বামীজীর কাছে তার শিক্ষা আরম্ভ হয়েছে এবং শৈশব অতিক্রম

করে বর্তমানের কিশোরকাল পর্য্যন্ত সমানভাবে সেই শিক্ষা চলে আসছে।

এখানকার শিক্ষার পর স্বামীজীর ক্ষুদ্র পাকশালায় সাধনাকেই তাঁর স্বপাকের ব্যবস্থাগুলি করে দিতে হয়। এই সূত্রে স্বাস্থ্যকর পাক-প্রণালীর অনেক নূতন নূতন তথ্য এবং অন্যান্য দেশ ও জাতির আড়ম্বরহীন সাদাসিধা অথচ পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত সম্বন্ধেও সাধনা অনেক নির্দেশ পায়। বাড়ীতে এসে সেগুলি স্বহস্তে পরীক্ষা করে পিসিমাকেও সে অবাক করে দেয়।

আশ্রম থেকে বাড়ীতে ফিরেই সাধনা পড়ার ঘরে গিয়ে সুধীর ও অপর ছেলেমেয়েগুলির অঙ্ক ও হস্তলিপি পরীক্ষা করে। এরপর কিছুটা সময় তাদের নিয়ে পড়াশোনায় অতিবাহিত হয়। আশ্রমে স্বামীজীর কাছে সহজে বোধগম্য হবার মত যে অভিনব শিক্ষার আস্বাদ সে নিজে পেয়েছে, এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদিগকেও সেইভাবে শিক্ষা দিয়ে শৈশব থেকে তাদের জ্ঞানলাভের ভিত্তি মজবুত করে দেয়।

এদের ছুটি দিয়েই সাধনাকে পিসিমার সঙ্গে গৃহস্থালীর কাজে যোগ দিতে হয়। এই নিয়ে পিসির সঙ্গে প্রায় নিত্যই তা'র তর্ক বাধে। পিসি তাকে কিছুতেই গৃহস্থালীর কাজে বা রান্নার ব্যাপারে হাত দিতে দেবেন না। তিনি বলেন—'রাত থাকতে উঠে তোল-মাটী-ঘোল করে বেড়াচ্ছ; এইত আর এক পাড়ার প্রান্ত থেকে পড়ে বাড়ী এসে একটু না জিরিয়েই

ফের এখানে পড়াতে বসলে—এখুনি আবার কোমরে আঁচল বেঁধে হেঁসেলে এসে হাজির হয়েছ! এ রকম করলে শরীর বইবে কেন, লোহার গতর ত নয়! আমি তোমাকে কোন কাজে হাত দিতে দেব না।'

কিন্তু সাধনাও ছাড়বার পাত্রী নয়; হাসতে হাসতে সুন্দর মুখখানির এক অপরূপ ভঙ্গি করে বলে—বা-রে! তাহলে আমি ঘর-কন্নার কাজকর্ম শিখব কি করে? আর, এইত আমাদের খাটবার বয়স পিসিমা—সাধু দাদু আজকে যে দুটো নূতন রান্নার কথা বলেছেন, নিজের হাতে এখুনি তা না করলে ভুলে যাব যে! লক্ষ্মীটি পিসিমা, কাজ করতে আমাকে মানা করবেন না—এতেই আমার আনন্দ।

কথার সঙ্গে সঙ্গে সাধনা কাজের পর কাজ সেরে ফেলে, পিসিমার আপত্তি ভেসে যায়; নিজের মনেই তিনি গজ গজ করতে করতে নিজের হাতের কাজে মন দেন, আর আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকেন, মনের আনন্দে সাধনা কিভাবে নিপুণ হাতে প্রত্যেক কাজটি পরিপাটিরূপে শেষ করে চলেছে।

মথুরবাবু সকালেই বড় বাড়ীর সেরেস্তায় চলে যান, মধ্যাহ্নে বাড়ী এসে ভোজন করেন। আহারান্তে তাঁর বিশ্রাম করা অভ্যাস। অপরাহ্নে পুনরায় কর্মস্থানে যেতে হয়। সাধনাকেও দশটার মধ্যে সব কাজ সেরে-সুরে ছোট ভাই সুধীরকে খাইয়ে এবং যাদের খাওয়া বাকি থাকে পিসিমার সঙ্গে সব ব্যবস্থা করে বড় বাড়ীর পাঠশালায় হাজিরা দিতে হয়।

সেখানেও সাধনার কাজগুলি এমনি বাঁধাধরা নিয়মেই চলত। যেমন—মেয়েদের দিকের পণ্ডিত মহাশয়কে কিছুটা সাহায্য করেই ছুটতে হ'ত বড় বাড়ীর অন্দরমহলে। জেঠামণির খাবার ব্যবস্থা তাকেই করতে হবে। নতুবা পাচিকা বামুন-ঠাকরুণ যত্ন করে যতই রাঁধুক না কেন, তাঁর মোটেই তৃপ্তি হয় না। সেটা জানে বলেই বামুন ঠাকরুণ সাধনার মুখ চেয়ে হেঁসেলে ঠায় বসে থাকত। সে জানত, কর্তাবাবুর কিসে রুচি, কোন কোন তরকারী খেতে তিনি ভালবাসেন, আর কেমন করে সেগুলি রাঁধতে হয়। হেঁসেলে বসে সাধনা রাঁধুনীকে বলে দিত—কি প্রণালীতে পাক হবে, কোন্ কোন্ মশলা পড়বে—খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি তাকে এমন করে দেখিয়ে দিত, যাতে পরে তার ভুল না হয়। শিক্ষার মত খাদ্যের সম্বন্ধেও সাধনা জেঠামণিকে নূতন নূতন কথা শুনিয়ে অবাক করে দিত, বলত : জানেন জেঠামণি, সাধু দাদু বলেন—এ যুগে সব কাজই তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হবে ; তাই এটাকে 'সর্ট কাটের যুগ' বলে ওদেশের লোকেরা। এদেশেও তার হাওয়া এসেছে। এই দেখুন না, আপনাদের সময়ে বই পড়ে চেষ্টা করে বইএর কথার মানে জানতে হোত, এখন কত রকমের মানের বই বেরিয়েছে। সমস্ত বইখানা না পড়িয়ে বাছা বাছা জায়গাগুলো দাগ দিয়ে পড়ানো হয়—সহজে পাস করা যাবে বলে। এমনি আমাদের সংসারেও মেয়েদের বেশী সময়টা রান্নাঘরেই কাটে ; সেই জন্যে অল্প সময়ে সহজে রান্নার পাট সেরে ফেলবার হদিস দিচ্ছেন

খাদ্যবিদ্‌রা। এটা অবিশ্যি খুব ভালো কথা। তাই সাধু দাদু এমন কতকগুলি রান্না আমাকে শিখিয়েছেন, খুব সহজে অল্প সময়ে তৈরী করা যায়, খেতেও ভালো, তার ওপর স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও পুষ্টিকর।

বালকের মত কৌতূহলী হয়ে প্রফুল্ল মুখে জেঠামণি নূতন ধরণের খাদ্যগুলির প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করতেন—কেমন করে রাঁধতে হয়, খেতে কেমন, কি কি মাল-মশলা চাই—শুনেই যে আমার লোভ হোচ্ছে মা!···সাধনাও সহাস্যে বলত—শুনে ত আপনাদের লাভ নেই জেঠামণি, আমাদেরই শোনবার কথা, আর—খাবার সময় পাতে পড়লেই আপনাদের লাভ—তখন ভালোমন্দ বিচার করবেন।

পরদিন থেকেই কানে শোনা খাদ্যগুলি ক্রমে ক্রমে জেঠামণির খাবার থালার পাশে এক একটি নূতন রূপ ধরে দেখা দিত। হাস্যমুখী স্নেহময়ী কিশোরীর অকৃত্রিম যত্ন ও আন্তরিকতায় তাঁর শুষ্ক চিত্তটি ভরে উঠত। নূতন মালিক হয়ে বড় বাড়ীতে এসে অবধি সাংসারিক যাবতীয় ব্যাপারে রাঁধুনী ও চাকর-বাকরদের ব্যবস্থাধীনেই কানাই চৌধুরীর জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়ে এসেছে। কিন্তু সাধনার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর সংযোগ হবার পর থেকেই সাংসারিক ব্যাপারেও সব দিকেই একটা বিশিষ্ট রকমের পরিবর্তন দেখে তিনি চমৎকৃত হন। কানাইবাবুর প্রিয় ভৃত্য শিবকুমার স্নানের সময় তাঁকে সাহায্য করত; কিন্তু সেদিন স্নানার্থী হবার প্রাক্কালে

সে গায়ের ও মাথার দু'রকম তেল বাটি ভরে কাছে রেখেই তার কর্তব্য শেষ করল না—তাঁর সর্ব্বাঙ্গে সিদ্ধ হস্তে মর্দন করতে লাগল। এ সম্বন্ধে তিনি প্রশ্ন করতেই শিবকুমার অপরাধীর ভঙ্গিতে জানালো যে, সাধনা দিদিই তাকে এটি বাতলে দেছেন। তিনি যেই শুনলেন, তেল মাখাবার কায়দা সে জানে, তবে বাবু বলেন না ব'লেই আর গা করেনি, অমনি সাধনা দিদির কথায় সে নিজের কসুর বুঝতে পেরেছে, আর তার গাফিলতি হবেনি।

খেতে বসেও সেদিন তিনি দেখেন সেখানেও নূতন ব্যবস্থা হয়েছে। খাবার ঘরে টানাপাখা বরাবর শোভাবৃদ্ধি করেই এসেছে, কিন্তু হঠাৎ মাথার ওপর ঠাণ্ডা হাওয়ার ছোঁয়াচ পেয়ে চমকে উঠে রাঁধুনীকে জিজ্ঞাসা করেন—'পাখা টানছে কে বামুনঠাকরুণ?'...তার মুখ থেকে তখনি জবাব আসে—নারাণী। সাধনা মা বলে দিয়েছেন যে, দুপুরে খাবার সময় নারাণী পাখা টানবে, রাতে বাতাসী। এরা দুজনেই বড় বাড়ীর পরিচারিকা।

এর পর থালায় ভাত সাজানো, তরকারির বাটিগুলি পর পর রাখার ব্যবস্থাও দেখেন অন্যরকম—কেমন একটা শ্রীছাঁদ রয়েছে যেন। ছোট একটি পাথরের রেকাবীর উপর লেবু ও নুন। খাবার জলের রূপার গ্লাসটি ঝকঝক করছে, জলে কর্পূর। বাটি ও ডিসে সাজানো ব্যঞ্জনগুলির নূতন রূপ আগেই নজরে প'ড়েছিল, এখন মুখে দিতেই মুগ্ধ হলেন। প্রত্যেকটির

আস্বাদ আলাদা রকম। পাচিকাকে জিজ্ঞাসা করবার আগেই সে নিজে থেকেই বললে—আজকের রান্নাও সব নূতন ; সাধনা যেমন বলেছে, তেমনি রান্না হয়েছে, নিজেও রেঁধেছেন—আমি ত বাবু এ সব রান্না জানিনে ; তবে আপনার যদি ভালো লাগে শিখিয়ে দেবে বলেছেন দিদিমণি।'

কানাই চৌধুরী ক্ষণকাল চুপ করে কি ভাবেন, তারপর জিজ্ঞাসা করেন, 'দিদিমণি কোথায় ?'

পাচিকা উত্তর করে—'হেঁসেলে আছেন! ডেকে দেব বাবু ?'

কানাই চৌধুরী বলেন—'না, তুমি যেতে পার।'

পাচিকা রান্না ঘরে গিয়ে সাধনাকে বলে—'বাবুর মুখ আর খাওয়া দেখে বুঝনু গো দিদিমণি, তোমার রান্না ভাল হয়েছে, বাবুর মুখে লেগেছে।' একটু পরে সাধনা কাছে এসে দাঁড়াতেই কানাইবাবু স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে বলে ওঠেন : এ সব কি কাণ্ড করেছ মা! সেরেস্তা থেকে ভিতরে আসতে যেদিকেই নজর পড়ে, দেখি প্রত্যেকটি পালটে দিয়েছ, একটা নূতন রূপ ফুটে উঠেছে।

সাধনা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে—মস্তবড় তালুক, কত লোকজন, সব নখদর্পণে দেখেন শুনেছি, শুধু নিজের দিকটাই দেখতে ভুলে যান জেঠামণি!

কানাইবাবুর মুখে স্বচ্ছ হাসি ফুঠে ওঠে। বলেন—সারা জীবন ধরে শুধু টাকার সাধনাই যে করেছি মা, লক্ষ্যটাও যে

ঐ দিকেই পড়ে থাকত, তাই দেহটা বাদ পড়ে যেত। সে অভ্যাস আর বদলায়নি মা!

কণ্ঠে একটু জোর দিয়ে সাধনা জানায়—আমি এবার বদলে দেব জেঠামণি! তাইত ওদের বলছিলুম, জেঠামণি বলেন না ব'লে, তোমাদের কি ইচ্ছেও করে না ওঁর সেবা করি! এখন থেকে আমি আপনার সংসার গুছিয়ে দেব জেঠামণি, দেখি অভ্যাস বদলায় কিনা।

আহারান্তে শয়নকক্ষে গিয়েও কানাইবাবু অবাক হয়ে শয্যার দিকে চেয়ে থাকেন—তারও চেহারার পরিবর্ত্তন হয়েছে! সেই থেকে সাধনাই সব দেখা শোনা করতে থাকে; তার নিখুঁত ব্যবস্থায় পান থেকে চুণটুকুও খসবার উপায় থাকে না। কানাইবাবু অভিভূত হ'য়ে পড়েন। কিন্তু মথুরবাবুর কাছে শুনেছেন, নিজেও দেখেছেন, সাধনাকে কিভাবে চরকীর মত ঘুরে নানা কাজ করতে হয়; তার সুব্যবস্থায় তাঁর নিজের সুখ ও আরামের অন্ত নেই সত্য, কিন্তু তার মত কিশোরীর পক্ষে এটাও একটা মস্ত ঝঞ্ঝাট ভেবে তিনি তাকে নিরস্ত করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। বলেন্—এত খাটুনি তোমার দেহে সইবে না মা, শেষে কি অসুখ-বিসুখ বাধিয়ে বসবে?

কিন্তু কথায় সাধনাকে দাবিয়ে দেওয়া আরও কঠিন; জেঠামণির আপত্তি শুনে সে হেসেই অস্থির! বলে—কি এমন গন্ধমাদন আমি বইছি আপনার সংসারে যে ভেবে অস্থির হয়েছেন? আপনার কি লোকজনের অভাব আছে?

হয়। দিনের বেলায় মথুরবাবুকে খাওয়ানোর ভার পিসির উপরেই থাকে, সাধনাকে তখন পাঠশালার পড়া ও কানাই বাবুকে দেখাশোনা করতে হয়। কিন্তু রাত ঠিক আটটা বাজতেই কন্যার আহ্বানে মথুরবাবু পুত্র সুধীরকে নিয়ে খাবার ঘরে আস্তৃত আসনে এসে পাশাপাশি বসেন, আর সাধনা কাছে বসে তাঁদের খাওয়ার তদ্বির করে—পিসির পরিবেশন সত্ত্বেও কোন কিছু প্রয়োজন হলে নিজেই ছুটে গিয়ে এনে তাঁর হাতের সুসার করে দেয়। সাধনার অনুরোধে ধীরে ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে তাঁদের প্রতিটি খাদ্য খেতে হয়, আর এই সময় সারাদিনের খবরগুলিও সে দিব্যি সাজিয়ে বলতে থাকে—মথুরবাবু মুগ্ধ হয়ে শোনেন, মাঝে মাঝে প্রশ্নও করেন। এই সময় বড় বাড়ীর কথাও সাধনাকে বিচলিত করে—জেঠামণি এখন কি করছেন, কে জানে! যদিও সে রাতের রান্নার ব্যবস্থা সব করে দিয়ে আসে, বামুন-ঠাকরুণকেও বলা আছে, আটটা বাজবার আগেই বাতাসীকে খাবার ঘরে ঠাঁই করতে বলেই নারাণীকে বাইরের ঘরে পাঠাবে জেঠামণিকে খাবার জন্য তাগিদ দিতে—তবুও তার মনটি খিচ্ খিচ্ করতে থাকে এই ভেবে যে, একজন কাছে বসে দরদ দিয়ে তাড়া না দিলে কি, ও-সব লোকের ঠিক মত খাওয়া হয়? এই নিয়ে মথুরবাবুর কাছে কত দুঃখই সাধনা করে!

কিন্তু পুরো একটি বছর এই ধারায় সাধনার কর্মসূচী চলবার পর এ বাড়ীতে সপুত্র নীরদাদেবীর শুভাগমন হয়। সাধনা

ভেবেছিল, এবার দরদ দিয়ে দেখবার লোক এসে গেছে, অন্ততঃ রাতের দিকে জেঠামণির খাওয়ার জন্যে আর তাকে ভাবতে হবে না। কিন্তু অলক্ষ্যে থেকে নিয়তি যে তখন হেসেছিলেন, সাধনা ও তার জেঠামণি তখন জানতে না পারলেও, নীরদা-দেবীই ধীরে ধীরে এ সংসারে—তাঁর কর্তৃত্বটি ছাড়িয়ে দিয়ে সেটা কিভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন, ঘটনা প্রসঙ্গে আগেই সে সব উল্লেখ করা হয়েছে।

দশ

সেদিন কানাইবাবুর বৈঠকখানায় হাবুলের কাঁধে চড়ে নিতায়ের আসার পর যে নূতন পরিস্থিতির সূচনা হয়, নিতাই ও নীরদা এবং নবাগতা স্বপ্না ও তার ভ্রাতা রমেশ সে সম্পর্কে উল্লাসিত হলেও, প্রসঙ্গটির ভবিষ্যৎ ভেবে সাধনাকে কিন্তু উদ্বিগ্ন হতে হয়—যদিও তার মুখ থেকেই ঘোড়া কেনার কথাটা সর্বপ্রথম উঠেছিল।

কানাইবাবুর পক্ষে এ প্রস্তাব তুষ্টিদায়ক না হলেও, তখনকার অপ্রীতিকর অবস্থাটি এর পর আর কোন অশান্তি সৃষ্টি করবে না বুঝেই তাঁকে সন্তুষ্ট হতে হয় এবং একটু অসময়েই বাড়ীর ভিতর গিয়ে সর্বাগ্রে নীরদাকেই খবরটি শুনিয়ে দিয়ে আশ্বস্ত হন।

এদিকে সাধনার মনে প্রশ্ন জাগে, ঘোড়ার কথাটা তুলে সে কি ভাল করেছে! অবিশ্যি তার শিক্ষাদাতার মুখে দেশ-বিদেশের বহু উপাখ্যান শুনে সে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল যে, মানুষের দেহ ও মনকে বলিষ্ঠ, কর্মঠ ও নিয়ন্ত্রিত করার পক্ষে ঘোড়া একটা বিশেষ নির্ভরযোগ্য উপাদান। স্বাধীন-দেশের ছেলেমেয়েরা এজন্য শৈশব থেকেই ঘোড়ায় চড়ে চলা-ফেরা অভ্যাস করে—ব্যায়াম বা শরীর-চর্চার ব্যাপারে তাই ঘোড়ায় চড়াকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। শুধু শুনে অভিজ্ঞতা অর্জন নয়, হাতে-কলমে পরীক্ষার পর সে নিজেও

এই ব্যায়ামটির গুণের কথা জেনেছে। বছর তিনেক আগে, তখন সাধনা নয় কি দশ বছরের মেয়ে, তখনই নিজের একটা দোষ নিজেই সে ধরে ফেলে, সেটি হচ্ছে—মনের ক্রোধ। কেউ কিছু রূঢ় কথা বললে, কারও কিছু দোষ-ত্রুটি দেখলে, শুধু মুখ চালান নয়—সেই সঙ্গে সে হাত পর্য্যন্ত চালিয়ে একটা বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি করত। একদিন সাধনা এই দোষের কথাটা আনন্দস্বামীকে বলেই ফেলল—কিছুতেই যে রাগকে দমন করতে পারি না দাদু, কিন্তু এতো ঠিক নয়; বলুন ত কি করি? স্বামীজী বলেন—'এটা আমিও লক্ষ্য করেছি, আর—এর উপায়ও আছে। সেটি হচ্ছে—ঘোড়ায় চড়ে চলাফেরা। দুষ্টু ঘোড়াকে যদি রাস টেনে সংযত করতে পার, মনের রাসকে তখন বাগে আনা শক্ত হবে না। তাছাড়া, আমি যেভাবে তোমাকে তৈরী করছি—ঘোড়ায় চড়া, আর সেই সঙ্গে দু' চারটে কসরৎ শিখাতে না পারলে তোমার শিক্ষা ত সম্পূর্ণ হবে না।' সাধনা একথা শুনে আশ্চর্য হয়েই বলেছিল—'কি বলছেন দাদু, মেয়েমানুষ ঘোড়ায় চড়বে! লোকে এ কথা শুনলেই যে ঠাট্টা করবে।' স্বামীজীও বেশ শক্ত হয়ে সাধনাকে বুঝিয়ে দেন যে, নূতন কিছু দেখলেই সাধারণ লোকে অনেক কিছু বলে। তোমার শিক্ষা নিয়েও অনেকে অনেক কথা বলত, এখন তারাই বলে মা-সরস্বতীর অংশে তুমি জন্মেছ। 'মেয়েরা অবলা,' এই বলে ত মেয়ে জাতটাকেই পঙ্গু করে রেখেছে। কিন্তু কি করে সবলা হতে

পারে, সে চিন্তা কি কেউ করেছে? দু'চারটি আঙ্গিক আসন আর দেহ-চর্চার প্রণালী—যেগুলো পাঁচ বছর বয়স থেকে তোমাকে শিখিয়ে আসছি, সেগুলোও শিখবার সুযোগ দিয়ে বাড়ীর মেয়েগুলোকে স্বাস্থ্যবতী করতেও বাপ-মায়ের ইচ্ছা বা যত্ন নেই। তাইত আমি তোমাকেই শিক্ষার ব্যাপারে আদর্শ করে জাতটাকে নাড়া দিতে চাই। একটা মেয়ে তৈরী হলেই সবার চোখ খুলবে। তখন সবাই বলবে—একশ্চন্দ্রতমোহন্তি ন চ তারা সহস্রসঃ।

এইভাবে আলোচনার পর আনন্দস্বামী মথুরবাবুকে সম্মত করে সাধনাকে তাঁর আসানসোলের আশ্রমে নিয়ে যান। সেখানে পুরা তিনটি মাস ধরে তার শিক্ষা চলে অতি সংগোপনে ও বিচিত্র বিধানে। ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটা, ছোরাছুরি ও লক্ষ্যভেদের কঠিন কসরৎগুলি অতি পরিপাটিরূপে শিখিয়ে দেওয়া হয় তাকে—বিংশ শতকে এর আগে কোন বাঙালী বালিকা ওভাবে এই সব বিচিত্র শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে বলে সাধু আনন্দস্বামীরও জানা ছিল না। তবে তিনি বা তাঁদের কেন্দ্রীয় আশ্রমের যিনিই এভাবে নারীশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন, তাঁরা প্রত্যেকেই শিক্ষার্থিনীদিগকে শরীরচর্চাতেও পটিয়সী করে তুলতে সচেষ্ট হতেন। তবে এ বিভাগে সাধনার মত অগ্রবর্তিনী ছাত্রী নাকি একান্ত দুর্লভ ছিল। সে যাই হোক, সাধনার এখানকার শিক্ষার কথা মধুমতী গ্রামের কেউ জানল না—কেবল সে মথুরবাবুকে তার নূতন শিক্ষার কথা

শুনিয়ে অবাক করে দিয়েছিল। কন্যার চেহারা দেখেই তিনি স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকেন। তার অঙ্গে অঙ্গে এমন একটা বলিষ্ঠ কান্তির আভাস পান—যেটি অপূর্ব। তারপর, কন্যার মুখে এই অপরূপ দেহশ্রী সঞ্চয়নের মূলতত্বটি শুনেই মুগ্ধ হন। বুঝতে পারেন, দেশ-ভ্রমণে গিয়ে কন্যা এমন বিদ্যা শিখে এসেছে—বাঙলাদেশ থেকে যার পাট অনেক আগেই উঠে গেছে, শুধু যে সব ছেলে আই, সি, এস, পরীক্ষা দেবার জন্য বিলাতে যায়, তারাই সেখানে বাধ্য হয়ে এ বিদ্যা শিক্ষা করে। কিন্তু শোনা যায়, পড়াশোনার ব্যাপারে তারা যত কৃতিত্বই দেখাক, বেশীর ভাগ ছেলে ঘোড়ায় চড়া বিদ্যার কসরৎ দেখাতে গিয়েই ফেল করে, অগত্যা দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে বাধ্য হয়—আই, সি, এস-এর 'ডিপ্লোমা' দুল'ভ হয়েই থাকে। অথচ, স্বামীজীর উদ্যোগে এই বয়সে তাঁর মেয়ে ঐ কঠিন বিদ্যায় পাস করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে এসেছে। তিনি তখন কন্যার উৎফুল্ল মুখখানির পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিলেন—'মা, সাধু দাদুর শিক্ষায় বই পড়া বিদ্যায় সরস্বতী হয়ে গ্রামশুদ্ধ সকলকে অবাক করেছ, এর পর তিনি চুপি চুপি তোমাকে যে বিদ্যায় পটিয়সী করেছেন, সেটা জানাজানি হলে এরা ত ভিরমি যাবে, তারপর পুলিসের কানে উঠলে—

মৃদু হেসে সঙ্গে সঙ্গে সাধনা বলে ওঠে—'সরস্বতী রণচণ্ডী হয়েছে জেনে ওরা কালো খাতায় নাম লিখে রাখবে—এই তো? কিন্তু আপনি ভাবছেন কেন বাবা, এ কথা কেউ

জানবে না। এইজন্যই ত সাধু দাদু আমাকে সবার চোখের আড়ালে রেখে শিখিয়েছিলেন এ বিদ্যে। তিনিও বলেছেন, কথাটা গোপন থাকবে। কিন্তু আপনার কাছেত কিছু চেপে রাখা উচিত নয়, তাই বললাম।"

সুতরাং গ্রামের কেউই এ পর্য্যন্ত সাধনার পরবর্তী শিক্ষার কথাটি জানতে পারেন নি। এখন ঘটনাসূত্রে হঠাৎ এই ঘোড়ার কথাটা কানাইবাবুকে বলার পরেই মনে মনে সে অপ্রতিভ হয়ে পড়ে এবং একটা দুশ্চিন্তা নিয়েই বাড়ীতে আসে। সন্ধ্যার পর মথুরবাবুও সাধনাকে ডেকে বলেন—'কানাইবাবু নিতায়ের জন্যে একটা টাট্টু ঘোড়া আনাবার জন্য বললেন। শুনলাম, তুমিই তাঁকে এ পরামর্শ দিয়েছ?'

অসঙ্কোচে সাধনা জানায়—'হ্যাঁ। আমার কথাতেই জেঠামণি হাবুল বেচারার কাঁধে চড়া বারণ করেছেন। পাছে এই নিয়ে নিতাইদা'র মা জেঠামণিকে দোষেন, সেই জন্যে আমি তাঁকে ঐ পরামর্শ দিয়েছি।'

মথুরবাবু ঈষৎ ক্ষুব্ধ ভাবেই বলেন—'কিন্তু ঘোড়া এলে তখন যে উল্টো বিপত্তি হবে মা! ঘোড়ায় চড়নেওলা এখানে কেউ নেই। কে ওকে শেখাবে বল?'

তেমনি হেসে সাধনা বলে—'ঘোড়া এলে চাবুকের জন্যে কি আটকাবে বাবা! একটা সহিসও তাহলে রাখতে হবে, সেই লোক নিতাইদাকে শেখাবে।'

মথুরবাবু বলেন—'কিন্তু আমার ভয় হয় মা, পাছে তোমার

বিদ্যেটা ধরা পড়ে যায়। তুমি ও বিদ্যেটা শিখেছ অথচ সেটা চাপাই রয়েছে—আমার মনে হয় কি জানো, চাপা বিদ্যেটাই তোমার মনে ঐ ইচ্ছাটিকে হয়ত জাগিয়ে দেবে। যাই হোক, যা হবার হবে। তবে কালই ঘোড়া এসে পড়বে, আমি সে ব্যবস্থা করে এসেছি। সইসের কথাটা কিন্তু ভাবিনি, তুমি বলতে মনে হল, ভুল হয়ে গেছে। যাক্ সে ব্যবস্থাও হবে।'

সাধনার মনের চিন্তা আরও গভীর হয়ে ওঠে পিতার কথায়। সে তখন ভাবতে থাকে—তবে কি বাবার কথাই ঠিক? ঘোড়ার কথা বলার সঙ্গে আমার ঐ শিখেফেলা বিদ্যাটির কি যোগাযোগ আছে!

তৎক্ষণাৎ মনে মনে শক্ত হয়ে সাধনা স্থির করে—কাল ভোরে আশ্রমে গিয়েই প্রথমে সাধু দাদুকে কথাটা বলবে। তিনিই এর উত্তর দেবেন।

পরদিন প্রত্যূষে যথারীতি নির্দ্ধারিত কাজগুলি শেষ করে এবং পাড়ার ক'টি মেয়ে ও ভাই সুধীরকে বইয়ের পাঠ ও অঙ্ক দিয়ে সাধনা স্বামীজীর আশ্রমের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। কাঁধে তার বইয়ের দফতর, এক হাতে ফুলের সাজি, অন্য হাতে দীর্ঘ দণ্ড, এলো চুলগুলি পীঠ ঝাঁপিয়ে পড়েছে—অপূর্ব কিশোরী মূর্ত্তি, দেখলেই শ্রদ্ধায় মন ভরে ওঠে। এদিন নূতন একটি স্তোত্র ধরেছে সাধনা, গানের মত এক মধুর সুরে তার ঝংকার উঠেছে—

প্রাতঃ প্রভৃতি সায়ান্তং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্॥
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥
প্রাতর্নমামি তমসঃ পরমর্কবর্ণং
পূর্ণং সনাতন পদং পুরুষোত্তমাখ্যানম্।
যস্মিন্নিদং জগদশেষমশেষমূর্ত্তৌ
রজ্জাং ভুজঙ্গম ইব প্রতিভাসিতং বৈ॥

প্রাতঃকালীন স্তোত্রটি সঙ্গীতের মত সুরে পাঠ বা আলাপ করতে করতে সাধনা অন্যান্য দিনের মত আনন্দস্বামীর আশ্রমে প্রবেশ করল। সেখানকার প্রাত্যহিক কাজগুলি সিদ্ধ-হস্তে শেষ করে ধ্যানমগ্ন স্বামীজীর চরণে অর্ঘ্য এবং গলায় স্বহস্তে গাঁথা মালা পরিয়ে দিল।

এদিন পাঠারম্ভের পূর্বেই সাধনা সাধুকে জিজ্ঞাসা করল: একটা বড় সমস্যায় পড়েছি দাদু, আপনাকে না বলে শান্তি পাচ্ছি না।

স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে শিষ্যার দিকে চেয়ে সাধু আনন্দস্বামী বললেন: তোমার মুখেই তার আভাস পাচ্ছি, মনে হচ্ছে—সমস্যাটা তোমার নিদ্রায়ও বিঘ্ন ঘটিয়েছে। বলত কি ব্যাপার?

সাধনা শান্ত কণ্ঠে বলল: জেঠামণির নূতন ভাগনের

কথাত বলেছি আপনাকে। হেবো চাকরের কাঁধে উঠে বেড়ানো যেন তার অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়। ঘোড়া ভেবে চাকরটাকে এমনি নিগ্রহ কাল করে যে, জুতোর গোড়ালির ঠোক্কর লেগে তার কোমরের মাংস কেটে যায়। তখন বাধ্য হয়েই আমাকে জোর গলায় প্রতিবাদ করতে হয় দাহু! তার ফলে জেঠামণি হাবুলকে বারণ করে দেন, আর যেন না দাদাবাবুকে তার কাঁধে তোলে।

সাধু বললেন ঃ বটে! তা এখন সমস্যটা এলো কেন? চৌধুরী মশায়ের ভগ্নী কি ও ব্যাপারে রাগ করেছেন?

সাধনা বলল ঃ তিনি যে রাগ করবেন, তাতে বোঝবার কোন ভুল ছিল না। আর, আমি জানি, আমার কথাতেই ওটা বন্ধ হওয়ায়, তিনি রেগে আগুন হয়ে উঠবেনই। তখন জেঠামণিকেও বিব্রত হতে হবে। তাই দাহু, আমার কি খেয়াল হলো—ঝাঁ করে বলে ফেলি—আপনার ভাগনেকে একটা ঘোড়া কিনে দিন জেঠামণি, তাহলেই সব ল্যাঠা চুকে যাবে। শুনে জেঠামণি ত কথাটা যেন লুফে নিলেন, এর পরেই নাকি বাবাকে বলেছেন—ভাগনের জন্যে খুব শীগগীর একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দিতে। এর পর বাবা বাড়ী এসে আমাকে বলেন—আপনার কেন্দ্রীয় আশ্রমে গিয়ে আমি ঘোড়ায় চড়া শিখেছিলাম বলেই, আমার মনের মধ্যে সেটা হুটপাট করছিল, অর্থাৎ ঘোড়ায় চড়বার জন্য আমার মনটাও নিস্পিস করছিল, তাই মুখ থেকে ঘোড়ার কথা বেরিয়ে গেছে। আমার

মনে হচ্ছে দাদু, হয়ত তাই হবে। এখন ভয় হচ্ছে, ঘোড়া এলে যদি কোন নূতন ফ্যাঁসাদ বাধে ! এখন কি করা যায় ?

মৃদু হেসে সাধু বললেন : মায়ের ইচ্ছায় তুমি যেভাবে প্রকৃতির বাঁধাধরা নিয়মে তৈরী হয়েছ, তাতে তুমি যা বলবে, কিম্বা যে কাজ করবার জন্য এগিয়ে যাবে, তার মধ্যে কোন ছলচাতুরী বা অন্যায় থাকতে পারে না। কাজেই, বাধা বিঘ্ন ঘটলেও শেষ পর্য্যন্ত তোমার ইচ্ছাই সার্থক, আর—কথা সত্য হতে বাধ্য। ঘোড়ায় চড়া কি ধরণের ব্যায়াম, দেহ আর মনের জড়তা কত শীঘ্র কাটিয়ে দেয়, তুমি ত হাতে হাতে তার ফল পেয়েছ, তারপর ঘোড়ার সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলিরও লাগাম ধরে বাগ মানাতে শিখেছ। মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়বার জন্য তোমার মনটাও নিস্‌পিস করে নিশ্চয়ই। তোমার সেই প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাটাই ও কাজ করাচ্ছে সরস্বতী। তোমার অন্তর চেয়েছে, ও ছোকরাও মানুষ হয়—তোমার সংস্পর্শে থেকে ওর দোষগুলো শুধরে যায়। এ ত শুভ ইচ্ছা, তবে এই নিয়ে ভাববার কি আছে ? আমি তোমার চিন্তাটা বুঝিছি—ঘোড়া এলে, তুমি যে ও জানোয়ারটাকে এই বয়সেই বাধ্য করতে শিখেছ, তারপর—তুমিও ঘোড়ায় চড়তে জানো, পাছে কোন সূত্রে এটা জানাজানি হয়ে পড়ে, সেই জন্যেই তোমার দুশ্চিন্তা। কিন্তু আমি বলছি, ঘোড়া নিয়ে কিছু ঘটলে তোমার বিবেক যা বলবে, তাতেই সহজভাবে ওর সমাধান হয়ে যাবে। ধর, তুমি রীতিমত সাঁতার জান—এ কথাটা চাপা আছে। কিন্তু

তোমার সামনে কেউ যদি জলে ডুবছে দেখতে পাও– তখন কি তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে সরস্বতী ?

সাধনা উৎসাহের সুরে বলে উঠল : নিশ্চয়ই না, তখনি তাকে তোলবার জন্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

সহাস্যে আনন্দস্বামী বললেন : বাস, বাস ! এখানেই তোমার ঘোড়ার সমস্যারও সমাধান হয়ে গেল। বুঝেছ আমার কথা ?

মুখখানা হাসিতে ভরিয়ে সাধনা বলল : হ্যাঁ দাদু, বুঝেছি। আর আমি ও কথা নিয়ে ভাবব না।

আনন্দস্বামীও স্নিগ্ধস্বরে বললেন : প্রভাতে যে স্তোত্র পাঠ কর, তাতেই ত রয়েছে—ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি। তবে ? নিষ্পাপ নির্মল বলিষ্ঠ মনে পরমাত্মার ইচ্ছা প্রকাশ পায়। সেই ইচ্ছা থেকে মুখ দিয়ে বাক্য নির্গত হয়, সেই ইচ্ছাই কর্মে নিযুক্ত করে। সুতরাং যিনি বলাচ্ছেন, আর করাচ্ছেন—তাঁকেই কর্তা মনে করে নির্ভয়ে সে কাজ কর—এর জন্য যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়, নির্ভয়ে এগুতে হবে। কেননা, তুমি এখানে কর্মী, কর্মকর্তা সেই পরমাত্মা। গীতার কর্মযোগে ঠিক এই ধরণের কথা আছে, মনে করে দেখ।

সাধনা তৎক্ষণাৎ বলল : হ্যাঁ দাদু, মনে পড়েছে। কর্মযোগে ত্রিশের শ্লোকে আছে—

'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতনা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥

প্রসন্নমুখে আনন্দস্বামী বললেন : পড়েছ, আত্মস্থ করেছ, তবুও চিন্তা ? না, না, এসব সংকোচ কাটাতে হবে। একটা কথা আমি তোমাকে বলে রাখছি মন দিয়ে শুনে রাখ। তোমার জেঠামণিও একজন প্রকৃত কর্মযোগী। তিনি মনে প্রাণে চাইছেন—তাঁর চপলমতি দাম্ভিক ভাগনেটিকে একটি আদর্শ ছেলে করে তোলেন, তার জন্য নানাভাবে তোমার সাহায্য নিচ্ছেন। ওদিকে তাঁর অবুঝ ভগিনীটি সমস্ত চেষ্টা পণ্ড করে দিচ্ছেন। এইখানেই চলেছে এক বিচিত্র সংগ্রাম। ঐ যোগী মানুষটির প্রতি তোমার যদি সত্যকার শ্রদ্ধা থাকে দিদি, তাহলে তোমার উচিত যথাশক্তি তাঁকে সাহায্য করা। কিন্তু এমনও হয়ত হতে পারে, এই সংগ্রামটিই ক্রমে ব্যাপকভাবে মস্ত এক জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাধনা গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করল : আমি তখন কি করব ?

আনন্দস্বামী উদাত্ত কণ্ঠে বললেন : "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

এরপর স্মিতমুখে সাধনা তার দফতর খুলতে লাগল অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে।

এগার

রমেশ ও স্বপ্না সর্বদাই নিতাইকে ঘিরে রাখতে চায়। এ সম্বন্ধে বাপ-মায়েরও কড়া নির্দেশ—ভাই-বোন যেন তার সঙ্গছাড়া না হয়, আর—সাধনা নিতায়ের সঙ্গে মিশতে না পায়। কিন্তু পাঠশালার ছুটির পর বৈঠকখানায় যখন কানাইবাবুর সামনে সাধনা ও নিতাই মুখোমুখী বসে পড়াশোনা করে, সেখানে স্বপ্না বা রমেশের প্রবেশাধিকার নেই। তাই ওঁরা ছেলেমেয়েকে হুঁসিয়ার করে দিয়েছেন, কর্তাবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর সাধনা যাতে একা নিতায়ের সঙ্গে না মিশতে পারে, ভাই-বোনে সে চেষ্টা করবে। তবে এ ভাবে ছেলেমেয়েকে কুপরামর্শ না দিলেও চলত; কেননা, সাধনা সে প্রকৃতির মেয়েই নয় যে, এতক্ষণ এক সঙ্গে পড়াশোনার পর বাইরে এসেই আবার গায়ে পড়ে নিতায়ের সঙ্গে মেলামেশা করবে। রমেশ ও স্বপ্না দুজনকেই এই সময় বাইরে উন্মুখ হয়ে থাকতে হত, সাধনা বেরিয়ে এলেই তারা পরক্ষণে নিতাইকে নিয়ে পড়ত এবং কোন কিছু নতুন খবর শোনবার জন্য তার কৌতূহল উদ্রিক্ত করে তুলত। বুদ্ধিমতী সাধনার অবিদিত ছিল না যে, এরা দুজনে কি ভাবে নিতায়ের মন যুগিয়ে চলে, আর সেজন্য কারণে-অকারণে খোসামোদের কিরূপ খই ছড়াতে থাকে। সে শুধু মুখ টিপে হাসে এবং ভাইটিকে নিয়ে এদের ত্রিসীমা থেকে চলে যেতে পারলে যেন বাঁচে। এ অবস্থায়

নিতায়ের সঙ্গে থেকে কথা বলবার অবসরই বা তার কোথায়, আর এমন প্রবৃত্তি কেনই বা তার হবে ?

নিতাই পাঠশালায় পড়বে না। নীরদা দেবীর মতে তাতে ছেলের মানের খর্ব হবে। ভগিনীর মন বুঝে এবং সাধনারও পরামর্শমত তিনি বাড়ীতেই নিয়ম করে পড়বার জন্য দুজন শিক্ষকের বরাদ্দ করে দিয়েছেন। সকালের দিকে হাই-স্কুলের একজন বিচক্ষণ শিক্ষক তাকে ইংরাজী, ইতিহাস ও ভূগোল পড়াবেন ; সন্ধ্যার পর পাঠশালার যদুপণ্ডিত বাংলা পড়িয়ে অঙ্ক কষাবেন।

নীরদার ইচ্ছা ছিল, মোক্ষদার ছেলে রমেশও নিতায়ের সঙ্গে বাড়ীতেই পড়ে। কিন্তু কানাইবাবু তাঁর ইচ্ছাটি ঘুরিয়ে রমেশকে হাইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে মথুরবাবুও নির্দেশ পান, স্কুলে পড়ার বেতন ও পড়ার বই দাতব্য খাত থেকেই রমেশকে দেওয়া হবে। স্বপ্নার পড়ার সম্বন্ধেও কথা তুলেছিলেন নীরদা দেবী। কানাইবাবু তাতে বলেছিলেন—ও মেয়ের কথাবার্তা শুনে আর নাচ-গানের ওপর এই বয়সেই অতটা ঝোঁক দেখে বুঝেছি, পড়াশোনা ওর আর হবে না। আর পড়াশোনা করেই বা ওর কি দরকার, বরং ঘরসংসারের কাজ করুক, মায়ের সুসার হবে।

দাদার মুখের কথাটা শুনেই নীরদা ফোঁস করে উঠেছিলেন সেদিন। তিনি বুঝাতে থাকেন—পড়াশোনায় স্বপ্নাও কম নয় দাদা, তোমার পাঠশালার বিদ্যে ওর সব শেখা হয়ে গেছে।

কানাইবাবুও গম্ভীর মুখে তখন বলেছিলেন—ভালই হয়েছে, আর না হলেও ঐ নাচ-গানওয়ালী মেয়েকে পাঠশালায় আমি ঢোকাতুম না। তবে ও-যদি আরও পড়তে চায়, তাহ'লে বাড়ীতেই বরং পড়ুক, তুমি বরং মাষ্টারের মাইনেটা দিও, তাতে তোমারও নাম হবে।

দাদার শেষের কথাটা নীরদার মনঃপুত হয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে, লোকটার বিবেচনা আছে। তারপর মাইনেটা দেবার জন্য বললেও নীরদা দেবীত জানেন, দাদার টাকা থেকেই তিনি দেবেন। এখানে আসার পর থেকে দাদা তাঁকে যে টাকা হাতখরচ বলে দেন, একটা বড় সংসার সে টাকায় সচ্ছলভাবে চলে যায়। মোক্ষদার এই মেয়েটা যখন তাঁর মনে ধরেছে, সব দিক দিয়ে তিনি তাকে এমন চৌখস করে তুলবেন যে, সাধনার গরবও একদিন টুটে যাবে, আর এই মেয়েকে দেখে দাদা তখন অবাক হয়ে চেয়ে থাকবেন। কেমন কায়দা করে কথা কয়, কি সুন্দর গান গায়, আর নাচ দেখলে চোখের পল্লব পড়তে চায় না। দাদার জীবনে ত কোন সখ নেই, তাই ভাল লাগেনা, ও সব পছন্দ করেন না। কিন্তু আজকালের ছেলেরা ত এই চায়। তা' দাদা এখন যতই 'সাধি সাধি' করুন, আর ওকেই বাড়াতে থাকুন, আমি কিন্তু ভুলছি নে।

যাই হোক, এর পর নীরদা দেবীর সম্মতি পেয়ে ঘোষাল মশাই এমন একটি মাষ্টার খুঁজতে থাকেন, তাঁর বাসায় এসে রমেশ ও স্বপ্না দু'জনকেই যিনি সকালে বিকেলে পড়িয়ে

যাবেন। তার জন্য আর্থিক ভাবনার ত কিছু নেই—'লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন'! দিদিরাণীর দৌলতে তাঁর অদৃষ্টে এ কথাটা যখন মিলেই গেছে।

এই সময় স্বপ্না একদিন একুশ বাইশ বছরের এক প্রিয়দর্শন তরুণকে বাড়ীর মধ্যে এনে উল্লাসের সুরে বলল: বাবা, মা, এই ছ্যাখ ; কলকাতা থেকে আমাদের নিধুমামা এসেছেন।

স্বপ্নার কথার সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক ছেলেটি যথাক্রমে ঘোষাল-দম্পতির পদতলে মাথা নীচু করে প্রণাম জানাল। কিন্তু তাঁরা ছেলেটিকে চিনতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্বপ্নার দিকে তাকাতেই স্বপ্না সহাস্যে বলল: মামীমার পিসতুত ভাই হন ; আমাদের মামার বাড়ীতে থেকে কলেজে পড়তেন তখন।

এতক্ষণে বুঝতে পেরে উভয়েই আশীর্বাদ ও সম্ভাষণ করলেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে স্বপ্না বলল: আমার নাচ-গান সব নিধুমামার কাছেই শেখা। তোমরা ত আমার জন্যে মাষ্টার খুঁজছ, নিধুমামাকেই বলনা বাবা—উনি এখানে থেকে আমাকে পড়াবেন, আরও গান শেখাবেন।

ঘোষাল দম্পতি চেয়ে চেয়ে ছেলেটিকে দেখছিলেন। একটু কাহিল হলেও ছেলেটি দেখতে মন্দ নয়, চালাক-চতুর বলেও মনে হয়। জিজ্ঞাসা করে জানলেন, গ্রামের স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় ভগিনীপতির বাড়ীতে এসে আশ্রয় নেয়। সেখান থেকে কলেজে পড়তে থাকে। কিন্তু আই, এ পাশ করতে পারেনি, তবে নাচে গানে

খুব নাম করছে। এখানে এসেছে আত্মীয়তার সুবাদে—ঘোষাল মশাই যদি জমিদারী সেরেস্তায় চাকরী করে দেন। কলকাতা থেকেই সে গান-বাজনার ব্যাপারে মধুমতী এষ্টেটের নাম শুনেছিল—এখানকার জমিদার বাড়ীতে নাকি গাইয়ে-বাজিয়েদের ভারি কদর, মাস-মাইনে দিয়ে রাখা হয়।

ঘোষাল মশাই কথাটা শুনে মুখভার করে বললেন: সে সব এখন হাওয়া হয়ে গেছে বাবাজী! সে রামও নেই, আর অযোধ্যাও নেই, এখন ছাগল দিয়ে হাতীর কাজ চালান হচ্ছে। হ্যাঁ, তবে—এক দিন ছিল বটে!

জোরে একটি নিশ্বাস ফেললেন ঘোষাল মশাই অতীতের ঐতিহ্য ও সুখ-সুবিধার কথা ভেবে। তারপর বললেন: থাকতেন আজ রায় বাবুদের কেউ, লুফে নিতেন তোমাকে। এখনকার হুজুরের আমলে জলসা-ঘর তালাবদ্ধ হয়ে পড়ে আছে, আর ছুঁচোর কেত্তন সুরু হয়েছে। যাক্, তাক বুঝে খুব সময়ে তুমি এসে পড়েছ বাবাজী, হয়ত একটা হিল্লে তোমার করতে পারব। তবে একটা কথা বলে রাখি, নাকখানা কিন্তু ঘুরিয়ে দেখাতে হবে তোমাকে। তুমি বি, এ, পর্য্যন্ত পড়েছ অর্থাৎ কিনা আণ্ডার-গ্রাজুয়েট, তার ওপর গানের ওস্তাদ, কলকাতায় রীতিমত পসার, তবে শরীর ভাল নয় বলেই যেন এখানে বেড়াতে আসা হয়েছে। চাকরীর উমেদারীতেই যে এসেছ, একথা কেউ যেন না জানতে পারে। সবাই যেন জানে—স্বপ্নার তুমি ছোট মামা, সেই সুবাদেই আসা।

বাস্—তারপর যা যা করবার, আমরা সব ঠিক করে নেব। মোদ্দা কথা, তুমি এখানে বাহাল হয়েই গেছ—এটা মনে ঠিক দিয়ে রাখতে পার। এখানে খাবে দাবে, থাকবে, আর ঘরেরও অভাব নেই—একখানা ঘরও পাবে। তবে শুধু ভাগনী নয়—ভাগনেটাকে পর্য্যন্ত দেখতে হবে; আই, এ, পর্য্যন্ত পড়েছ যখন, বিদ্যেও ত কম নয়।

সেইদিন থেকেই নবাগত ও নব-পরিচিত সহুরে কেতাদুরস্ত এই ছেলেটি সুদূর একটা সম্পর্কের খাতিরে স্বপ্না ও রমেশের মাতুল রূপে ঘোষাল পরিবারে আপনজনের মত স্থান পেল এবং বাইরের সকলে জানল—আগন্তুক নিধান রায় ঘোষাল মহাশয়ের শ্যালক এবং তার পুত্র-কন্যার মামা, ছেলেটি আণ্ডার গ্রাজুয়েট, তার ওপর নাম করা কলাবিদ্। এখানে হাওয়া বদলাতে এসেছে। তবে এ পক্ষ থেকে চেষ্টা হচ্ছে যদি তাকে কোন কাজকর্ম দিয়ে এখানে রাখা যায়, তাহলে ঘোষাল মহাশয়ের ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়ে ওঠবার মত একটা সুবিধা পাবে।

নীরদাদেবী সব শুনে আর নিধান ছেলেটিকে দেখে তৎক্ষণাৎ কথা দিয়ে ফেললেন: তাতে কি হয়েছে, এ সুযোগ কেউ ছাড়ে কখনো? পর ত নয়—মামা ছাড়া আপন হয়ে আর কে দেখবে শুনি? আমি ত বলেইছিলুম ঘোষাল মশাইকে, স্বপনকে বাড়ীতে পড়াবার জন্যে ভালো মাষ্টার একটা রাখতে। আমার মন জেনেই ভগবান এই মামাকে পাঠিয়েছেন। থাকুক

এখানে, কোন ভাবনা নেই—দাদাকে বলে সেরেস্তায় একটা কাজ আমি বাগিয়ে দেবই ! এ ছাড়া—এখানে পড়াবার জন্যে —খোকার মাষ্টার যা পায়, তাই আমি নিধুকে দেব ; আর, খাই-খরচ বলে আলাদা কুড়িটে করে টাকা চুপি চুপি তুই আমার কাছ থেকে পাবি বৌ—কেউ জানবে না এ কথা।

মোক্ষদা দেবী এই অপ্রত্যাশিত কথা দিদিরাণীর মুখে শুনে আনন্দে কেঁদে ফেলবার মত হয়ে তাঁর পায়ের ধূলো মাথায় নিলেন। বললেন : কি শুভক্ষণে আপনার চোখে পড়েছিলুম দিদিরাণী !

দিদিরাণী গাঢ়স্বরে জানালেন : এমন তোদের কি করেছি আমি বৌ, যে অত করে বলছিস্ ! কি ক্ষণে তোর স্বপনকে আমি দেখেছি, সে কথা আমিই জানি, আর জানেন আমার অন্তর্য্যামী। সময় হোক সব শুনবি।

ঘোষাল মশাই বাড়ী এসে সব শুনে আহ্লাদে নৃত্যমুখী হয়ে বলে ফেললেন : দিদিরাণীর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক—উনি আমাদের গৌরীসেন ! আমরা এখানে পাহাড়ের আড়ালে আছি ওঁরই দৌলতে।

সেই দিনই বাইরের সকলে জানল যে, কলকাতা থেকে ফটিক ঘোষালের এক পরমাত্মীয়—তাঁর ছেলেমেয়েদের মামা এসেছেন ; বয়স অল্প হলেও খুব গুণী ব্যক্তি—যেমন বিদ্যায়, তেমনি গান-বাজনায়। খাবার সময় অবসর বুঝে নীরদাদেবী কানাইবাবুকে নিজেই নিধানের কথা বললেন : রমেশ ও

স্বপনের মামা হয়, ভারি বিদ্বান। হাওয়া বদলাতে এসেছে এখানে ; ছেলেটির গুণের কথা শুনে আমিই বলেছি, এখানে রাখ ওকে ; আপনার জন যখন, আর দুটো পাস করা ছেলে, ছেলেমেয়ের পড়ার ভার ওর হাতে দাও, আর আমিও দাদাকে বলে ওঁর সেরেস্তায় একটা চাকরী-বাকরীতে ঢুকিয়ে দেব। চাকরীর আশায় ছেলেটা নাকি থাকতে রাজি হয়েছে।

খেতে খেতে কানাইবাবু হঠাৎ থেমে স্তব্ধভাবে নীরদার পানে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে তারপর আস্তে আস্তে বললেন : এ যে দেখছি চালিয়াতি ব্যাপার—ঘোষাল ক্রমশঃই শিকড় চালাচ্ছে! প্রথমে শুনি—স্বামি-স্ত্রী থাকবে ; তারপর এল মামার বাড়ী থেকে ছেলেমেয়ে, এখন তাদের মামা পর্য্যন্ত হাজির! শেষে উটের মতন নাক বাড়িয়ে বাড়ীখানাকে না তপ্ত নিশ্বাসে বিষিয়ে তোলে!

দাদার কথায় মনে মনে অপ্রতিভ হলেও সেটা গায়ে না মেখে নীরদাদেবী একটু শক্ত হয়ে বললেন : তোমার যেমন কথা দাদা! পোড়ো মহলের খালি ঘর ক'খানা ভূতের বাসা না হয়ে মানুষে বসবাস করছে। নিজেই আশ্রয় দিয়েছ ; তা বলে ওরা আপনজনদের আনবে না! গরীব আর চাকরী করে বলে কি ওদের মনে সখ-আহ্লাদ নেই? আমি বলছি তোমাকে—ছেলেটিকে দেখলে তুমি খুসি না হয়ে পারবে না।

কানাইবাবু গম্ভীর মুখে বললেন : ছেলেটিকে আমি আগেই দেখেছি নীর, কিন্তু খুসি হতে পারিনি। কেন শুনবে?

এক ধরণের ছেলে আজকাল দেখা যায়—যারা পুরুষালীভাবের চেয়ে মেয়েলী ভাবটাই ভালবাসে। ওদের চলাফেরা, কথা বলা, ভাবভঙ্গি সবই মেয়েদের মতন। তোমার ঐ ছেলেটিও ঠিক ঐ দলের। সে যাই হোক, ঘোষালের ছেলেমেয়েকে পড়ানোর ব্যাপারে ঐ ছেলেটিকে দিয়ে কাজ চলে যাবে।

কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হলেও ছেলেটির সমর্থন করে নীরদাদেবী বললেন: সহুরে ছেলেদের ধরণই ঐ রকম দাদা, পাড়াগেঁয়েদের মত হৈ-হুল্লুরে ডানপিঠে নয় ত! আমার কিন্তু দাদা ছেলেটিকে ভাল লেগেছে; তারপর দুটো পাস করেছে শুনে তোমাকে জিজ্ঞেস না করেই কথা দিয়ে ফেলেছি, তোমার সেরেস্তায় একটা কাজে লাগিয়ে দেব। আমার সে মুখ তোমাকে রাখতে হবে দাদা।

মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠলেন কানাইবাবু। কিন্তু ভগিনীর সম্মুখে সেটা চেপে রেখেই বললেন: পাস করলেই সবাই জমিদারী কিংবা মহাজনী সেরেস্তায় কাজ করতে পারে না নীর, ওর পাঠ আলাদা। তারপর সেরেস্তার ভার আমি মথুরবাবুর হাতে দিয়েই নিশ্চিন্ত আছি। ওখানে কারও খাতির নেই—আবশ্যক না থাকলে শুধু কারও মন যোগাবার জন্য সেরেস্তার খরচ বাড়াবার পাত্রই নন মথুরবাবু। তাই ভাবছি—

মথুরবাবুর নামেই নীরদা জ্বলে উঠলেন। ঘোষাল-দম্পতি কারণে-অকারণে যখন তখন এই লোকটির বিরুদ্ধে নানা কথা লাগিয়ে নীরদাদেবীর মনটি অনেক আগে থেকেই বিষিয়ে

রেখেছেন; সুতরাং সেই অবাঞ্ছিত মানুষটির সম্বন্ধে দাদার এরূপ নির্ভরতার কথা শুনে তাঁর পক্ষে আর স্থির থাকা সম্ভব হল না। তাই কানাইবাবুর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই অসংযত কণ্ঠে বলে উঠলেন: নিজে মালিক হয়ে নিঃসম্পর্কীয় পরকে উঁচুতে তুলে এত নীচুতে তুমি নেমে গেছ দাদা! আমার কথা না থাকুক, কিন্তু তোমার কথা ভাবলে—

চড়া স্বরে ক্ষুব্ধ কণ্ঠের আরও কিছু কথা নীরদা বলতেন, কিন্তু কানাইবাবু তাঁকে সে অবসর না দিয়ে এখানেই কথাটার উপসংহার করে দিলেন: ও সব ভেবে কোন লাভ নেই নীর। চোখের ওপর এই বড় বাড়ীর বাবুদের আমিরি, আর তার জন্যে সর্বস্বান্ত হতে দেখেছি বলেই—নিজেকে এভাবে নীচু করে রেখেছি। এতে যে যাই বলুক, ধন ইজ্জৎ আমার বজায় থাকবে। একটা কথা আজ বলে রাখছি নীর, আমি যতক্ষণ আছি, সেরেস্তা নিয়ে কোন কথা আমাকে না বলাই ভালো; তার মানে—এখানে আমার বলবার কিছু নেই। হ্যাঁ, তবে—ও ছোকরাকে তুমি যখন কথা দিয়েছ, তোমার মুখ যাতে থাকে, সে চেষ্টা আমি এবারকার মত করব। ওদেরই সম্পর্কে যখন এসেছে, তার ওপর আত্মীয়, তখন ত বোঝাই যাচ্ছে জলে পড়েনি যে এখুনি কিছু করা চাই; দুদিন সবুর করতে বলবে।

নীরদাদেবী বুঝলেন, তাঁর কাজ হাসিল হয়ে গেছে—নিধান ছোকরা যে কোন একটা কাজে বাহাল হবেই।

এর পর স্বপ্নাই একদিন নিতাইকে এ বাড়ীতে তোয়াজ করে ডেকে এনে তার নিধুমামার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। বাঁকা চোখে নিতাই স্বপ্নার এই মামা, তার ওপর গানের মাষ্টারটিকে দেখল। মোক্ষদা দেবী ছুটে এসে নিতাইকে আর এক দফা বাড়ালেন এই বলে : জানো নিধু, এখানকার কর্তা-বাবুর ভাগনে হন, তাঁর সর্বস্বর মালিক হবেন একদিন। রাজপুত্তুর বললেই হয়, অথচ এতটুকু দেমাক নেই—আমাদের ওপর কত দয়া।

স্বপ্না সহাস্যে বলল : রাজপুত্তুর হলেই দয়া করেন—রূপ-কথার রাজপুত্তুঁরদের গল্প শোননি? এখন আমরা রাজ-পুত্তুরকে গান গেয়ে সম্বর্দ্ধনা করব। প্রথমে নিধুমামা গাইবেন, তারপর আমি।

মোক্ষদা বললেন : আমার বাবা দয়া করেন বলেই তোর বুক ফুলে গেছে স্বপন, যখন যা তা বলিস্। উনি তোর নাচ গান ভালবাসেন—দিদিরাণীই বলছিলেন, কিন্তু ঐখানেই তোর যত গড়িমসি। আজ যখন বাবাকে নিজে গিয়ে ডেকে এনেছিস্, ভাল দেখে গান একখানা শোনা, আর সেই সঙ্গে নাচটাও—বুঝলি?

স্বপ্না বলল : নাচগান অমনি করলেই হলো আর কি? মুড না এলে কি হয়!

রমেশ বলল : তোর মুড ত এসে গেছে—তবে আর ভাবনা কি?

স্বপ্না বলল : তাহলে রাজপুত্তুরকেও বলা উচিত—আমার এই নিধুমামার সঙ্গে কলকাতার কত বড় বড় আসরে গেছি, আর নেচে গেয়ে মেডেল বাগিয়েছি ! সেই জন্যই দাদা ওঁকেই আমার মুড বলে ধরে নিয়েছেন।

মোক্ষদা দেবী মুখখানা ঘুরিয়ে বললেন : জানিনে বাপু—কি বলিস, ও সব কথার মানেও বুঝি না। আচ্ছা, আমি চায়ের জল বসাইগে। বাবা আমার চা ছাড়া ত আর কিছু মুখে দেন না।

এর পর গান সুরু হয়। কলকাতায় বিভিন্ন সখের আখড়ায় নিধান ছেলেটি নাট্যাভিনয়ে নারী-চরিত্রের অভিনয় ও গানে পেশাদারী অভিনেত্রীদের সুর ও ভঙ্গি নকল করে নিজের স্বাভাবিক ভাবভঙ্গি এমন কি গলার স্বর পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল। নিধানের গান শেষ হতেই নিতাই মুখ-খানা বেঁকিয়ে বলে উঠল : আরে, একেবারে মেয়েলী গলা—শাড়ী পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে গাইলে লোকে জানবে না আপনি নিধু মামা, ভাববে—নিধু মামী।

কথার সঙ্গে সঙ্গে নিতাই হেসে উঠল। তার কথা ও হাসি কারও মনঃপুত না হলেও, কেউ কোন প্রতিবাদ তুলল না ; বরং জোর করে মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করল প্রত্যেকেই।

এবার স্বপ্নার পালা। নিধু হারমনিয়মটা টেনে নিয়ে সুর দিতেই মোক্ষদা দেবী আগ্রহের সুরে বললেন : তোর সেই ভোমরার নাচটা আমার বাবাকে দেখিয়ে দে—ওর গানখানিও চমৎকার।

স্বপ্না নিধুকে চোখের ইঙ্গিত করতেই সে বলল : ও! সেই ফুলের সঙ্গে ভোমরার ফাইট—

হারমনিয়মে সুর উঠতেই স্বপ্না যেমন পরিচিত গানখানি ধরে নাচের পা ফেলেছে, অমনি সেই সময় হাবুল ছুটে এসে খবর দিল : দাদাবাবু! দাদাবাবু! আপনার ঘোড়া এসেছে—দেখবেন আসুন।

খবরটা শুনেই তড়াক্ করে চেয়ার থেকে উঠে নিতাই বলল: এসেছে ঘোড়া—চল্।

মোক্ষদাদেবী আহত কণ্ঠে বললেন : বাবা, স্বপনের নাচটা—

উপেক্ষার ভঙ্গিতে নিতাই বলল : দেখব'খন—নাচতো আর পালাচ্ছে না?

স্বপ্নাও ঝাঁঝালকণ্ঠে বলল : ঘোড়াই বা কোন্ পালাচ্ছে! এটা তোমার কোন্ দেশী ভদ্রতা?

ঝাঁ করে ফিরে নিতাই কথাটার জবাব দিল : এ সব নাচ ফাচ আমার ভালো লাগে না।

স্বপ্নাও চুপ করে থাকবার মেয়ে নয়, মায়ের বাধাদানের ভঙ্গি উপেক্ষা করে বলল : সাধির দাবড়ানী খুব ভাল লাগে—নয়?

লাগেই ত! সাধির কথাতেই ঘোড়া এসেছে, তা জানিস? তোর রাজপুত্তুর এবার রিয়েল ঘোড়ার পিঠে চাবু করবে—দেখবি আয়।

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলেই নিতাই সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বারো

এরপর আসর আর জমল না। স্বপ্না মেয়েকে এগিয়ে দিয়ে দিদিরাণীর ছেলে—এই বিশাল বড় বাড়ী ও বিপুল সম্পত্তির ভাবী মালিক যে—তাকে আয়ত্তে এনে ফেলেছেন, মনে মনে মোক্ষদাদেবী এই গর্বেই মেতে ছিলেন। কিন্তু আজকের এই সামান্য ব্যাপারে তাঁর সে গর্ব, সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের আশাটুকুও যেন ফিকে হয়ে গেল। মেয়ের সেই সেরা নাচটি এ পর্য্যন্ত তাঁর বড় আশার 'বাবাকে' দেখাবার সুযোগ ঘটেনি; যদিও সে সুযোগ আজ ঘটল, কিন্তু কোথা থেকে ঘোড়ার খবর এনে অনামুখো হেবোটা সব ওলটপালট করে দিয়ে গেল। স্বপ্নাও ভেবেছিল যে, নবাগত ও রূপেগুণে প্রখ্যাত নিধুমামাটিকে খাড়া করে তার কলাবিদ্যার বাহাদুরী দেখিয়ে বড় বাড়ীর রাজপুত্তুরটির দেমাক একটু ভেঙ্গে দেবে, কিন্তু সেখানেও 'উল্টা বুঝিলি রাম' হয়ে গেল। সাধকরে কি স্বপ্না সাধির কথা তুলে খোঁটা দিয়েছিল! ভেবেছিল কথাটা বলে সে রাজপুত্তুরের থোঁতা মুখখানা ভোঁতা করে দেবে; কিন্তু নিতাইও সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা জবাব দিয়ে সবার সামনে তার নিজের মুখেই যেন খানিকটা কালি ছিটিয়ে দিয়ে চলে গেল! এই যে কাণ্ডটা এভাবে হঠাৎ ঘটল, এর জন্য স্বপ্না সাধনাকেই দায়ী মনে করে মনটাকেও তার বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলল। যখন তখন এই দেমাকে রাজপুত্তুরটির খোসামোদ করেও সে তার

মন পায় না, আর সাধনা কিনা হামেসাই চোখ রাঙিয়ে, দাবড়ানি দিয়ে ওকে ঢিট্ করে তারও ওপরে টেক্কা দিয়েছে। বেশ, এখন থেকে সেও সাধির মত শক্ত হয়ে চলবে, আর ঠিক সময় বুঝেই যেন ভগবান তার নিধুমামাকে এখানে আনিয়েছেন। ঠিক হয়েছে, সেও এবার ঠিক পথটা ধরেই এগিয়ে যাবে।

স্বপ্নাকে নিরুত্তর ও নিতান্ত ক্ষুব্ধ দেখে নিধান বলল : গো-অন—স্বপন। সুরটাকে হেনস্তা করে আমাদের আশাভঙ্গ কর'না। উনি না হয় আর এক দিন—

ঝংকার দিয়ে স্বপ্না বল্‌ল : উঁহু—তাল কেটে গেছে যখন, আজ আর নয়। এখানকার নাচ ছেড়ে বড় বাড়ীর ঐ রাজপুত্তুরটি ঘোড়ার নাচ দেখতে ছুটল যখন, আমরাও দেখব বৈকি, ঘোড়ার পীঠে ঐ নিতাইকান্ত কি রকম করে 'চাবু' করে। আর তুমি মা, তোমার দিদিরাণীকে বরং বলে পাঠাও কাউকে দিয়ে, কি—নিজেই গিয়ে বলে এস—খোকার জন্যে যেন দুধ গরম করে রাখেন!

মায়ের পানে চেয়ে কথাগুলি শেষ করেই স্বপ্না ছুটে বেরিয়ে গেল। নিধান ও রমেশ একবার পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করল এই সঙ্গে রমেশের দৃষ্টির অর্থটা বুঝে তার সঙ্গে স্বপ্নার অনুগমন করতেই উভয়ে বাধ্য হল।

ইতিমধ্যে স্বপ্নার কথাগুলোর ঝংকার আর একজনের কানে বেজেই তাঁকেও সচকিত করে। তিনি স্বয়ং নীরদাঠাকরুণ

এদিন দাদার কাছে স্বপ্নার নিধুমামার কর্ম সম্বন্ধে সম্ভাবনার কিছু আশা পেয়েই অনেকখানি বেলা থাকতে পরমানন্দের ক্ষেত্রস্বরূপ এই ভক্তাগারে তাঁর শুভাগমন হয়। উপরের সোপান থেকে অবতরণের সময় স্বপ্নার তীক্ষ্ণকণ্ঠের শ্লেষাত্মক কথাগুলি তাঁর শ্রুতিস্পর্শ করে। এদিকে শূন্য ঘরের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে একান্ত অসহায়ভাবে গৃহিণী মোক্ষদাদেবী তখন আশাভঙ্গ-জনিত ক্ষোভে কেটলীর ফুটন্ত জলের দিকে তাকিয়ে আকাশপাতাল ভাবছিলেন। জলের মত তাঁর বুকের ভিতরটাও টগবগ করে ফুটে চোখের পথে বাষ্প ছড়াবার উপক্রম করছে, এমনি সময় নীরদাদেবী দরজার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন: কি হয়েছে রে বৌ, আমার স্বপন কি বলছিল তোকে আমার নাম করে ?

মোক্ষদার বুকের ভিতরের উত্তপ্ত অবস্থা পলকের মধ্যে তুষারের মত বুঝি ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কিন্তু কথা বানিয়ে বলবার বিদ্যায় স্বামীর সুযোগ্যা পত্নী মোক্ষদা তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটিকে উভয়পক্ষের একান্ত অনুকূল করে একটা অস্বাভাবিক কৃত্রিম কণ্ঠে বলে উঠলেন: মেয়েকে নিয়ে আর পারি না দিদিরাণী, আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলে। আসুন, আপনি বসুন।

কথার সঙ্গে দিদিরাণীর বসবার জায়গাটি আঁচল দিয়ে ঝেড়ে মুছে দিতে ভুললেন না মোক্ষদা দেবী। নিজের স্থানটিতে বসতে বসতে দিদিরাণী বললেন: মেয়ের কথা বলছিলি—কি করেছে সে, শুনি ?

মোক্ষদা ইতিমধ্যে মনে মনে বক্তব্য কথাগুলি সাজিয়ে ফেলেছিলেন, কথার ভাবের সঙ্গে মনের ভাব মিলিয়ে বললেন : আপনিত জানেন, ওর ভারি সাধ নিতাইদা'কে তার সেরা নাচখানা দেখাবে—ওর সঙ্গে আবার গান না হলে নাচ নাকি জমে না। নাচ-গানের মাষ্টারকে পেয়ে আজ সেটা সুরু করেছে, এমনি সময় হেবো এসে বলল, তার নাকি ঘোড়া এসেছে। খবর শুনেই খোকাবাবু যাবার জন্যে উঠতেই স্বপন বাধা দিয়ে বলে, ঘোড়া ত পালাচ্ছে না—এখানকার কাজটা হোক, তারপর যাবেন। তাতে খোকাবাবু বলেন—তা'হলে সাধি রাগ করবে, সেই ত ঘোড়া আনিয়েছে। এই নিয়ে দিদি, দু'জনের কি কথা কাটাকাটির ধূম! আর পোড়ারমুখো মেয়ের মুখে ত কিছু আটকায় না—ছ্যার ছ্যার করে কিনা শুনিয়ে দিলে—ঐ সাধিই তোমাকে ঘোড়া নাচিয়ে মজা দেখবে, চেনো নি ত ও মেয়েকে, এরপর—খোঁড়া না করে দেয়! বলুন ত, কি আস্পর্দ্ধার কথা ঐ মুখরা মেয়ের—

সহানুভূতির সুরে নীরদাঠাকরুণ তাঁর বাধ্য ভক্তটিকে আশ্বস্ত করেন : গাল দিসনি বৌ, তোর মেয়ের চোখ আছে, ঐ সাধি হতচ্ছাড়িকে ওই চিনেছে। ঠিকই ত বলেছে—আসুক ঘোড়া, তা বলে এখানে ওকে হেলা করে তখুনি ছোটবার কি তাড়া ছিল? স্বপনের মনে ত কষ্ট হবেই।

মোক্ষদাও সময়োচিত রসান দিতে থাকেন : শুধু কষ্ট নয় দিদি, ঐ হাবুলের ওপর দরদ দেখিয়ে সাধির ঘোড়ার ফন্দনা

দেওয়া থেকেই আপনার সহিসের মনে যেন জ্বালা ধরেছে। খালি আমার কাছে এসে বলে—হাবুলই ছিল ভাল, কাঁধে করে খোকাবাবুকে নিয়ে বেড়াত—কিন্তু ঐ ঘোড়ার ফন্দনা ভাল লাগে না আমার—যদি পড়ে যান, হাত পা ভাঙ্গে ; সাধির মতলব ভাল নয় মা! তাইত, খোকাবাবু ওর কথা ঠেলে চলে যেতেই ওঁকে শুনিয়ে ঠাট্টা করে বলছিল—তোমার দিদিরাণীকে বলগে মা, খোকাবাবুর জন্যে একটা দোলা খাটিয়ে রাখতে, ঘরে বসে দোল খাবে—তাতেই ঘোড়া চড়ার সাধ মিটবে।

মনে মনে কি ভেবে নীরদা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন : এত কাণ্ড, অথচ কিছুই জানিনে বোন। খোকার ঘোড়া তাহলে এসেছে! চল না, মহলের দরজা থেকে আমরাও দেখি ঘোড়াটাকে।

নীরদাকে উঠতে উদ্যত দেখে মোক্ষদা বাধা দিয়ে বললেন : একটু বসুন দিদি, সেই থেকে চায়ের জল ফুটছে ; বাবা আমার হাতে তৈরী চা খেতে ভালবাসেন, না খেয়েই চলে গেলেন। আপনার পায়ের ধূলো যখন পড়েছে এখানে—এক ঢোক খেতেই হবে। সব তৈরী দিদি!

চায়ের নামে দিদিরাণী তাঁর স্থানটিতে আবার চেপে বসলেন। আসল কথাটাও মনে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মুখখানা প্রফুল্ল করে বলতে লাগলেন : তবে একটা সুখবর দিই, শোন বউ। তোর ভাইয়ের বরাত ভাল। শুনেছিস ত, দাদা আজ সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে সদরে গেছেন।

টাউন হলে জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটরা আসবেন—জেলার জমিদারদের নিয়ে কি সলা পরামর্শ করবেন। আমি ত নিধুর কথা আগেই বলেছিলুম। যাবার সময় আমাকে বলে গেলেন—তোমার ঘোষাল মশায়ের শালার জন্যে কাজ একটা ঠিক করেছি, সদর থেকে ফিরে এসে বলব।

মোক্ষদা হাতের কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি দিদিরাণীর ছু'পায়ে মাথা ঠেকিয়ে আবেগ ভরে বললেন: আপনি যেদিন ভরসা দিয়েছেন দিদিরাণী, জানি সেইদিনই নিধুর কাজ হয়ে গেছে। কি শুভক্ষণেই আপনার দয়া পেয়েছিলুম।

মোক্ষদার ভাবার্দ্র কথায় ও গভীর আন্তরিকতায় আত্মগর্বে দিদিরাণী নীরদার মুখখানাও তখন আরক্ত হয়ে উঠেছে।

সদরের টাউনহলের মিটিংএ যোগ দেবার জন্য কানাইবাবু জেলার কালেক্টর কর্তৃক আহূত হয়েছেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পরেই তিনি মথুরবাবু এবং সেরেস্তার একজন আমলা ও তুইজন চাপরাসী সঙ্গে নিয়ে গাড়ীতে উঠবেন, এমন সময় পূর্বের নির্দেশমত খরিদা ঘোড়াটিকে নিয়ে এ-ব্যাপারে নিযুক্ত কর্মচারীটি সেখানে এসে পড়ল। উভয়েই ক্রীত ঘোড়াটি নানা ভাবে পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলেন।

কানাইবাবু বললেন: আমার আশঙ্কা হচ্ছে, ঘোড়া দেখলেই নিতাই এর পীঠে সওয়ার হয়ে বাহাত্বরী দেখাতে না চায়! শুধু ঘোড়া এলেই ত হবে না, ঘোড়ায় চড়া ওকে শেখাতে হবে। তা ছাড়া একটা আলাদা সহিস—

মথুরবাবু বললেন : আপনার ত এক ঢোল, এক কাঁসি,—যে গাড়ী চালায়, সেই ঘোড়ার তদ্বির করে। তবে প্রথম প্রথম একে দিয়েই চালিয়ে নেওয়া যাবে, পরে আলাদা লোক একটা দেখেশুনে আনানো চাইই। সে ঘোড়ার তদ্বির করবে, আর নিতুকে ঘোড়ায় চড়া শেখাবে।

কানাইবাবু বললেন : সদরে ত আমরা যাচ্ছি ; সেখানেই খোঁজ করা যাবে—ঘোড়ার মাষ্টার যাতে খুঁজে-পেতে একটা আনা যায়।

দিব্যি সুশ্রী, সুদর্শন তেজীয়ান টাট্টু ঘোড়া। গায়ের রঙ মিশমিশে কালো, মুখের উপর সমগ্র কপোল এবং পায়ের দিকে গোড়ালির উপর বিঘত পরিমাণ স্থান ধবধবে সাদা—চারটি পায়েই এই শুভ্র চিহ্ন। মথুরবাবু বললেন : চারটে পা ও মাথার দিকে এই সাদা অংশটুকু খুব সুলক্ষণ—এরকম ঘোড়াকে 'পাঁচ কল্যাণ' বলা হয়!

তৎক্ষণাৎ সেই কর্মচারীর প্রতি নির্দেশ দেওয়া হল—নতুন গরু, ঘোড়া এলে যেভাবে মঙ্গলাচরণ করা হয়, সে রকম ব্যবস্থার পর দানা-জল খাইয়ে বাইরেই যেন ঘোড়াটিকে রাখা হয়। সদর থেকে এঁরা ফিরে এসে আর সব ব্যবস্থা করবেন।

কাছাকাছি একটা মেলা থেকে ঘোড়াটিকে সাজসজ্জা মায় রেকাব ও মুখোসপরা অবস্থায় খরিদ করা হয়। সাজসজ্জা প্রায় নতুনই ছিল। ঘোড়াটির মালিক—জনৈক মুসলমান বণিক, মক্কাযাত্রার সময় সাজসজ্জাসমেত একটু চড়া দরেই

তাঁর সখের বাহনটি বিক্রয় করেন। কর্মচারিটি এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ থাকায়, সুলক্ষণযুক্ত উত্তম একটি টাট্টু ঘোড়া খরিদ সম্পর্কে মথুরবাবু তাঁকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। ঘোড়াটিকে দেখে খোদ কানাইবাবু এবং মথুরবাবু উভয়েই খুসি হয়ে খোস্ মেজাজেই সদরে রওনা হলেন! বড়বাড়ীর পুরানো কোচোয়ানও ঘোড়াটির সুখ্যাতি করল।

এই ঘটনার সময় খোকাবাবু নিতাই তার অভ্যাসমত দিবানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকায় কিছুই জানতে পারে নি। এদিকে নিধান ছেলেটি স্বপ্নাদের মহলে নিরালা একখানা ঘরে আশ্রয় পেলেও নিতায়ের সঙ্গে এ পর্য্যন্ত তার আলাপ পরিচয় হয় নি। স্বপ্নাই সে ব্যবস্থা এবং তৎসঙ্গে নাচগানের আয়োজন করে নিতাইদা'র ঘুম ভাঙ্গিয়ে এ বাড়ীতে সাদর আহ্বান করে আনে! তারপরের কথা আগেই বলা হয়েছে।

স্বপ্নাদের বাসায় যখন আলাপ আলোচনা জমে ওঠে, সেই সময় বহির্মহলে দেউড়ীর সামনে নূতন ঘোড়াটিকে ঘিরেও একটা জনতার সৃষ্টি হতে থাকে। হাবুল কোন কাজে গ্রামের মধ্যে গিয়েছিল। ফিরে এসেই দেউড়ীতে ঘোড়াটাকে দেখতে পায়। সেই সঙ্গে সমবেতদের সংলাপ থেকে যেই বুঝতে পারল—দাদাবাবুর জন্যেই ঘোড়া এসে গেছে, তখনই সুখবর নিয়ে ছুটে যায়।

নিতাই দেউড়ীর বাইরে এসেই দেখল, ঘোড়াটিকে ঘিরে কৌতূহলী জনতার ভিড় জমে উঠেছে। নিতাইকে দেখেই

সসম্ভ্রমে তারা সামনে থেকে সরে গিয়ে পথ মুক্ত করে দিল। ঘোড়ার চেহারা দেখে নিতাই আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ে এবং সেই অবস্থায় ছুটে গিয়ে ঘোড়াটির লোমশ সুশ্রী গলাটি জড়িয়ে ধরে তার পিঠে ওঠবার জন্যে আকুলি ব্যাকুলি করতে থাকে। ঘোড়াটি কিন্তু শান্তশিষ্ট ভাবে তার হাতে আপনাকে সমর্পণ করতে রাজি হয় না। পা ছুঁড়ে, লেজের ঝাপটা দিয়ে, ঘন ঘন গ্রীবা চালনা করে সে একটা অনমনীয় ভাব প্রকাশ করতে থাকে; মাঝে মাঝে তার কর্কশ কণ্ঠের হ্রেষাধ্বনিও অনম্র আচরণের পোষকতা করে।

এই সময় পাঠশালারও ছুটি হয় এবং একসঙ্গে অনেকগুলি বালক-বালিকা এলোমেলো ভাবে বাইরে এসেই নবাগত জীবটিকে দেখে উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে—ঘোড়া, ঘোড়া! নতুন ঘোড়া! বা!—কি সুন্দর দেখতে!

কেউ বলে: ওরে, খোকাবাবুর ঘোড়া!

কারও কণ্ঠ থেকে অনুরোধ ওঠে: ওর পীঠে ওঠ খোকাবাবু! তোমাকে দেখছে, ঘাড় নেড়ে নেড়ে ডাকছে!

খিল খিল করে হেসে ওঠে দুটি মেয়ে। তারা মুখ মুচকে বলে উঠল: দুয়ো খোকাবাবু—দুয়ো!

খোকাবাবুর মুখখানাও রাঙা হয়ে যায়, মনে রোক চাপে, সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনায় বুকের ভিতরটা দপ দপ করতে থাকে।

পাশেই হাবুল ছিল, খোকাবাবুর আগ্রহ দেখে ভরসা দিয়ে বলল: ভয় কি খোকাবাবু! ওঠ তুমি, আমি ধরছি।

তুমি পিঠে বসে লাগাম ধরে থাকো, আমি ওর মুখোস ধরে যাবো—তা'হলে পড়বে না তুমি।

দুঃসাহসের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল খোকাবাবুর সমস্ত অন্তরটা; কোমরের দিকে কাপড়ের কসিটা দু হাতে এঁটে ঘোড়ার পিঠে ওঠবার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেল। হাবুলও সময় বুঝে একটা ছড়ি যোগাড় করে খোকাবাবুর হাতে দিল।

ছেলেরা চীৎকার করতে লাগল: ওরে দ্যাখ দ্যাখ, আমাদের খোকাবাবু ঘোড়ার পিঠে চাবু করছে।

হাবুল ছোকরা বোধ হয় এর আগে ঘোড়া নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিল এবং ঘোড়াকে বশে আনবার কায়দা-কানুনও কিছু কিছু তার জানা ছিল। যেহেতু, ঘোড়ার পিঠে ওঠবার সময় সে খোকাবাবুকে যেভাবে সাহায্য করল, নেহাৎ আনাড়ীর পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। খোকাবাবু অবশেষে গলদঘর্ম অবস্থায় ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। হাবুল লাগামটি নিয়ে তাড়াতাড়ি তার হাতে দিল। এক হাতে লাগাম, আর হাতে চাবুক নিয়ে খোকাবাবু সদর্পে পিছনের জনতার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল; তার মুখ থেকে এ সময় একটা প্রশ্নও উঠল: সাধি কোথায় রে—সাধি?

তার একান্ত ইচ্ছা, সাধি এই পরম দৃশ্যটা দেখে—খোকাবাবু আজ সত্যিকার ঘোড়ার পীঠে কেমন চাবু করছে!

কিন্তু সওয়ার পীঠে বসতেই তেজীয়ান টাট্টুটি তখন অস্থির হয়ে উঠেছে, তার চঞ্চল অঙ্গভঙ্গি থেকে প্রকাশ পাচ্ছে

যেন—এভাবে আবদ্ধ থাকতে সে প্রস্তুত নয়, সে এখন এগুতে চায়।

হাবুলও ঘোড়ার মুখোসটা সবলে চেপে তাকে রাস্তার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। এই সময় পর পর মিশ্রকণ্ঠের কতকগুলো কথা শোনা গেল ঃ

ওরে শাঁখ বাজা—বাজনা বাজা!

আমাদের খোকাবাবু ঘোড়ায় চাবু করে যাচ্ছে।

হঠাৎ চাপা গলায় কতিপয় মেয়ে বলে উঠল ঃ সাধনা দি! সাধনা দি!

এই সময় চার পাঁচটি ছেলে কোথা থেকে একটা টিনের ক্যানেস্তারা যোগাড় করে এনে তার গায়ে ইট কাঠ ডাণ্ডা দিয়ে পিটতে সুরু করে দিল। টিন পেটার কড়া আওয়াজের সঙ্গে শিশুদের করতালি ও কণ্ঠধ্বনি সংযুক্ত হয়ে একটা মিশ্র কর্কশ স্বর তুলতেই ঘোড়াটা গেল হঠাৎ বিগড়ে—ঠিক এই সময় খোকাবাবুও এক কাণ্ড করে বসল! হাতের চাবুকটি শূন্যে তুলে বার বার ঘোড়ার পীঠে হাঁকরাতে লাগল। এর ফল হল সাংঘাতিক; তেজীয়ান ঘোড়া গায়ের ঝটকায় হাবুলকে ফেলে দিয়ে সামনের রাস্তা ধরে তীরের বেগে ছুট দিল।

ছেলেগুলোও মহানন্দে ক্যানেস্তারা বাজিয়ে সমস্বরে চীৎকার তুলে ধাববান ঘোড়ার পিছু পিছু ছুটে চলল। দূর থেকে সাধনা এই দৃশ্যটি দেখে ঘটনাটি মোটামুটি বুঝতে

পেরে জোর গলায় হুমকি দিল ঃ থামো বলছি—এখনি ফেলে দাও টিন।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। পাঠশালার কোন ছেলে বা মেয়ে সাধনার মুখের কথা অমান্য করবার স্পর্দ্ধা রাখে না।

সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার মাঝখানে এসে সাধনা সামনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল—ঘোড়া একই ভাবে ছুটে চলেছে, আর খোকাবাবু দু'হাতে তার পীঠ আঁকড়ে ধরে কোন রকমে উপুড় হয়ে রয়েছে।

এ-অবস্থায় নিতাইয়ের আসন্ন বিপত্তি তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করল সাধনা। তার নির্দেশে ছেলেমেয়েরা শঙ্কিত অবস্থায় যে যার বাড়ীর দিকে চলল এবং সেরেস্তা থেকে চাকররা এসে হাবুলকে তুলে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেল। আর—সাধনা, আঁচলখানা কোমরে শক্ত করে জড়িয়ে এবং থলির সঙ্গে সেলাই করা ফিতার ধরণীটা কাঁধে ঝুলিয়ে একাই ছুটল সেই রাস্তা ধরে—আনাড়ি সওয়ারসহ ধাববান ঘোড়াটির উদ্দেশে।

দেউড়ীর প্রকাণ্ড দরজার উপর দাঁড়িয়ে স্বপ্না পূর্বোক্ত ঘটনাটির সেই অংশটুকুই দেখতে পেয়েছিল—ঘোড়ার পিঠের উপর নিতাই হাবুলের সাহায্যে সবে মাত্র উঠে বসেছে, ছেলেমেয়েরা সমস্বরে চীৎকার করছে, কতকগুলো ছেলে টিন বাজাচ্ছে, নিতাইও হাবুলের কাছে চাবুকটি পেয়ে সপাসপ্ করে ঘোড়ার পিঠে হাঁকরাচ্ছে। সেই অবস্থায় সাধনাও উত্তেজিত ভাবে চেঁচাতে চেঁচাতে দেউড়ীর দরজা পার হবার সময় স্বপ্নাকে এক রকম ঠেলে সরিয়ে পথ করে নিয়ে ঘোড়ার দিকে ছুটতে থাকে। প্রায় একই সময় ঘটনাগুলি এত দ্রুত ঘটে যায় যে, রীতিমত চাঞ্চল্যকর ব্যাপার হয়ে ওঠে।

সাধনার হাতের ঠেলায় দেউড়ীর উপর থেকে সরে এক পাশে দাঁড়িয়ে স্বপ্না যখন রাগে-অভিমানে ফুলছে, ঠিক সেই সময় দুটি লোক ধরাধরি করে হাবুলকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে আসছিল। ওদিকেও রমেশ ও নিধু বাড়ীর ভিতর থেকে দেউড়ীর মুখে এসে দাঁড়াল। রমেশই স্বপ্নাকে জিজ্ঞাসা করল : কি হয়েছে রে স্বপ্না ?

মুখখানার বিরক্তিকর ভঙ্গি করে স্বপ্না বলল : যা হবার তাই হয়েছে—রাজপুত্তুর পক্ষীরাজের পিঠে উঠতেই পাঠশালার পড়োরা টিন বাজিয়ে জন্তুটাকে ক্ষেপিয়ে দিলে—এ হচ্ছে সাধির শিখনাই। তারপর, যেই ঘোড়া হাবুলকে লাথি কষিয়ে ফেলে দিয়ে সওয়ার নিয়ে ছুটল, সাধিও তখনি টস্

দেখাতে ঘোড়ার পিছু নিয়েছেন! এ হলো—সেই গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা!

রমেশ সভয়ে বলল: এখন উপায়! যদি পড়ে যায় খোকাবাবু—কি হবে?

নিধু ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দিয়ে বলে উঠল: পড়বে কেন, বড় লোকের ভাগনে—নিশ্চয়ই ঘোড়ায় চড়তে জানে, আনাড়ি ত নয়।

স্বপ্না ঝাঁঝিয়ে বলল: ছাই জানে—এই ওর হাতে খড়ি! ঘোড়ার নামে যেমন নেচেছিল, এখন ঘোড়াও তেমনি নাচ দেখাবে। সাধি এ সব জেনেই—

কিন্তু পাঠশালার একটা মেয়ের দিকে সহসা চোখ পড়তেই স্বপ্না খপ করে থেমে গেল। পরক্ষণে চোখের ইশারায় রমেশ ও নিধুকে বাড়ীর ভিতরে যাবার জন্য ইশারা করেই হাওয়ার বেগে সেই দিকেই ছুটল।

রমেশ বুঝল, স্বপ্না কথাগুলি এখনি দিদিরাণীর কাণে তুলে সাধিকেই এর জন্যে দায়ী করবে, সেই জন্যই তাড়াতাড়ি পালাল। এখন তাদের অবস্থা ঠিক—শুঁড়ির সাক্ষী মাতালের মত। অর্থাৎ স্বপ্না সাধির বিরুদ্ধে যে কথা লাগাবে, তাকেও তার সমর্থন করতে হবে দিদিরাণীকে তাতাবার জন্য। অবস্থাটা বুঝে রমেশ নিধুর হাতখানা ধরে একটা টান দিয়ে বলল: এসো নিধু মামা!

ওদিকে সাধনারই প্রায় সমবয়সী এবং তার প্রতি গভীর-

ভাবে অনুরাগিণী হাসি নামে একটি মেয়ে আরও গুটিকয়েক মেয়েকে ডেকে বলল: মাগো মা, কলকাতার ঐ মেয়েটা কি মিথ্যুক রে!

কচি নাম্নী বালিকাটি প্রশ্ন করল: কি বলেছে হাসি দি?

হাসি বলল: ঐ যে অত কাণ্ড হলো, হেবো পড়ে গেল, খোকাবাবুকে নিয়ে ঘোড়াটা অমন করে ছুটে পালাল—সাধনাদির জন্যই নাকি এসব হয়েছে! তিনিই নাকি টিন বাজিয়ে—চেঁচামেচি করে ঘোড়াটাকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছেন!

অন্যান্য মেয়েরা কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল! কেউ গালে হাত দিয়ে নীরবে জানাতে চাইল—এ যে ডাহা মিথ্যা। কেউ বা শাপমণ্যি দিল—সাধনাদি'র নামে মিথ্যে বললে, ও মুখ খসে পড়বে—মুখে পোকা হবে। কেউ প্রতিবাদ করল:—সাধনাদিই ত টিন বাজাতে বারণ করলেন—এখন তাঁকেই দোষ দেওয়া! এ কিন্তু ধর্মে সইবে না।

এইভাবে মনের ক্ষোভে সাধনাদি'র পক্ষে এই সব কথা বলতে বলতে তারা যে যার বাড়ীর দিকে যেতে থাকে। বড় বাড়ীর খোকাবাবুকে নিয়ে তেজী ঘোড়াটার হাওয়া হয়ে যাওয়া, আর সেই হাওয়ার পিছনে সাধনাদি'র ওভাবে পিছনে পিছনে ধাওয়া করা—তারা কেউ পছন্দ করে নি, তুষ্টও হয়নি, বরং প্রত্যেকেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল।

সাধনা ত জানে, নিতাই কস্মিন কালেও ঘোড়ার সংস্পর্শে আসেনি। হাবুর কাঁধে চড়েই সে ঘোড়ায় চড়ার সাধ মিটাতে

চেয়েছিল—যেভাবে কেউ কেউ দুধের সাধ ঘোল খেয়ে মিটিয়ে থাকে। কিন্তু হাবুর কাঁধে চড়া বন্ধ হওয়ায় যেমন সে মুসড়ে পড়েছিল, এর পরই তার জন্যে ঘোড়া আনা হবে শুনে সে যে সাগ্রহে দিন গণনা করছিল, একথা সাধনার অবিদিত নয়। সেই ঘোড়া এসে পড়ায়, তার মত অস্থির প্রকৃতি ছেলের পক্ষে ঘোড়ার পীঠে চেপে বসবার জন্য ব্যস্ত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে যে ছেলে একেবারেই আনাড়ি, বরাবর স্থিরভাবে এক স্থানে বসে থাকাও যার পক্ষে কঠিন, এ হেন অনভ্যস্ত অবস্থায় একটা দুর্ঘটনা কল্পনা করেই সাধনা ব্যস্ত হয়ে তার পিছু পিছু ধাওয়া করে। এই উদ্দেশ্যে যে, কোন প্রকারে যদি সে একবার ঘোড়াটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে, তাহলে যেমন করেই হোক তাকে ঠাণ্ডা করে সবারই মুখ রক্ষা করতে পারবে। এই আশাতেই সাধনা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সদর রাস্তা ছেড়ে, এমনি একটা পরিচিত মেঠো পথ ধরে তার গতি বদল করল—জঙ্গল, সাঁকো ও মাঠের আল দিয়ে মাইল দুই ঘুরে যে পথটি ঐ বড় রাস্তায় মিশেছে। সদরে যেতে সময় সংক্ষেপ হয় জেনেই জনসাধারণ এই কাঁচা রাস্তাটি ধরেই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ঐ বড় রাস্তাটির মাঝামাঝি একটা জংসন বা সংযোগস্থানে উঠে পুনরায় ঐ বড় রাস্তা ধরেই সদরে যায় স্থানটি রীতিমত গুলজার—বাজার ও কতকগুলি দোকানপাটের দরুণ।

কিন্তু সোজা পথে দ্রুত পদচালনা করেও সাধনার পক্ষে

ঘোড়ার আগে এই জায়গায় এসে পড়া সম্ভব হয়নি। দ্রুতগতি-শীল ঘোড়ার পীঠটা আঁকড়ে থাকলেও ঘন ঘন ঝাঁকুনির জন্য নিতাই এতই অবসন্ন হয়ে পড়েছিল যে, আর বেশীক্ষণ এ ভাবে থাকবার সামর্থও তার শেষ হয়ে আসে। সে তখন সেই অবস্থায় চীৎকার করতে থাকে : কে আছ, ঘোড়াটাকে ধর—আমাকে বাঁচাও, এখনি আমাকে ফেলে দেবে।

ঘোড়ার উচ্ছৃঙ্খল গতি ও সওয়ারের দুর্গতি দেখে এখানকার জনতা সক্রিয় হয়ে ওঠে। বাজারের মুখে তারা দলবদ্ধভাবে পথরোধ করে দাঁড়ায় বাধা দিবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সামনে বাধা পেয়ে ঘোড়াটা আরো উত্তেজিত ভাবে শিরপাও হোতেই নিতাই তীব্র একটা ঝাঁকুনি খেয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে রাস্তার পাশে কর্দমাক্ত সঙ্কীর্ণ স্থানটার উপর পড়ল একটা আর্তস্বর তুলে। কয়েকজন মজুর শ্রেণীর লোক তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে বিক্ষিপ্ত সওয়ারকে তুলে পাঁজাকোলা করে এক আড়তদারের খাটিয়ার উপর শুইয়ে দিল। এই সময় রাস্তার একধারে কয়েকখানি খড়-বোঝাই গরুর গাড়ী দাঁড়িয়েছিল এবং গাড়োয়ানরা খরিদদারের সঙ্গে দর কষাকষি করছিল। এরাই সাহস করে কয়েকজন মিলে ঘোড়াটাকে ঘিরে ধরল; এর পর বুদ্ধি খাটিয়ে লাগামের সঙ্গে মোটা দড়ির গিঁট দিয়ে একটা গাছের সঙ্গে তাকে বেঁধে ফেলল।

প্রায় এই ঘটনার প্রাক্‌কালেই সাধনাও ছুটতে ছুটতে গাঁয়ের কাঁচা পথ থেকে পাকা রাস্তায় উঠে ঘোড়াটাকে বাঁধা

অবস্থায় দেখতে পেল। ভদ্রঘরের এক অজানা সুদর্শনা স্বাস্থ্যবতী কিশোরীকে এভাবে সবেগে বাজারের দিকে আসতে দেখেই বাজারের লোকেরা অনুমান করল—ঘোড়সওয়ার ছেলেটির সঙ্গে হয়ত এই মেয়েটির সম্বন্ধ আছে, কেন না ছেলেটিও ভদ্রঘরের।

সাধনা জনতার দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল: ঐ ঘোড়ার পিঠে যে ছেলেটি ছিল, সে কোথায়?

একজন গাড়োয়ান বলল: হোই যে আড়তদারের খেটিয়াতে সংজ্ঞে হারিয়ে পড়ে আছেন—

আর একজন বলল: ঘোড়ার পীঠ থেকে ছিটকে পড়ে জবর চোট খাইলেন কিনা; মোরা জানোয়ারটাকে বাগে আনন্নু, কিন্তু ছাবালটারে সামলানো গেল নি।

তৃতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল: উনি তোমার কে হয় গো দিদি ঠাকরোণ?

সাধনা তখন বাজারের চৌতারার দিকে ছুটেছে। যেতে যেতে উত্তর করল: ভাই।

ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ায় আঘাতের চেয়ে ভয়টাই নিতাইকে বেশী ক্লিষ্ট ও অভিভূত করে। ঘোড়াটা সামনের পা দুটো তুলে যেই খাড়া হয়ে ওঠে, তখনই নিতাই ভয়ে ভির্মি যাবার মত হয়। আর সেই অবস্থায় হাত দুটো অসাড় হতেই পথের ধারে ছিটকে পড়ে। ব্যাপারটা দেখেই সামনের আড়তের লোকেরা ছুটে এসে তাকে ধরাধরি করে আড়তদারের

খাটিয়ার উপর শুইয়ে দেয়। নিতাই সেই অবস্থায় আচ্ছন্নের মত চোখ দুটো বুজে পড়ে থাকে।

আড়তদার ও তার লোকজন সবাই ভাবছে, কি করবে,—কোনো ডাক্তারকে ডাকবে কিনা—এমন সময় ঝড়ের মত বেগে সেখানে সাধনা এসে পড়ল। লোকগুলি অবাক হয়ে বেশ-বাস ও হাল-চালে অদ্ভুত রকম এই মেয়েটির পানে তাকিয়ে রইল। এ ধরণের সপ্রতিভ মেয়ে তাদের চোখে বোধ হয় এর আগে আর কেউ পড়েনি। সাধনা কিন্তু খাটিয়ার কাছে এসে স্থির ভাবে সংজ্ঞাহীন নিতায়ের শায়িত দেহটি এক নজরে দেখেই পরক্ষণে সমবেত লোকগুলিকে লক্ষ্য করে বলল: এক লোটা পানি দিজিয়ে—জলদি।

বৃদ্ধ আড়তদারের ইঙ্গিতে তখনি একটা লোক খাটিয়ার তলা থেকে একটা লোটা নিয়ে কূয়ার দিকে ছুটে গেল। সাধনাও অসঙ্কোচে খাটের শক্ত বাজুটির উপর বসে কাঁধে ঝোলানো থলিটা কোলের ওপর রেখে নিতায়ের মাথায়, মুখে ও নাকে হাতখানা ধীরে ধীরে বুলোতে লাগল। নাকের নীচে হাত রেখে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি অনুভব করল। এরপর তার ডান হাতখানি আস্তে আস্তে তুলে নিজের বাম হাতের চেটো কঠিন করে তার উপর রেখে নাড়ী পরীক্ষা করে মনে মনে যেন আশ্বস্ত হল। বুঝল যে, পড়ার ফলে নিঝুম হয়ে থাকলেও জ্ঞান ঠিক আছে, নাড়ির গতি সে-সাক্ষ্য দিচ্ছে। আড়তদার ও তার লোকজন সবিস্ময়ে এই কিশোরী মেয়েটির এই সব আজগুবি

কাণ্ড নির্বাক দৃষ্টিতে দেখছিল। ইতিমধ্যে মেয়েটিকে বিজ্ঞ ডাক্তারের মত ভারিক্কী চালে হাতের উপর হাতখানা রেখে নাড়ীর গতি পরীক্ষা করতে দেখে তাদের বিস্ময় আরও গভীর হয়ে উঠল।

এই সময় আগের সেই লোকটি লোটা ভরে জল নিয়ে ফিরে এল। সাধনা হাত বাড়িয়ে লোটাটি নিয়ে প্রথমে নিজের হাত দু'খানি ভাল করে ধুয়ে ফেলল। এর পর থলি থেকে পাট করা বস্ত্রখণ্ড বার করে ভাল করে ভিজিয়ে নিতায়ের মুখে ও চোখে ধীরে ধীরে বুলিয়ে দিতে লাগল। মিনিট কয়েক এইভাবে পরিচর্যার পর নিতাই একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল— সেই সঙ্গে তার উভয় চক্ষুর মুদিত আবরণ দুটি খুলে যেতেই সাধনা দেখল, ভিতরটা জবাফুলের মত লাল হয়ে উঠেছে। শিউরে উঠে সাধনা ভাবল—তবে কি পড়ে যাবার সময় চোখে আঘাত লেগেছে! তৎক্ষণাৎ সিক্ত বস্ত্রখণ্ড দিয়ে চোখ দুটি মুছাতে গিয়ে দেখল, ঘোড়ার লেজের গাছ-দুই চুল চোখের পাতার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, আর চোখের কোলেও কালশিরা পড়েছে।

এতক্ষণে নিতাই তার ডান হাতখানি আস্তে আস্তে যেমন তুলেছে, অমনি সাধনার হাতের সংগে সংযোগ হয়ে গেল। ভগ্নস্বরে নিতাই শুধালো: কে?

সাধনা একটু আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞাসা করল: তুমি কি সত্যিই জানতে পারোনি আমি কে?

নিতাই আর্তকণ্ঠে উত্তর দিল : না। চোখ খুলতেই অন্ধকার দেখি। তারপর চোখে ভিজে নেকড়া বুলোতে ঝাপসা মত সব দেখছি এখন ; তবে দেখতে না পেলেও বুঝতে পেরেছি— তুমি সাধনা।

সহানুভূতির স্বরে সাধনা শুধালো : পড়বার সময় তোমার চোখে কি ঘোড়াটা লেজের ঝাপটা মেরেছিল ?

নিতাই তেমনি মৃদু স্বরে বলল : তা ত বলতে পারি না। আমি বরাবর ঘোড়াটাকে আঁকড়ে ধরেছিলুম, কিন্তু ভয়ে যেন আধমরা হয়ে যাই। শেষকালে যখন সামনের পা' দুটো উঁচু করে দাঁড়িয়ে ওঠে, আমি তখন পড়ে যাই—সেই সময় মনে হলো চোখ দুটো বুঝি গলে গেলো—কি জ্বালা, আর! বাঁ পা, কোমর বোধ হয় ভেঙ্গে গেছে—নয় কি ?

সান্ত্বনা দেবার মত ভঙ্গি ও স্বরে সাধনা বলল : না, না, ও সব কিছু নয়। চোখ দুটো গলে গেলে, কিম্বা কোমর পা ভাঙ্গলে তুমি কি কথা বলতে পারতে নিতাই দা! ভয় পেয়েই—

নিতাই বলল : তবে কিছু দেখতে পাচ্ছি না কেন ? কত বড় আফশোষের কথা বলত, তুমি যেন ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে এসে আমার কাছে বসেছ ; চোখে মুখে জল দিয়ে আমার জ্বালা কমিয়ে দিয়েছ, অথচ আমি তোমাকে চোখে দেখতে পাচ্ছি না! এতে কি মনে হয় ?

সাধনা হাতের বস্ত্রখণ্ড আবার জলে সিক্ত করে ধীরে ধীরে

নিতায়ের চোখের উপর বুলিয়ে দিতে দিতে বলল : মনে ও সব ভেবো না ; তোমার যখন দিব্যজ্ঞান রয়েছে, ভয়ের কিছু নেই। আচ্ছা, কোথায় কোথায় লেগেছে, ব্যথা বোধ হচ্ছে তোমাকে বলতে হবে। আমি আগাগোড়া টিপে টিপে দেখতে চাই। তার আগে তোমার চোখের ওপর একটা মলম লাগিয়ে দেব, এখনি জ্বালা কমে যাবে।

কথাগুলি বলতে বলতেই সাধনা তার থলি থেকে একটা শিশি বার করল, তা থেকে কয়েক ফোঁটা তরল পদার্থ দুই চোখের মধ্যে দিয়ে দু'হাতে চোখ দুটি টিপে মিনিট খানেক বন্ধ করে রাখল। সেই অবস্থায় নিতাই বলল : আ! আগুনে যেন জল পড়ল।

সাধনা শিশিটি যথাস্থানে রাখতে রাখতে বলল : চোখ দুটো অমনি বুজিয়ে থাক। আমি এখন ওর ওপরে একটা মলম লাগিয়ে দেব।

নিতাই জিজ্ঞাসা করল : তোমার সেই কৌটোর মলম, সেদিন হেবোর কাটা জায়গায় যেটা লাগিয়েছিলে ?

সাধনা বলল : না ; সেটা ছিল হাত-পা বা দেহের কোথাও কাটলে, তার ওষুধ, এটা হচ্ছে চোখের ব্যথার।

এর পর আর একটা শিশি থেকে মধুর মত একটা গাঢ় পদার্থ বা'র করে উভয় চোখের আবরণের উপর প্রলেপ দেবার মত করে লাগিয়ে দিল। নিতাই যেন অনেকটা তৃপ্তি পেল।

সাধনা এই সময় থলি থেকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার উপযোগী পরিষ্কার কাপড়ের ফালি বা'র করে পটির মত ভাঁজ করে ফেলল। সেই পটি নিতায়ের মাথার সঙ্গে বেড় দিয়ে চোখ দুটি বেঁধে দিল। নিতাই জিজ্ঞাসা করল: চোখ বাঁধলে যে?

সাধনা বলল: ডাক্তারকে না দেখানো পর্য্যন্ত এমনি বাঁধা থাকবে। ডাক্তারই খুলে দিয়ে চিকিৎসা করবেন।

নিতাই ত্রস্তভাবে শুধালো: সত্যি বলছ—চোখ দুটো গলে যায়নি?

মৃদু অনুযোগের সুরে সাধনাও বলে উঠল: আবার ঐ কথা? চোখের তারা গলে গেলে জানতে পারতে না? এমন করে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারতে? চুপ করে শুয়ে থাক, আমি এবার তোমার দেহখানা দেখব—কোথায় কি রকম চোট লেগেছে।

খপ করে উঠে পড়ল সাধনা; সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা গিয়ে ঝুঁকে নিতায়ের পায়ের দিকে তাকাতেই শিউরে উঠল সে। দেখল, ডান পায়ের হাঁটুর কাছটা এরই মধ্যে বড় একটা বলের মত ফুলে উঠেছে। প্রথমে বাঁ পায়ের ওপর হাত বুলাতে বুলাতে স্থানে স্থানে অল্প অল্প চাপ দিয়ে টিপে টিপে দেখতে লাগল, আর কোথাও আঘাত লেগেছে কিনা? পরীক্ষা করে বুঝল যে, ও পায়ে কোথাও তেমন কিছু হয় নি। কিন্তু ডান পায়ে হাত পড়তেই নিতাই আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে উঠল। সাধনাও সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে বলল: খোকাটি ত নও, চেঁচাচ্ছ

কেন ? নিজের বাড়ীতে কি আছ ? আমাকে দেখতে দাও। কি রকম পায়ের অবস্থা, সেটা জানতে হবে ত ! একটু সহ্য কর—চেঁচিও না।

সাধনা লক্ষ্য করল, ডান পায়ের হাঁটুর উপর ফুলো জায়গাটি ক্রমশঃই বড় হয়ে উঠছে। ওখানকার হাড়ে বিষম দরদ দেখে সাধনা বুঝল যে, হাড় সরে যেতে কিম্বা মচকাতেও পারে। এমন কিছু না হলে, সেখানে হাত পড়লেই এত যন্ত্রণা তাহলে হবে কেন ? কিন্তু নিতায়ের চীৎকার ও ছটফটানি অগ্রাহ্য করেই সাধনা সেখানে লোসনের মত একটা তরল পদার্থ মাখিয়ে তার ওপর তূলা বিছিয়ে পরিষ্কার নেকড়া দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিল। তার থলির মধ্যে এ সব জিনিস গুছানো অবস্থায় থাকে—হঠাৎ কোন কিছু দুর্ঘটনা হলে তখন এই সঞ্চয় তার সার্থক হয়। কোমরে ও পিঠে দু' জায়গায় ব্যথা আছে বুঝা গেল, কিন্তু কোথাও ফুলে নাই। এর পর তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে টিনের একটি ডিপা থেকে ছোট একটি শিশি বা'র করে তা থেকে কয়েক ফোঁটা ওষুধও জলে মিশিয়ে নিতাইকে খাইয়ে দিল। ছোট একটি কাচের গ্লাসও তার থলির মধ্যে থাকে।

নিতাই জিজ্ঞাসা করল : ওটা কি খাওয়ালে ?

সাধনা বলল : ভয় নেই, আর কিছু নয়—ব্যথা সারবার ওষুধ।

স্থানটিতে তখন বহু জনসমাগম হয়েছে, প্রায় সকলেই

কৃষক ও মজুরশ্রেণীর। তারা অবাক বিস্ময়ে এই অদ্ভুত কিশোরীর চিকিৎসা-প্রণালী দেখছিল। সাধনা তাদের দিকে চেয়ে বলল: গোড়াতেই আপনারা এঁকে তুলে এই খাটিয়ায় শুইয়ে দিয়ে যথেষ্ট উপকার করেছেন। নৈলে রাস্তার ওপরেই এতক্ষণ ইনি পড়ে থাকতেন। এখন আমি এঁকে সদরপুরে সরকারী হাসপাতালে নিয়ে যাব।

কথাটা শুনে লোকগুলি উন্মুখ হয়ে উঠল কিছু বলবার জন্য, কিন্তু তার আগেই নিতাই চীৎকার তুলল: না, না, হাসপাতালে আমি যাবনা—কিছুতেই না, আমাকে বাড়ীতে নিয়ে চলো, লক্ষ্মীটি!

শাসনের ভঙ্গিতে সাধনা বেশ শক্ত হয়ে বলল: আবার চেঁচাচ্ছ তুমি! বললুম না চুপ করে থাকতে। বাড়ীতেই বা যাবে কি করে?

নিতাই জিজ্ঞাসা করল: এই ত এখনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইছিলে—কি করে নিয়ে যেতে?

সাধনা উত্তর দিল: তোমাকে সারাবার জন্যে যেমন করেই হোক নিয়ে যেতে হবে।

ক্লিষ্টকণ্ঠে নিতাই বলল: তাহলে তেমনি করে বাড়ীতেই নিয়ে চল না?

শক্ত হয়ে শিক্ষয়িত্রীর মত মুখে গাম্ভীর্য এনে সাধনা বলল: না। বাড়ীতে গেলে তোমার চিকিৎসা হবে না—যে কাণ্ড করে বসেছ, হাসপাতালের ডাক্তাররা যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা

করে দেখবেন—হাড়ে কিছু হয়েছে কিম্বা সরে গেছে কিনা। সেইজন্যে হাসপাতালে তোমাকে নিয়ে যেতেই হবে। তা ছাড়া, এখান থেকে বাড়ী যত দূরে, হাসপাতাল তার চেয়ে কাছে।

নিতাই এবার করুণকণ্ঠে বলল ; হাসপাতালকে আমার ভারি ভয়। বজবজে থাকতে দেখেছি, কাঠ দিয়ে পা বেঁধে দেয়। তারপর ক্লোরোফরম দিয়ে অজ্ঞান করে—না, না, আমি ওখানে যাব না।

সাধনা মৃদু ধমক দিয়ে বলল : আবার চেঁচাচ্ছ ! জেঠামণি সদরে গেছেন আজ, আমার বাবাও সঙ্গে আছেন, আরও লোকজন আছে। আমি কি সাধ করে সদরে তোমাকে নিয়ে যেতে চাইছি।

এবার যেন কিছুটা আশ্বস্ত হল নিতাই, বলল : কিন্তু কি করে যাব ?

সাধনা বলল : তাই ত ভাবছি।

বৃদ্ধ আড়তদার এবং অন্যান্য লোকগুলিও সাধনাকে সমর্থন করে বলল যে, এঁকে সরকারী দাওয়াইখানাতেই নিয়ে যাওয়া ভাল। এখান থেকে বড় জোর একক্রোশ হবে। কিন্তু যাবার জন্য কোন গাড়ী বা পাল্কীর কথা জিজ্ঞাসা করতে তারা জানাল যে, এখানে ও সব কিছু পাওয়া যাবে না। সকালবেলা হয়ত গরুর গাড়ী মিলত, এখন যে সব দেখা যাচ্ছে—মাল বোঝাই অবস্থায় সদরে যাবে।

নিতাই আবার জিজ্ঞাসা করল : তাহলে কি করে আমি যাব ?

সাধনা গম্ভীরভাবে বলল : যেমন করে এখানে এসেছিলে।

শিউরে উঠে নিতাই বলল :—ঘোড়ায় চড়ে ? যার জন্যে আমার এই দশা, তুমি কিনা আবার তারই পিঠে চড়তে বলছ ?

সাধনা বলল : কিন্তু কে তোমাকে ঘোড়ার পিঠে চড়তে বলেছিল ? ঘোড়ায় চড়নি যখন, চড়তে শেখনি, কোন ভরসায় চড়ে বসেছিলে তার পিঠে ? এখনি বা চড়বার নামে ভয় পাচ্ছ কেন ?

নিতাই অভিমানের ভঙ্গি মুখে ফুটিয়ে বলল : ওরা যে গোলমাল করে সব গুলিয়ে দিলে। কেনেস্তারা পিটে, হল্লা তুলে ঘোড়াটাকে ক্ষেপিয়ে দিলে, তারপর হেবো ওর লাগাম ধরে নিয়ে যাচ্ছিল—আমারও কি খেয়াল হল, চাবুক হাঁকরালাম ওর পিঠে। অমনি সেটা ক্ষেপে উঠে হাবুলকে ফেলে দিয়ে আমাকে নিয়ে ছুটল—উঃ! সে কথা মনে হলে বুক কেঁপে ওঠে।

সাধনা বলল : কিন্তু যদি চড়তে জানতে, ঘোড়া বিগড়োলে তাকে ঠাণ্ডা করতে পারতে—এমন করে পড়ে যেতে না।

নিতাই একটু রুক্ষ স্বরে বলল : সেই গুরুমশাইগিরি স্বরু করলে! ঘোড়ায় চড়া নিয়ে এমনি করে বলছ যেন ও বিদ্যে তোমার জানা আছে, ঘোড়ায় চড়তেও তুমি ওস্তাদ—পড়াশোনার মত।

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে সাধনা কাছের তুজন প্রৌঢ় ব্যক্তিকে বলল : দেখুন, আর ত দেরী করা চলে না, এর পর দাওয়াইখানা বন্ধ হয়ে যাবে। আপনারা দয়া করে আমাকে একটু সাহায্য করুন। আমি ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলেই, আপনারা তুজনে এঁকে এমন করে সাবধানে তুলবেন—ডান পায়ের এই ফুলোটায় কোনরকম চোট না লাগে! তারপর আমি যেখানে বলব, সেইখানেই বসিয়ে দেবেন, তখন আস্তে আস্তে আমি ওঁকে নিয়ে যাবো।

নিতায়ের মুখ দিয়ে আর কথা নির্গত হল না—স্তব্ধভাবে কাপড়ে বাঁধা তার মুখখানা সাধনার মুখের উদ্দেশে আন্দাজে ফিরিয়ে ভাবতে লাগল—মেয়েটা বলে কি? এই অবস্থায় আমাকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে সদরে নিয়ে যেতে চায়! তবে কি সাধি ঘোড়ায় চড়া শিখেছে—ঘোড়ায় চড়তে পারে?

বৃদ্ধ আড়তদার সবিস্ময়ে এই প্রশ্নই করল—আপনার কথামত মা-জী, এঁকে যেন ঘোড়ার পিঠে বসানো হলো, কিন্তু তারপর—এঁকে সামলে নিয়ে যেতে পারবেন?

সাধনা বলল : আপনারা এঁকে বসিয়ে দিতে পারলে আমি ঠিক নিয়ে যেতে পারব। আর, এ ছাড়া যখন কোন উপায়ই নেই!

নিতাই এখন শুষ্ককণ্ঠে শুধালো : বুঝেছি, তুমি আমার কাছে চেপে রেখেছিলে—ঘোড়ায় চড়তে তুমি নিশ্চয়ই জানো।

সাধনার লক্ষ্য তখন ঘোড়ার দিকে পড়েছে। তাই ত, ও বেচারীর পেটেও কিছুই পড়েনি। কিন্তু ওকে কিছু খাইয়ে তোয়াজ করে ওর সঙ্গে ভাব জমিয়ে তবে ত ওকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করা সম্ভব হবে। সাধনা তখনই ঝুলি থেকে একটি টাকা নিয়ে এক ব্যক্তির হাতে দিয়ে অনুরোধ করল : খাবারের দোকান থেকে এক টাকার জিলিপি এনে দিতে হবে—ঘোড়াটাকে খাওয়াব, আর—এক বালতি জল।

সে লোকটি সানন্দে ময়রার দোকানের দিকে ছুটে গেল। জিলিপি ও জল এলে, সাধনা ঘোড়াটির কাছে দাঁড়িয়ে নিজের হাতে তাকে খাওয়াতে লাগল। খাবার সময় তার গায়ে ও গলায় হাত বুলিয়ে দিয়ে তাকে আপনার করে নিল। খাদ্যগুলি শেষ হলে জলের বালতি তার মুখে ধরতেই প্রায় অর্দ্ধেক জল সে নিঃশেষ করে ফেলল।

এর পর সাধনা নিজেই ঘোড়াটিকে মুক্ত করে তার মুখের কাছে নিজের মুখখানা এনে এমন একটি মিষ্ট সুরে শীষ দিতে লাগল যে, ঘোড়াটা লেজ তুলিয়ে কাণ তুটোকে নাড়া দিয়ে যেন অব্যক্তস্বরে তার আনুগত্য স্বীকার করে নিল। একই-ভাবে সুমিষ্ট শীষ দিতে দিতে সাধনা তার কোমল করপল্লবে ঘোড়াটির ঘাড়ের কেশরগুলির মধ্যে ধীরে ধীরে আঙুলগুলি চালনা করে যেন অবোধ জীববটির বুদ্ধিবৃত্তি জাগ্রত করে জানিয়ে দিল—চলার পথে তাদের মধ্যে কোথাও গরমিল নেই।

সকলের বিস্মিত ও সতর্ক দৃষ্টির উপর পরিচিত এক সহজ

ভঙ্গিতে ঘোড়াটির পীঠে বাঁধা চামড়ার জীনটির কিনারা ঘেঁসে বসে পড়ল সাধনা। সেই সঙ্গে পূর্বের নির্দেশ মত কাজটি হাসিল করবার জন্য সেই দুটি লোককে ইশারা করল। তারাও সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত সন্তর্পণে নিতাইকে হাতে হাতে শায়িত অবস্থায় তুলে সাধনার দিকে নিয়ে চলল। ঘোড়ার জীনের বারো আনা স্থান খালি রেখেছিল সাধনা। সেইস্থানে এমন-ভাবে নিতাইকে বসাতে হবে যে, আহত দক্ষিণ চরণটির উপর কোন প্রকার ধকল না পড়ে। পিছনে সঙ্কীর্ণ স্থানটিতে শক্ত হয়ে বসে সাধনা লাগামটি এমন কায়দায় টেনে রাখল যে, নিতাইকে সচ্ছন্দভাবে বসানো সম্ভব না হওয়া পর্য্যন্ত ঘোড়াটিকে বিচলিত হতে দেখা গেল না। কাঁধের থলিটি কোলের উপর রাখায়, নিতাই তার উপর অবসন্ন দেহটির ভার রাখবার সুযোগ পেল। আহত ফোলা পা'টিও এমন ভাবে ঘোড়ার কাঁধের উপর রাখবার ব্যবস্থা লোকগুলি করে দেয় যে, নিতাই বিশেষ কিছু কষ্টবোধ করেনি। দুই পাশের রেকাব দুটিও সাধনা তার ব্যবহারযোগ্য করে নেয় এবং ঘোড়াটিকে চালনার পক্ষে সেই রেকাব দুটি তার বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে।

যাবার পূর্বে সাধনা সেই বৃদ্ধ ভদ্র আড়তদার ও সমবেত অন্যান্য লোকগুলিকে অভিবাদন জানিয়ে বলল: আপনাদের এ সাহায্যের কথা আমরা ভুলব না। আপনারা যাঁকে দারুণ বিপত্তির সময় পথ থেকে তুলে সেবা যত্ন করেছেন, তিনি মধুমতী এষ্টেটের মালিক কানাইবাবুর ভাগনে, আর আমি

তাঁর দেওয়ান—যাঁকে আপনারা কলির যুধিষ্ঠির বলেন, সেই মথুরবাবুর মেয়ে। ওঁরাই আপনাদের কাছে এসে এর জন্যে ওঁদের যা উচিত তা করবেন। আচ্ছা চলি।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সাধনা লাগামটি এমনভাবে একটু জোরে টেনে রেকাব দুটিও দুলিয়ে দিল যে, শিক্ষিত ঘোড়াটি পটিয়সী আরোহিণীর মনোভাব বুঝে দ্রুত অথচ নম্র চালে বাজারের বিস্তীর্ণ হাতাটি পার হয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ল এবং পরক্ষণে এই স্থানটিকে পিছনে ফেলে অনেক দূরে চলে গেল।

এমন সময় সাধনা তাদের পরিচয়টা প্রকাশ করল যে বাজারের বিস্মিত ও চমৎকৃত লোকগুলির তখন আরও নিবিড়ভাবে তাদের পরমারাধ্য ভূস্বামী ও তাঁর ষ্টেটের মহানুভব দেওয়ানজী বা অধ্যক্ষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের কোনও ফুরসদ্ মিলল না। তারা যখন সমস্বরে উল্লাসধ্বনি তুলছে, ঘোড়া তখন বিভিন্ন অবস্থায় দুটি সওয়ারকে নিয়ে সদরের পথে ছুটে চলেছে।

চৌদ্দ

ঘোড়ার পিঠে আড়ষ্টভাবে থেকে ডান পায়ের হাঁটুটার যন্ত্রণার মধ্যেই নিতাই বিচিত্র রকমের এমন একটা আনন্দ উপভোগ করছিল, যেটা তার পক্ষে একেবারেই দুর্লভ। সারাদিনের মধ্যে বিকেলের দিকে ঘণ্টাখানেক সময় মামার সামনে সে সাধনার সঙ্গ পায়। কিন্তু তখন কি মন খুলে তার সঙ্গে কথা বলবার ফুরসদ্ মেলে? সাধনা এমন সব বই পড়ে, যার সব কথা সে বুঝতে পারে না, অথচ সে কথা তাকে চেপে রাখতে হয়, জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করে তার। কিন্তু মেয়েটা যেন নিজের মনে তার মনের ভাবটি জেনেই পরক্ষণে মানেটা বুঝিয়ে দেয়। এতে নিতাই বুঝতে পারে বিদ্যার ব্যাপারে ঐ সাধি মেয়েটা তার চেয়ে কত বড়! তবুও তার সঙ্গে কথা বলবার কি আগ্রহ তার। কিন্তু সে সুযোগ আর ঘটে ওঠে না। ঘড়িতে পাঁচটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই সাধনা তার দপ্তরটি গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়ে। নিতাইকেও তাড়াতাড়ি উঠতে হয়, তাকে ধরবার জন্যে। কিন্তু বাইরে দরজার পাশে স্বপ্না সেজে গুজে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; নিতাই ঘর থেকে বেরুলেই এমনি কায়দা করে তাকে কোন না কোন নতুন কিছু বলবার বা দেখাবার কথা পেড়ে তাদের মহল্লায় ধরে নিয়ে যায় যে, সাধনার সঙ্গে আর মেলামেশা হয় না। নিত্যই এমনি একটা না একটা খবর নিয়ে আসে স্বপ্না, আর নিতায়ের মনের আফশোষ মনেই থেকে যায়। আজ এমন একটা

বিপত্তির মধ্যে তার অনেকদিনের আশাটি এভাবে পূর্ণ হয়েছে, তাই দেহের সমস্ত যন্ত্রণা তুচ্ছ করে সে যেন মনের আনন্দটুকুর কাছেই ধরা দিয়েছে। তার সব লজ্জা-সঙ্কোচও আজ সরিয়ে ফেলেছে মন থেকে, তাই এই বদ্ধচক্ষু, সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় দৈহিক যন্ত্রণার মধ্যেও সে একে একে তার অন্তরের চাপা কথাগুলি অকপটেই সাধনাকে শোনাতে থাকে।

বাজারের লোকগুলির কাছে নিজেদের পরিচয় দিয়ে সাধনা ঘোড়াটাকে দূরে নিয়ে যেতেই অনুমানে অবস্থাটা বুঝতে পেরে নিতাই বলে উঠল: খুব চালাক মেয়ে তুমি! আমাদের পরিচয় দিয়েই একেবারে হাওয়া হয়ে ছুটেছ। ওরা যাতে নাগাল না পায়।

সাধনা বলল: আগে পরিচয় পেলে ওরা কি আমাদের ছেড়ে দিত? কত রকমে তোয়াজ করতে চাইত। জমিদার ভাল হলে প্রজারা ভাবে তারা ঠাকুর দেবতা। যাক্, তোমার কষ্ট হচ্ছে না ত?

নিতাই আস্তে আস্তে কথাটার জবাব দিল: কষ্টও হচ্ছে, আর ভয়ের কথা কি বলব! কিছু ত দেখতে পাচ্ছি না, চোখ দুটো বেঁধে দিয়েছ তাই রক্ষে। কিন্তু এতেও কি আনন্দ যে হচ্ছে!

সাধনা: ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাচ্ছ বলেই বুঝি?

নিতাই: দূর! ওর জন্যে আনন্দ ত হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। এখন যদি বাজারের আড়তদারের সেই খাটিয়াখানার

উপর শুয়ে থেকে এভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারতাম !

সাধনা : কি হত তাহলে ?

নিতাই : আরো বেশী আহ্লাদ হত—মনের কতদিনের সাধ মিটত, আর—পড়ি পড়ি ভয়টাও থাকত না। তবুও কি আনন্দ যে পাচ্ছি !

নিতায়ের চোখ ছুটি কাপড়ের পটি দিয়ে বাঁধা, সুতরাং চোখের দৃষ্টি থেকে বুঝবার কোন উপায় নেই, উদ্দেশে মুখখানার দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে সাধনা জিজ্ঞাসা করল : কি জন্যে এত আনন্দ শুনি ?

উচ্ছ্বাসের সুরে নিতাই বলল : তাহলে বলি শোন, লোক যাই বলুক, আমার মায়ের মনে যাই থাক, আমি কিন্তু নিজের মনেই বুঝেছিলুম—তুমি কি গুণের মেয়ে। তোমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলবার জন্যে কত চেষ্টা করতুম, মামাবাবুর ঘরে ঐ যে একটি ঘণ্টা আমরা এক সঙ্গে থাকতুম শুধু পড়াশোনা নিয়ে—তাতেও কি কম আনন্দ পেতুম ? তুমি পড়তে, আমি সব কথার মানে বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকতুম। কিন্তু তুমি—বুঝতে পারিনি, আর লজ্জায় তোমাকে জিজ্ঞেসও করিনি, সেটা মনে মনে জেনেই নিজেই মানেটা বুঝিয়ে দিতে। আমার তখন কি ইচ্ছা হত জানো ?

সাধনা গম্ভীর ভাবেই বলল : কি ?

নিতাই বলতে লাগল : রোজই ইচ্ছা করত, তোমার সঙ্গে

মিশে গল্প করব, তোমাদের বাড়ীতে কোনদিনত’ যাইনি আমি, নিজেই তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের বাড়ীতে যাব, সেখানে গিয়ে এক সঙ্গে খেলা করব। তারপর, তুমি যে সাধুর কাছে পড়াশোনা কর, তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্যে তোমাকে বলব।

সাধনা জিজ্ঞাসা করল: কই, কোনদিন ত তুমি ও সব কথা আমাকে বলনি?

নিতাই তৎক্ষণাৎ জবাব দিল: কি করে বলব? মা যে ঐ ফন্দীবাজ ঘোষাল-কন্যে স্বপ্নাকে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখতেন, মামাবাবুর ঘর থেকে বেরুলেই একটা না একটা ফন্দী খাটিয়ে টেনে নিয়ে যেতো! আর আমিও এমনি বোকা ছেলে, সব ভুলে যেতুম। তাইত বলছি, আর কখনো কি তোমার সঙ্গে এত কথা বলতে পেরেছি?

একটু গম্ভীর ভাবেই সাধনা বলল: আমার ধারণা কিন্তু তোমার সম্বন্ধে অন্যরকম ছিল! অল্পবয়সে পড়াশোনায় আমার এগিয়ে যাওয়া তোমার ভালো লাগেনি, তোমার মামাবাবু পাঠশালার ছুটির পর তাঁর কাছে বসিয়ে আমাদের পড়াশোনার যে ব্যবস্থা করেছেন, সেও তুমি ভালো মনে নাও নি। তোমার ধারণা, আমি তোমাকে সবার সামনে ছোট করবার জন্যেই বিদ্যার বড়াই করি। তোমার এ ধারণা যে সত্য, সেটা রটাবার লোকের অভাবও ছিল না। কিন্তু এইটিই সব চেয়ে দুঃখের কথা—পড়াশোনায় ভালো হও, বা এগিয়ে

যাও, এ সম্বন্ধে কেউ তোমাকে বলেন নি, আর নিজেও এ ধারণাটাকে প্রশ্রয় দাও নি।

নিতাই নিবিষ্ট মনে কথাগুলি শুনল, শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর, জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল: তুমি যে কথাগুলি বললে, সব না হলেও কিছু কিছু সত্যি। দেখ, আমি ত আর তোমার মতন খুব ছেলে বেলা থেকে ভাল শিক্ষা পাইনি। আমার বাবা ছিলেন বড় লোকের ছেলে, কিন্তু আমি যখন জন্মাই, বাবা তখন গরীব হয়ে গেছেন—বজবজের মিলে চাকরী করেন; বস্তীর ভিতর খোলার ঘরে আমরা থাকতুম। সেখানে কি শিখব বলত? তারপর বরাত যেই ফিরে গেল, মামা এখানে নিয়ে এলেন, মায়ের মুখখানা কিন্তু ভার হয়ে যায়, এখানে তোমার প্রেতিপেত্তি দেখে—

সাধনা তখনি অশুদ্ধ কথাটি ধরে দিল: প্রেতিপেত্তি নয় নিতাইদা—কথাটা প্রতিপত্তি হবে। তা তুমি আর কি বলবে, আমি জানি—পিসিমা এ-বাড়ীতে এসে তাঁর দাদার সংসারটির ওপর ছোট একটা মেয়ের প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে একটুও খুসি হন নি। এ রকম হয় নিতাইদা, আর—এর জন্যে তাঁকেও বলা যায় না যে—কাজটা ভাল করেননি। ওঁরা ত আর লেখা পড়া শিখে সারা জগতকে আপনার ঘর সংসার ভেবে প্রসন্ন হবার শিক্ষা পাননি। সত্যিইত, পরের মেয়ে, রক্তের কোন সম্বন্ধ নেই ওঁর দাদার সঙ্গে, অথচ তারই কথায় সব চলছে, সবাই তাকে মানছে! এমন অসৈরণ তোমার মা কেনই বা

সহ্য করবেন—তিনি যখন কর্তার নিজের বোন। যাক তার জন্যে আমি যে দুঃখ পাইনি—কোন নালিশও করিনি ঐ নিয়ে, সে ত তুমি জানো !

একটু উত্তেজিত ভাবেই নিতাই বলল : জানি না? সেই থেকেই ত তোমাকে অন্দরমহল থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে মাথা খাটাতে লাগলেন আমার মা ! এর পর ওঁর সহায় হয়ে এলেন বাপের বাড়ীর সম্পর্ক ধরে সেরেস্তার ঘোষাল আর তাঁর গিন্নী মোক্ষদা ঠাকরুণ। তোমার ওপর মায়ের মন বুঝে তিনিও নিজের মেয়ে স্বপ্নাকে তাঁর কোলে দিলেন ঠেলে। আমার মায়ের তখন আহ্লাদ দেখে কে? সেই সঙ্গে বোন আর ভাই—ঠিক ডাইনে আর বাঁয়ে চিনির নৈবিদ্যির মতন আমাকে তোয়াজ করতে লাগল। ওদেরই পরামর্শে হেবোকে ঘোড়া করে তার কাঁধে চড়ে লোক হাসাই, তারপর মানুষ ঘোড়া বন্ধ করে আসল ঘোড়ার ফন্দনা দিয়ে তুমিই বাজীমাত্ করলে।

সাধনা এখানে ঝাঁ করে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলে উঠল : ভুল করলে ওকথা বলে। ঘোড়ার কল্পনা আমি যে ভেবে দিয়েছিলুম, তুমিইত গোঁয়ারের মত কাজ করে সেটা বিগড়ে দিলে। আমি কিন্তু এখান থেকে দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি নিতাইদা—তোমার ঘোড়ায় চড়া, ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে চোট খাওয়া, হাসপাতালে যাওয়া—এ সবের জন্যে পিসিমা আমাকেই দায়ী আর দোষী করে সারা বড়বাড়ী তোলমাটি

ঘোল করে বেড়াচ্ছেন! হয় ত, এর শাস্তিও আমাকে নিতে হবে!

কথাটা শুনেই নিতাই উত্তেজিত ভাবে গলায় বেশ একটু জোর দিয়ে বলে উঠল: না, না, এ আমি বিশ্বাস করি না। মা যাই মনে করে থাকুন, কিন্তু যেই শুনবেন, তুমিই আমাকে বাঁচিয়েছ, নিজেই হাসপাতালে নিয়ে গেছ, তখন তিনি একেবারে বদলে যাবেন। তারপর যদিই তিনি ভুল বোঝেন, আর আমি ভাল হয়ে ফিরে যাই, তোমাকে তিনি কখনই—

সাধনাও মুখখানা শক্ত করে বলল: আমি তার জন্যে একটুও ভাবছি না নিতাইদা, আমি কেবল ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি, তুমি যেন দিব্যি সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে যাও, আর এ থেকেই যেন বিষে বিষক্ষয় হয়ে যায়!

নিতাই কিছুক্ষণ নীরব থেকে সহসা জিজ্ঞাসা করল: বিষে বিষক্ষয় হয়ে যায়, একথা কেন বললে বুঝলাম না ত?

সাধনা একটু হেসে কথাটার অর্থ বুঝিয়ে দিল: দেখ, বিষ বলতে আমি এখানে এই ঘোড়াটাকেই ধরছি। এটা বাড়ীতে আসতেই তুমি ওর পিঠে চড়ে যে কাণ্ড বাধিয়ে বসেছ, তার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কেউই নিশ্চিন্ত নয়। এর পর তুমি যদি ঘোড়াটাকেই তোমার বাধ্য বাহন করে নিতে পার, তাহলেই বিষে বিষক্ষয় হয়ে যাবে।

নিতাই কথাটা শুনে মুগ্ধ হয়ে গাঢ়স্বরে বলল: তুমি ছাড়া এমন কথা আর কেউ বলতে পারে না, হিসেব করেই তুমি কথা

বল। নিজে ঘোড়ার মর্ম জানতে বলেই ঘোড়া আনবার কথা তুলেছিলে। আমি তখন ভেবেছিলুম, ঘোড়ায় চড়ে টহল দিয়ে তোমারও ভুল ভেঙে দেব। কিন্তু আমারই দেমাক ভেঙে দিলেন ঠাকুর।

সাধনা বলল: সব ঠিক হয়ে যেত, তুমি যদি নিজেই একাণ্ড আজ না বাধাতে। এখন ঠাকুরের কাছে আমিও প্রার্থনা জানাচ্ছি—তিনি তোমাকে সারিয়ে দিন, আর আজকের এই দুর্ভোগ থেকে তোমার জীবনের সব দুর্যোগ যেন কেটে যায়।

নিতাই বলল: জ্ঞান হয়ে অবধি আমি কখন এত বড় বিপদে কোনদিনই পড়িনি, কিন্তু তাহলেও আমি আজ যে কাণ্ড দেখেছি—এখনো দেখছি, তাতে খালি খালি এই কথাই আমার মনে হচ্ছে, আমরা সবাই তোমার চেয়ে সব দিক দিয়ে কত ছোট! লেখাপড়ায়, কথাবার্তায়, বুদ্ধি-বিবেচনায়, মনের জোরে—সবতাতেই তুমি অনেক বড়। তারপর, গায়ের জোরও যা দেখছি, কোন মেয়ে যে এরকম হতে পারে—চোখে না দেখলে কারও বিশ্বাস হবে না। এখন এই ভেবে দুঃখ পাচ্ছি সাধন, বড় মানুষ মামার ভাগনে আমি—এরই অহঙ্কারে তোমার মত মেয়েকেও গ্রাহ্য করিনি, তোমাকে দাবিয়ে খাটো করতে চেষ্টাই করেছি। কিন্তু ভগবান যাকে দুনিয়ায় বড় করে পাঠিয়েছেন, মানুষের কি সাধ্য—তাকে সবার কাছে ছোট করে দেয়! এখন কি ভাবছি জানো, ভগবান যা

করেন সে শুধু ভালোর জন্যই। তাই, এইভাবে আমার দেমাক ভেঙ্গে দিয়ে তিনি আমার ভুলও ভেঙে দিলেন।

সাধনা চুপ করেই নিতায়ের কথাগুলি মন দিয়ে শুনছিল। যে ছেলেটি দারিদ্র্যের নীচের তলা থেকে হঠাৎ ঐশ্বর্যের উপর-তলায় উঠে সুবিধাবাদীদের চাটুবাক্য আর তোষামোদ শুনে শুনে একান্ত উদ্ধত ও দুর্বিনীত হয়ে ওঠে; এবাড়ীতে আসবার পরেই বড়লোক মামা একটা আদর্শকে সামনে রেখে ভাগনের মতিগতি পরিবর্তনে অবহিত হলেও মায়ের কুমন্ত্রণায় তাঁর সে প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। অনর্থ হয়ে দাঁড়ায় আদর্শরূপিণী সেই মেয়েটির উপর মায়ের হীন মনোবৃত্তি। নিজেদের স্বার্থের পথে সেই পরের মেয়েটিকে একান্ত অন্তরায় ভেবে ছেলের মনটি তিনিই বিগড়ে দেন। তার ফলে, অমনি বাল্য-জীবনের পরিবেশ, নীচতা ও ঈর্ষা তাকে পথভ্রষ্ট করে। শিক্ষাসূত্রে বালিকা বয়সেই সাধনা মানুষ মাত্রকেই ভালো-বাসতে অভ্যস্ত হওয়ায়, প্রথম দর্শনেই মাতাপুত্রের মানসিক সংস্কারজনিত এই দুর্বল দিকটার সন্ধান পেয়ে নিজেই সতর্ক হয় এবং ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে এদের স্বার্থের পথ থেকে সরে দাঁড়ায়। কিন্তু বিচক্ষণ ও সহৃদয় গৃহস্বামী তথাপি তাঁর সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নি। তাঁরই ব্যবস্থায় বিকেলের দিকে প্রত্যহ একটি ঘণ্টা শিক্ষা সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে যে যোগসূত্র রচিত হয়, তাতেই সেই দুর্বিনীত ছেলেটি তার সহপাঠিনী মেয়েটির উৎকর্ষ উপলব্ধি করে ধীরে ধীরে তার প্রতি আকৃষ্ট

হয়ে ওঠে। এমন কি, কলকাতা সহরে শিক্ষাপ্রাপ্তা প্রগতিপন্না রূপসী স্বপ্না মেয়েটির অন্তরঙ্গতা এবং সেদিকে মায়ের সহায়তাও তাকে অভিভূত করতে পারেনি।

কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন কথা ওঠবার আগেই এ দিনের দুর্ঘটনাসূত্রে ভাবমুখে নিতাই জানিয়ে দিল যে, এ দিনের ব্যাপারে সাধনার অপূর্ব সেবাধর্ম ও সেই সঙ্গে অভাবনীয় আর এক ক্ষমতার পরিচয় পাবার পূর্বেই সাধনার প্রতি কি সূত্রে সে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল।

নিতায়ের আবেগভরা কথাগুলি শুনতে শুনতে সাধনার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কমনীয় মুখখানা এক একবার অরুণিমার আভায় আরক্ত হয়ে ওঠে। আবার পরক্ষণেই সে কঠিন হয়ে তার প্রভাব থেকে আপনাকে মুক্ত করে নেয়। এমন কি, তাদের অজ্ঞাতে মামাবাবু সাধনা সম্বন্ধে তার মায়ের কাছে যে গোপনীয় ইচ্ছাটি একদা প্রকাশ করেন, আর সংগোপনে দরজার আড়াল থেকে নিতাই শোনবার সুযোগ পায়, এই সুযোগে সেই কথাগুলিও সাধনাকে শুনিয়ে দিল :

জানো সাধন, তোমার ওপর আমার মায়ের মতিগতি ভালো নয় জানতে পেরে মামাবাবুর কি দুঃখ! মাকে তিনি কত কথাই বলেন, তাঁর ভুল ভেঙে দেবার জন্যে কত চেষ্টাই করেন। একটা দিনের কথা আমি শুনেছিলুম দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে। মামা সেদিন মাকে বলছিলেন—

শিক্ষয়িত্রী সুলভ গম্ভীর মুখভঙ্গি করে সাধনা বলল : থামো,

ও সব কথা নিয়ে আলোচনা করতে নেই। আর, আড়ালে থেকে কারও কথা শোনা খুবই অন্যায়। নীতিশাস্ত্রে এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—অপরের কোন কথা কানে এলে তখনি ছিপি এঁটে দেবে নিজের মুখে। কাউকে সে কথা বলতে নেই। যখন এত কথা আজ হল, আমি একটা কথা তোমাকে বলতে চাই নিতাই দা, যদি কথা দাও—রাখবে, তবেই বলব, নইলে—

নিতাই যেন শক্ত হয়েই বলল: নিশ্চয় রাখব সাধন, তুমি বল।

সাধনা সংযত কণ্ঠে বলতে লাগল: দেখ, এখন আমাদের যে বয়স, পড়াশোনা, খেলাধূলা, পূজা-পাঠ, সেবা-শুশ্রূষা—এ সব ছাড়া আর কোন দিকে মন নিবিষ্ট করা উচিত নয়! আমাদের সমাজে বাপ মা বা অভিভাবকরা, ছেলে-মেয়েদের লক্ষ্য করে সময় সময় বিয়ের কথা তুলে থাকেন, এই নিয়ে কত মিছে জল্পনা-কল্পনাও হয়। এ কিন্তু ভাল নয়। সমস্ত কিশোর কালটাই হচ্ছে ছেলে-মেয়েদের তপস্যার কাল। তপস্যা বলতে অধ্যয়ন বা পড়াশোনা বুঝতে হবে। তাই, আমি তোমাকে অনুরোধ করছি নিতাই দা, পড়ায়, আচার-ব্যবহারে, লোকের সেবায় শুশ্রূষায়, সমস্ত মন ও শক্তি দিয়ে কাজ করবে, এগুলো ছাড়া আর কিছু করবে না, ভাববে না, কারও মনে ব্যথা দেবে না, মানুষকে ভালবাসবে, যতটুকু সাধ্য তাই দিয়ে মানুষের উপকার করবে,—এইগুলি তোমাকে স্বীকার

করতে হবে। আমি তোমাকে এই অনুরোধই করছি, নিতাই দা! বল, আমার এ অনুরোধ রাখবে?

সাধনার কথাগুলি শুনে শেষের দিকে তার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই নিতাই বলল: হ্যাঁ, তুমি যে সব কথা বললে, যদি সেরে উঠি—নিশ্চয়ই সেই মত করব, এরপর আমি সত্যিই ভালো ছেলে হবার জন্যে চেষ্টা করব। যদি ভুল করি, তুমি আমাকে সাবধান করে দিও। কিন্তু একটি কথা—

সাধনা জিজ্ঞাসা করল: কি?

নিতাই বলল: এরপর তুমি দেখো সাধন, আমি আর আগেকার সে নিতাই নেই—একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে গেছি। স্বপ্না যদি ফের বেহায়াপনা করতে আসে, কু-মতলব দেয়, মিছে কথা ব'লে আমাকে তাতাতে চায়, আমি তাকে এমন অপমান করব—

সাধনা তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে দৃঢ়স্বরে বলল: ছিঃ, তোমার মা যাকে আশ্রয় দিয়েছেন, সোনার চোখে যে মেয়েটিকে দেখেছেন, যার বাপ, মা, ভাই, বন্ধু সকলেই তাঁর চোখে ভালো লেগেছে, তুমি কেন তাকে অপমান করে মায়ের অপ্রিয় হবে? বরং পারত, বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে ভাল করবার চেষ্টা করবে; দোষ করলে, অন্যায় করলে, মিথ্যা বললে, তাকে বুঝিয়ে বলবে—ও সব ভাল নয়, আমি পছন্দ করিনে।

ক্ষুব্ধ স্বরে নিতাই বলল: হ্যাঁ, ও সেই মেয়ে কিনা? ও কথা বলতে গেলেই টিটকিরি দিয়ে আমাকে বেকুব বানিয়ে

ছাড়বে। ছড়া কেটে, গান গেয়ে, নেচে আমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবে। আমার মা-ই ত আস্কারা দিয়ে ওকে মাথায় তুলেছে। তুমি দেখে নিও সাধন, এর পর আমি আমার ঐ অবুঝ মায়ের কি খোয়ার করি! সবার সামনে আমার মায়ের ইতর মনের কথাগুলো বলে—যদি হাটে হাঁড়ি না ভেঙে দিই—

সাধনা তার ঘোড়ার লাগাম ধরা হাত দুখানা নামিয়ে নিতায়ের মুখে চাপা দেবার মত করে জোর গলায় বলে উঠল: ছি, ছি, ছি! কি বলছ তুমি নিতাই দা! ছেলে হয়ে সবার সামনে মায়ের অখ্যাতি করবে, তাঁর মনে ব্যথা দেবে, কোন্ মুখে বললে এ কথা?

নিতাই একটু থেমে, তারপর বলল: তুমি কি জান না সাধন, যত নষ্টের গোড়া হচ্ছে আমার মা। ওর জন্যেই ত স্বপ্নার অত আস্পর্দ্ধা! তুমি কি আমার মাকে—

মুখখানা পুনরায় কঠিন করে সাধনা দৃঢ়স্বরে বলল: থামো, সব সময় একথা মনে রেখো নিতাই দা, মা সব সময়েই মা! ঠাকুর দেবতার যেমন বিচার করা আমাদের সাজে না, তেমনি বাবা আর মায়ের সম্বন্ধে এমন কোন আলোচনাই উচিত নয়—যাতে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব হবে। আমরা যে বিধাতার সৃষ্টি দেখি, আমরা যে কথা বলি, সে কি ওঁদের জন্যেই নয়? আমি ভাবতে পারি না নিতাই দা—সন্তানের পক্ষে বাপ-মা'র বিরুদ্ধে কথা বলা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? না, না, এ আমার অসহ্য! আমার এ অনুরোধও তোমাকে রাখতে হবে

নিতাই দা ! তোমার মা যত অন্যায়ই করুন, তোমাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হবে। মায়ের ওপর রাগ বা অভিমান হলে তখনই মনে করবে—উনি মা, ওঁরই জন্যে আমি সংসারে এসেছি। যদিও অন্যায় করেন, তবু আমাকে সহ্য করতে হবে।

নিতাই বলল : তোমার এ অনুরোধ রাখতে হলে আমাকে কিন্তু অনেক—অনেক অন্যায় সহ্য করে মুখ বুজে থাকতে হবে ; তখন হয়ত—

স্নিগ্ধ স্বরে সাধনা বলল : তখনই দেখবে—অন্তর থেকে মাতৃভক্তির ধারা বেরিয়ে দুঃখ-যাতনা অশান্তির সব জ্বালা জল করে দিয়েছে !

অসুস্থ অর্দ্ধশায়িত আরোহীটির স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে সাধনা শিক্ষিত ও শান্ত ঘোড়াটিকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী এমন একটি মৃদুমন্দ গতিতে একই চালে চালিয়ে আসছিল যে, সহরের মুখে পথচারী মাত্রই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। এই বয়সের কোন বাঙালী কিশোরী যে আর এক অসুস্থ আরোহীকে ঘোড়ার পিঠে সামলে রেখে অবলীলাক্রমে ঘোড়া চালিয়ে যেতে পারে—এ যেন তাদের পক্ষে এক অভূত-পূর্ব ব্যাপার! তাদের চোখে বুঝি পল্লব পড়েনা, মুখ দিয়ে বাক্য সরে না। মনে প্রশ্ন ওঠে—কে এই অদ্ভুত মেয়ে ?

সাধনাও এই সময় নিতাইকে বলল : আমরা সহরের পথেই এখন চলেছি ; পথের লোকগুলো অবাক হয়ে দেখেছে।

নিতাই বলল : একেই ঘোড়ায় চড়ে আজকাল কাউকে যেতে দেখা যায় না, আমরা আবার একটা ঘোড়ার পিঠে দু'জনে চেপে চলেছি। তার মধ্যে আমি ত শুয়েই যাচ্ছি। হয়ত ঠাট্টা করছে।

সাধনা বলল : না। সে পথ আগেই বন্ধ করে তবে ঘোড়ার পিঠে রোগী তুলেছি। এমন করে তুমি একই ভাবে শুয়ে আছ, দেখলেই লোকে ভাববে—অসুস্থ একটি ছেলেকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাচ্ছে ; এতে ঠাট্টার কি আছে ?

পনেরো

পথচারীদের উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করে সাধনা অল্পক্ষণের মধ্যেই সদরপুর হাসপাতালের পুরোভাগে এসে পড়ল। এরপর ফটকের ভিতর দিয়ে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেই একটা বড় গাছের পাশে ঘোড়াটিকে দাঁড় করিয়ে হাতছানি দিয়ে হাসপাতালের ভৃত্যদের আহ্বান করল। অনেকগুলি পরিচারক এই সময় ফুল পাতা পল্লব দিয়ে হাসপাতাল ভবনটির রূপ-সজ্জায় ব্যস্ত ছিল। সেই অবস্থাতেই নবাগত অদ্ভুত দুটি অশ্বারোহী তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। জন দুই ভৃত্য নিকটে আসতেই সাধনা অশ্বপৃষ্ঠে অর্দ্ধশায়িত রোগীটিকে দেখিয়ে সন্তর্পণে নামাবার জন্য একখানা ষ্ট্রেচার আনবার নির্দেশ দিল। ষ্ট্রেচার-বাহকদের সঙ্গে হাসপাতালের জনৈক সেবিকাও কৌতূহলের বশবর্তিনী হয়ে অশ্বারোহিণী কিশোরীটির কাছে এগিয়ে এল। অল্প দুই একটি কথার মধ্যেই জানা গেল যে, এই হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা মধুমতী ষ্টেটের মালিক কানাই চৌধুরী ডিষ্ট্রিক্ট অফিসারদের বৈঠকে যোগ দেবার জন্য সদরপুর টাউন হলে এসেছেন। হাসপাতালের কর্তারা তাঁকে এই সুযোগে সম্বর্দ্ধনা করবেন, সেই জন্যই হাসপাতাল সাজানো হচ্ছে। আর একটু পরেই—ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় টাউন হল থেকে তাঁকে মিছিল করে আনা হবে। সরকারী হাকিমসুবারাও আসবেন।

সাধনাও সুযোগ বুঝে এই সময় হাসপাতালের তরুণী

সেবিকাটিকে বলল : দেখুন, যাঁর জন্য এখানে এই সব সাজ-সজ্জার আয়োজন হচ্ছে, আমি তাঁরই ভাগনেকে চিকিৎসার জন্যে এখানে এনেছি। ইনি ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছেন।

তৎক্ষণাৎ খবরটি হাসপাতালের সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে গেল। সাধনাকে আর বিশেষ কিছুই বলতে হল না। তিন চার জন লোক, সাধনা ও সেবিকাটির সযত্ন তত্বাবধানে নিতাইকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ষ্ট্রেচারে তুলে হাসপাতালের দোতলায় একটি স্বতন্ত্র ঘরে নিয়ে গিয়ে সুপরিচ্ছন্ন বিশেষ শয্যায় শুইয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে হাসপাতালের ডাক্তার, কর্মী, শিক্ষার্থী ও সেবিকাগণ রোগীর শয্যাপার্শ্বে সমবেত হলেন।

বুদ্ধিমতী সাধনা ইতিমধ্যে হাসপাতালের অফিস-ঘরে ভার-প্রাপ্ত ডাক্তারকে দুর্ঘটনা সংক্রান্ত জানাবার মত খবরগুলির সঙ্গে অকুস্থলেই প্রাথমিক শুশ্রূষা ও সময়োচিত ব্যবস্থাগুলির সম্বন্ধে খবরগুলি দিয়ে সবিনয়ে বলল : রোগীর মামা এখনো পর্য্যন্ত অন্ধকারে, কিছুই জানেন না। আর টাউনহলের সভায় গিয়ে তাঁকে খবরটা না দেওয়াই উচিত—একটু পরেই যখন এখানে আসছেন! আমার মনে হয়, সম্বর্দ্ধনার পর তিনি যখন হাস-পাতালের শয্যাগুলি দেখতে আসবেন, সেই সময় তাঁর ভাগনে-রোগীটিকে দেখানোই ভালো। তখন তাঁকে বলবেন—তাঁরই কন্যাস্থানীয়া সাধনা রোগীকে ভর্তি করে দিয়ে বাড়ীতে ফিরে গেছে—সেখানে খবর দেবার জন্য। আপনারা, রোগীর জন্য যা

যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করুন, কর্তার সঙ্গে তাঁর দেওয়ানও থাকবেন—তিনিই বিলের টাকা দেবেন।

এর পর সাধনা রোগীর ঘরে ফিরে এসে ডাক্তারদের কাছ থেকে গোপনে খবর নিয়ে জানল যে, মালাইচাকির হাড় যদি ভেঙে না গিয়ে থাকে ভয়ের কোন কারণ নেই। তবে হাসপাতালে কিছুদিন এখন থাকতে হবে। তাঁরা এখন প্রাথমিক চিকিৎসা করে, খানিক পরে যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা করবেন।

এরই মধ্যে ডাক্তাররা রোগীকে একটা ইনজেকসন দেন। শয্যায় আনার পর রোগী পায়ে ও কোমরে দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করে, এবং সেই অবস্থাতেই ক্রমাগত সাধনার সন্ধান করতে থাকে। সাধনা তখন আফিস-ঘরে রিপোর্ট লেখাচ্ছিল। আহ্বান পেয়ে রোগীর ঘরে ছুটে এসে দেখল, ইনজেকসনের ক্রিয়ায় সে ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন ডাক্তারদের উদ্দেশে অনুরোধ জানিয়ে এবং প্রত্যেক সেবিকার হাত ধরে রোগীকে বিশেষভাবে যত্নের সঙ্গে দেখবার কথা বলে ও তাদের প্রাপ্তি সম্পর্কে আশ্বাস দিয়ে ভারাক্রান্ত চিত্তে সাধনা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল।

ঘোড়ার পিঠে উঠে রাস্তায় আসতেই সাধনার মনে হঠাৎ এই প্রশ্ন উঠল, টাউন হলে গিয়ে জেঠামণিকে খবরটা দিয়ে আসবে কিনা? কিন্তু তাতে নিজের বাহাদুরীটাই রাষ্ট্র হবে অনুমান করেই অগত্যা মধুমতীর পথ ধরে তাকে অবশেষে

পাড়ী দিতে হলো। ফেরবার মুখে ঘোড়াকে হাতের লাগাম ও পায়ের চাপে ইশারা করতেই সে যেন বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলল। পথের লোক সবিস্ময়ে এই অদ্ভুত অশ্বারোহিণীকে দেখে কত কি ভাবতে লাগল, ভাবাবেগে একজন বলেই ফেলল: কোথাকার রাজকন্যে রে। পক্ষীরাজের পিঠে চেপে ধাওয়া করেছে!

মাঝপথে বাজারটির উপর আসতেই পূর্ব-পরিচিত শ্রমিকরা এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করল: হুজুরের ভাগনের কি হল?

লাগাম টেনে ঘোড়ার গতিবেগ সংযত করে সুমিষ্টস্বরে সাধনা জানাল: হাসপাতালে তাকে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। আবার দেখা হবে—নমস্কার।

কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া আবার দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। জনতা থেকে মিলিত কণ্ঠের সশ্রদ্ধ অভিবাদন সাধনার শ্রুতিস্পর্শ করল: পেরণাম গো দি' ঠাওরোণ…নমস্কার…ছালাম!

বড় বাড়ীর কাছাকাছি ছই দিয়ে ঘেরা একখানা গরুর গাড়ী সামনে পড়ায়, সাধনাকে ঘোড়ার লাগাম টেনে গতি বন্ধ করতে হলো। ভিতরের গবাক্ষ পথে উঁকি দিয়ে গাড়ীর আরোহী ফটিক ঘোষাল শুধালেন: সাধনা না? খোকাবাবুর খবর কি?

সাধনা বলল: আপনি বুঝি গাড়ী চড়ে তার খবর নিতে চলেছেন কাকাবাবু?

ব্যঙ্গের হাসিতে মুখখানার এক বিচিত্র ভঙ্গি করে ফটিক ঘোষাল বললেন : ঘোড়ায় চড়বার ভাগ্য নিয়ে ত জন্মাইনি মা, তাই আমাদের মামুলি গাড়ী চড়েই বেরিয়েছি, হেঁটে যাবার শক্তিও নেই গায়ে। তা কি খবরটা ত শুনি? এইটেই সেই ঘোড়া না?—খোকাবাবু এর পিঠে উঠতেই ঘোড়াটাকে ক্ষেপিয়ে দেয়, সেও ছোটে তাঁকে পিঠে নিয়ে, তারপর—

সাধনাও সংক্ষেপে পরবর্তী খবরটা দিল : তারপর যা হবার তাই হয়—খোকাবাবু ঘোড়া থেকে মাঝপথে ছিটকে পড়ে যায়—

—কি সর্বনাশ! পড়ে যায়। য়্যাঁ! তারপর?

মৃদু হেসে সাধনা বলল : নিজের চোখেই ত দেখছেন, ঘোড়াটাকে ধরে শাস্তি দেবে বলে আস্তাবলে নিয়ে চলেছি; আর খোকাবাবুকে এরই পিঠে তুলে সদরপুরের হাসপাতালে রেখে এসেছি। সবই ত শুনলেন, এখন এই অবেলায় গিয়ে কি আর করবেন?

ব্যথায় ভেঙে পড়ার মত ভঙ্গি করে ফটিক ঘোষাল বললেন : কি করব আমি? হায়রে, নিঃস্পর বলেই একথা বলতে পারলে মা, কিন্তু খোকাবাবুকে তো আমি পর বলে কোনদিন ভাবতে পারিনি, তাই আমাকে যেতেই হবে তার কাছে। আর, অবেলা বলছ, আমার কাছে কি এখন কালাকাল আছে—সকাল-সন্ধ্যে দিন-রাত সবই একাকার হয়ে গেছে। আমার খোকাবাবু হাসপাতালে একলা পড়ে আছে...ও হো হো! ওরে বাবা—চালা, চালা, তাড়াতাড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে গবাক্ষ থেকে মুখখানা তাঁর অদৃশ্য হয়ে গেল। সাধনা সেদিকে তাকিয়ে সহাস্যে বলল : হ্যাঁ, তাড়াতাড়িই যান কাকাবাবু, বেশী রাত হলে আপনারই কষ্ট হবে।

পরক্ষণে ঘোড়া ছুটিয়ে সাধনা একেবারে বড়বাড়ীর বার-মহলে আস্তাবলে এসে নিশ্চিন্ত হল। তার এখন প্রথম কাজ হলো, ঘোড়াটাকে তোয়াজ করা। নিজেই তার সাজ-সজ্জা সব খুলে রেখে, কেঠো থেকে ভিজে ছোলা সের দুই তুলে নিয়ে থলিতে ঢেলে ঘোড়াটার মুখে বেঁধে দিল। আস্তাবলের কোথায় কি থাকে, সবই তার নখদর্পণে। এর পর আস্তে আস্তে ঘোড়ার পিঠে দুটো ফাঁপা চাপড় দিয়ে সস্নেহে বলল : দানাগুলো পেটে পুরে একটু ঠাণ্ডা হও। ফিরে এসে জল খাইয়ে দলাইমালাই করে তবে আমার ছুটি।

ঘোড়াকে শান্ত করে দ্রুত পদে সে হাবুলের সন্ধানে তার ঘরের দিকে ছুটল।

সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে তখন বড় বাড়ীর চারদিকের বিশাল আয়তন ধূসরাকৃতি ধারণ করেছে। পাঠশালার সামনে প্রাঙ্গণে এসেই সাধনার মনে হল, কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। তখনো দেউড়ীতে আলো জ্বালা হয়নি। বুকের ভিতরটায় কেমন একটা স্পন্দনের সাড়া পেল সাধনা। তাড়াতাড়ি সে ভিতর মহলে দর-দালানের পাশের ছোট ঘরখানির মধ্যে সেঁধিয়ে দেখল—একটা তক্তপোষে বিছানো শয্যার উপর বসে, দু' হাতে মুখখানা চেপে হাবুল ফুলে ফুলে কাঁদছে।

সাধনা সবেগে এগিয়ে গিয়ে তার মাথার উপর হাতখানি রেখে স্নেহার্দ্রস্বরে শুধাল : কি হয়েছে হাবুদা, কাঁদছ কেন ?

মুখখানা তুলে সাধনার মুখের পানে চেয়ে হাবুল আর্তস্বরে বলল : দিদিমণি ! তুমি ? আগে বল—দাদা বাবুর কি খবর ?

মৃদুস্বরে সাধনা বলল : ভাল। বলছি তার কথা, কিন্তু আগে তুমি বল—কেন কাঁদছিলে ? তুমি নিজে কেমন আছ ?

কান্নার সুরে হাবুল বলতে লাগল : আমার কথা আর কি কই গো দিদিঠাকরুণ, তুমি ছাড়া কেই বা আমার তরে চিন্তে করে। এই ছাখনা, ঘোড়ার চাট খেয়ে এমনি চোট পেয়েছি গো, যার তরে উঠতে নারছি। কিন্তু কে তা জানতি চায় কও ত ? খোকাবাবুরে নিয়ে ঘোড়া গেল ছুটে, তার তরে যত কিছু দোষ হল এই অভাগা হাবুলের গো দিদিমণি ! কি মারটাই মারলেন আমারে খোকাবাবুর মা-জননী—পিঠের পানে তাকাও, দেখবে তার নিশানা ; আস্ত ছড়িখানা ভেঙ্গে দু'খানা হয়ে গেলেন গো—

হাবুলের পিঠের দিকে ঝুঁকে পড়ে, সারা পিঠখানার উপর প্রহারের দাগ দেখে শিউরে উঠল সাধনা। সস্নেহে সেই নিষ্ঠুরতার চিহ্নাঙ্কিত স্থানগুলির উপর হাত বুলিয়ে দিয়ে গাঢ়স্বরে সাধনা বলল : বল কি, হাবুদা ! এমনি করে পিসিমা তোমাকে মেরেছেন ? কিন্তু তুমি তো কোন দোষ করনি !

সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের থলি থেকে তার ওষুধ পত্র বার করে

দরদ দিয়ে সে হাবুলের পিঠে কালশিরে পড়া স্থানগুলির উপর মলমের প্রলেপ দিতে লাগল। তৃপ্তির আনন্দে অভিভূত হয়ে হাবুলও বলতে লাগল: ওনারে ত চেন তুমি দিদিমণি, রাগলে আর জ্ঞান-গম্যি থাকে না। ওনারে বুঝিয়েছ্যাল যে, যত নষ্টের গোড়া তুমি দিদিমণি, আর আমি হেবো হতভাগা। খোকাবাবু ঘোড়ার পিঠে উঠতেই তুমি নাকি তোমার পোড়ো মাইয়াদের টিন বাজিয়ে হল্লা করতে হুকুম দে'ছলে, আর আমিও তোমার হুকুম পেয়ে ঘোড়ার পিঠে চাবুক হাঁকরাতে থাকি, তাতেই—

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সাধনা বলল: এত বড় একটা মিথ্যা কথা কানে শুনে পিসিমা তোমার ওপর এভাবে পীড়ন করলেন! কেউ তাঁকে—

মুখখানা তুলে দরজার দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে একটিবার চেয়ে ভালভাবে দেখে হাবুল বলল: কে তেনারে ঠেকাবে গো দিদিঠাকরুণ! হন্যে জানোয়ারের মতন তাঁর কি দাপাদাপি গো! এখন তোমারে কই দিদিঠাকরণ, মিনতি করি গো, তেনার সামনে এখন যেওনা কিছুতেই—তোমারে দেখলেই একটা পেরলয় কাণ্ড হবেক গো!

সাধনা জিজ্ঞাসা করল: তিনি কোথায় এখন—এবাড়ীতে না, ঘোষাল কাকার মহলে?

চাপা গলায় হাবুল বলল: সেথায় তখন থেকে মস্ত মিটিং বসেছে গো দিদিঠাকরুণ, এ তল্লাটে কেউ নেই; সাঁঝের

আলো দিতি হবে সে হুঁসও কারও নেই, আর আমার দশা ত দেখছ, কোমরটা একবারে—

গভীর সহানুভূতির স্বরে সাধনা বলল : দেখি তোমার কোমরটা—কেটে কুটে যায়নি ত, ঘোড়ার পায়ের ক্ষুরে—

হাবুল সঙ্কোচের সুরে বলল : না গো দি'ঠাকরুণ, কাটেনি, খালি দরদ ; তোমার মলম আমার হাতে দাও, আমি লাগিয়ে মালিস করি গো—

সাধনা বলল : নিজের গায়ের ব্যথার ওপর নিজের হাতে কি মালিস করা যায় হাবুলদা ! কেন তুমি কুণ্ঠিত হচ্ছ ? এর পর সেরে উঠে লম্বা হয়ে আমাকে একটা প্রণাম করলেই হবে।

আর কোন কথা না বলে বা হাবুলের আপত্তি গ্রাহ্য না করেই সাধনা তার আহত স্থানে ওষুধটা মালিস করে দিতে লাগল। এরই মধ্যে হাবুল অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে নালিস জানাল : শুনেছেন দিদিমণি, চাবুকটা ভেঙেও পিসিমার রাগ পড়েনি ; হুকুম হয়েছে, আজ রেতে আমার খাওয়া বন্ধ। আমার জন্যে চাল নিতে ঠাকুরকে বারণ করেছেন।

মালিস করতে করতে সাধনা এই আশ্রিত অসহায় একান্ত নিরীহ মানুষটির কথাগুলি নীরবেই শুনল। তার মনে শুধু এই প্রশ্নটি বার বার খোঁচা দিতে লাগল ; পিসিমা সন্তানের মা হয়ে কি করে এত নিষ্ঠুর ও কঠিন হলেন ?

যাবার সময় সে হাবুলকে চুপি চুপি জানিয়ে গেল, ওবাড়ী থেকে সে তার খাবার পাঠিয়ে দেবে।

হাবুলের পরিচর্যার পর সাধনাকে পুনরায় আস্তাবলে ফিরে যেতে হল। ঘোড়াটার মুখে ভিজা দানার থলি বেঁধে দিয়ে বাড়ীর ভিতরে হাবুলের সন্ধানে তাকে যেতে হয়েছিল। আস্তাবলে কিছু কিছু কাজ এখনো তার প্রতীক্ষায় রয়েছে। যেমন, ঘোড়ার মুখ থেকে দানার থলি খুলে দিয়ে বালতিভরা পানীয় জল ধরতে হবে, তারপর দলাই-মালাইয়ের ব্যাপার। সাধনা জানে, কঠোর পরিশ্রমে ঘোড়া কখনই কাবু হয়ে পড়ে না—যদি ঠিক সময়মত তার দেহটাকে দলাইমালাই করা হয়। সহিসের অভাবে এখন তাকেই এই প্রয়োজনীয় কাজটি সমাধা করতে হবে ; তারপর নিতাইদা সম্পর্কে একটা খবর পিসিমার কাছে পাঠিয়ে তবে তার ছুটি। তেরো বছরের কিশোরী মেয়ে কোমরে সাড়ীর আঁচলখানা জড়িয়ে বলিষ্ঠ দু'টি হাত নিপুণভাবে চালিয়ে তেজীয়ান একটা ঘোড়ার অঙ্গ সংবাহন করছে—কথাটা শুনে কেউ হয়ত বিশ্বাসই করবেন না, কিন্তু সত্যই এই মেয়েটির পক্ষে এমন কঠিন কাজটিও সম্ভব হয়েছে। সন্ন্যাসী গুরুর সঙ্গে যে-সময় সাধনাকে আসানসোলের আশ্রমে থেকে শরীরচর্চা ও বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যায়াম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়, তখন ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাকে আয়ত্ত করবার বিদ্যাটুকু শুধু শিক্ষা করে সে নিরস্ত হয়নি—ঘোড়ার দোষগুণ পরীক্ষা, সেই সঙ্গে তার পরিচর্যা সম্বন্ধেও তাকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়েছিল। কর্মযোগী এই সন্ন্যাসী গুরুটিও, প্রত্যেক শিক্ষার ব্যাপারে তার

সমস্তই খোলাখুলি ভাবে হাতে কলমে দেখিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হতেন। সেইজন্যই এই প্রতিভাময়ী কিশোরীর পক্ষে আর একটি আহত কিশোরকে ঘোড়ার পিঠে সুষ্ঠুভাবে বসিয়ে পাড়ী দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

বাড়ীতে ফেরবার মুখে সাধনা অনুভব করল, নিতাইদার খবরটা তাঁর মাকে জানানো উচিত। কিন্তু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলেও স্বপ্নাদের মহল থেকে তিনি ফিরে না আসায়, জেঠামণির বৃদ্ধ পরিচায়ক শিবুকে ডেকে বলল : পিসিমা ওবাড়ী থেকে ফিরলেই তাঁকে বলবে শিবুখুড়ো—তাঁর ছেলে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলেন ; সেই অবস্থায় তাঁকে সদরপুরের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। ডান পায়ের হাঁটুতে আর কোমরে শুধু চোট লেগেছে, তবে ভয়ের কিছু নেই। জেঠামণিও সেখানে গেছেন। পিসিমা যেন এই নিয়ে একটা হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে না বসেন। এইভাবে বড় বাড়ীতে সাধনার যে কর্তব্যগুলি ছিল, সেগুলি পর পর সেরে বা যথোচিত ব্যবস্থা করে সে বাড়ীতে যখন ফিরে গেল—তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

সাধনাকে দেখেই সুধীর ছুটে এসে দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল : এত দেরী করে ফিরলে দিদি? ঘোড়া আর নিতাইদার খবর কিছু পেয়েছ? ওঁর মা ত চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করছেন, আর দিদি, তোমাকেই ওর জন্যে দায়ী করে যা নয় তাই—

পাড়ার যে সব ছেলে মেয়ে সকালে ও সন্ধ্যায় এবাড়ীতে সাধনার কাছে পড়তে আসে, সুধীর এতক্ষণ তাদের সঙ্গেই পড়ার ঘরে লেখাপড়া করছিল। সুধীরের সঙ্গে তার পড়ার সাথীরাও ছুটে এসে সাধনাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। তারাও নিতাইদার মায়ের কাণ্ড আর তাঁর পেয়ারের স্বপ্না মেয়েটির মিথ্যাচার সম্পর্কে খবরগুলি বলবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে, এমন সময় পিসিমা এসে অনুযোগের সুরে বললেন : ফিরেছ মা! সেই থেকে ভেবে অস্থির, দাদাও সদরে গেছেন ; তারপর পাঠশালার ছুটির পর যে কাণ্ডর কথা শুনেছি তাতে ত পেটের ভেতরে হাত পা সেঁধিয়ে যাবার যো হয়েছিল। এই মাত্তর ত সুধীরকে বলছিলুম, আমাকে সন্ন্যেসী ঠাকুরের কাছে নিয়ে চ, তাঁকে সব বলি, তিনি শুনে—

মৃদু হেসে সাধনা বলল : তিনি শুনলে হাসতে হাসতে বলতেন পিসিমা, কোন ভাবনা নেই, ঠিক সময়েই তোমাদের মেয়ে বাড়ীতে ফিরে আসবে, হারিয়ে যাবে না।

নিজের গণ্ডে অঙ্গুষ্ঠটি ঠেকিয়ে পিসিমা বললেন : শোন মেয়ের কথা। তুমি ত বাছা আমাদের ব্যগ্রতা দেখে দিব্যি হাসছ, আর আমরা এতক্ষণ—

পিসির কথায় বাধা দিয়ে সাধনা মৃদুস্বরে বলল : কতদিন ত তোমাকে বলেছি পিসিমা, আমার কাণ্ড কারখানাই আলাদা— কেমন গুরুর শিষ্যা আমি, আমার জন্যে বাপু তোমরা ভেবোনা। কিন্তু কিছুতেই তোমরা আমার কথাটি বুঝবে না। আচ্ছা,

তুমিই বল পিসি—নিতাইদা আনাড়ী ছেলে, কখনো ঘোড়ার ত্রিসীমায় যায় নি, সেই ছেলে গোঁয়ার্তুমী করে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল, শুধু কি তাই—চাবুক হাঁকাল সপাসপ করে, ঘোড়াও বিগড়ে গিয়ে ছুটল তাকে নিয়ে। চারদিকে হৈ হৈ শব্দ, সবাই বলে—গেল, গেল। কিন্তু কেউ কি এগিয়ে গিয়েছিল তার দিকে! কাজেই আমাকে ছুটতে হয় ঘোড়াটাকে ঠাণ্ডা করতে—

মুখখানা মচকে পিসিমা বললেন: তুমিই বা ঘোড়া ঘেঁটে ঘেঁটে লায়েক হয়েছিলে কবে বাছা—যে ক্ষ্যাপা ঘোড়ার পিছু নিয়ে ছুটলে?

সাধনা বুঝল, পিসির জেরাটি ঠিকই হয়েছে। তাই কথাটা সামলে নিয়ে বলল: তুমি ত জান পিসি, ভালবাসা দিয়ে আমি সবাইকে যাত্নু করতে শিখেছি। দেখনি, পাড়ার দুষ্টু বাঘা কুকুরটা সবাইকে তেড়ে গেলেও, আমাকে দেখলেই লেজ নাড়তে নাড়তে পায়ের তলায় গড়াগড়ি দেয়। তাই ভাবলুম, যদি ঘোড়াটাকে ফেরাতে পারি! হ্যাঁ, তবে তখুনি তাকে ধরতে পারিনি বলেই নিতাইদা পড়ে যায় তার পিঠ থেকে—

শিউরে উঠে পিসি বললেন: পড়ে গিয়েছে খোকা বাবু! ঘোড়া থেকে—সে কিরে?

খবরটা শুনে অন্যান্য ক্ষুদে শ্রোতাগুলিও শিউরে উঠল, কিন্তু সাধনা দিব্য সংযত কণ্ঠে বলল: ওতে শিউরে ওঠবার কি

আছে পিসি ! বেটা ছেলে অমন কত পড়ে। হ্যাঁ, শোন ত তারপর নিতাই দাকে ঐ দুষ্টু ঘোড়ার পিঠে তুলে নিজেই তার লাগাম ধরে চালিয়ে সদরপুরের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করিয়ে দিয়ে এলুম। সেইজন্যই ত ফিরতে এত বিলম্ব হল। কিন্তু কাজটা কি খারাপ করেছি পিসি!

পূর্ববৎ গণ্ডে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করে বিস্ময়ের সুরে পিসি বললেন ঃ জানিনে বাছা, কি যে কাণ্ড তুমি কর, শুনলে আর জ্ঞান-গম্যি থাকে না। এখন মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে এস, কিছু মুখে দাও।

খিল খিল করে হেসে সেই হাসিমাখা মুখেই সাধনা তার শিশু ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু কিছু তোয়াজ করে নিজের ঘরের দিকে গেল বেশ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে। পিসিমাও তাড়াতাড়ি হেঁসেলের দিক ছুটলেন।

শ্রান্তি বা ক্লান্তির জন্য দৈনন্দিন কাজগুলি, মূলতুবী রাখবার পাত্রীই নয় সাধনা। যতক্ষণ সামর্থ থাকবে, ব্যবস্থানুযায়ী কাজগুলি তার সারা চাইই। গা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ঠাকুরঘরের পাট সেরে পড়ার ঘরে আসতেই পিসিমা তার সামনে এক বাটি দুধ ও জলখাবারের রেকাবীখানা রেখে মাথার দিব্যি দিয়ে গেলেন আগে সেগুলির সদ্ব্যবহার করে তার পর যেন পড়াতে বসে। তাঁর আবার দাঁড়াবার ফুরসদ নেই—উনানে তরকারির কড়া চাপিয়ে এসেছেন। খাবারগুলি ভাই ও ছাত্র-ছাত্রীদের ভাগ করে দিয়ে একটু মিষ্টি আর দুধটুকু খেয়ে নিল সাধনা।

এর পর কিছুক্ষণ পড়িয়ে, ছাত্র-ছাত্রীগুলিকে অঙ্ক দিয়ে, তাকে ছুটতে হলো রান্নাঘরে।

সব দিকেই এই মেয়েটির সমান দৃষ্টি, আর সেই অনুযায়ী আক্কেল বিবেচনা। নিষ্ঠাবতী বিধবাটি পরমাত্মীয়া সুবাদে তাদের সংসারভুক্তা হয়েছেন বলেই—তিনি যে একাই রান্নাঘরের সব কাজ করবেন, আর সাধনা পড়াশোনার ওজরে নির্লিপ্ত থাকবে, সেটি হবে না। সাধনার মতে, এ ঠিক নয়। তিনি যদিও প্রসন্ন মনে সব কাজ একাই করতে চান, তবুও সাধনা ভাবে—এটা অন্যায়। তাই একই সঙ্গে সবাইকে অঙ্ক কষতে দিয়ে এক দৌড়ে সে পিসিমার কাছে হাজির হয়ে, তাঁর হাতের কাজটি টেনে নিয়ে বলল: এবার একটু বসুনত, আমি এগুলো তাড়াতাড়ি সেরে ফেলি।

পিসিমাও তেমনি মেয়ে, কিছুতেই নড়বেন না। আবার সাধনারও দারুণ জিদ, কিছু না কিছু তাকে রাঁধতেই হবে; নৈলে কি করে শিখবে?

অগত্যা উভয়ের মধ্যে আপোষ হয়ে যায়। পিসিমা বললেন: ভ্যালা মেয়ে তুমি বাছা! দিনরাতই চর্কির মত ঘুরতে চাও, কাজ করে আর আশা মেটে না!

সাধনাও মুচকি হেসে উত্তর করল: এই আশীর্বাদ কর পিসি, কাজ করতে যেন কোন দিন হেলা না করি। হাত চললে দেহও চলবে, থামলেই সব বন্ধ হবে। তাইত ঋষিরা বলে গেছেন—'চলো, চলো, চলো।'

তাই বুঝি এই মেয়েটি চলতে এত ভালবাসে। যে গুরুর কাছে সে শিক্ষা পেয়েছে—মানুষের জীবনটাই একটা গতিশক্তি। এই চলার তালে তালে যুগও চলে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও যদি চলায় বিমুখ হয়, তাহলে তাকে হতে হবে হতশ্রী। আর, অধম ব্যক্তিও যদি অবিরাম গতিতে চলে, স্বয়ং ইন্দ্র হন তার চলার পথে সহায় ও সহচর। তাই ঋষিরা উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন—'চরই বতি, চরই বতি, চরই বতি।' চলো, চলো—এগিয়ে চলো।

রান্নাঘরের কাজের মধ্যেই সাধনা পিসিকে বড় বাড়ির হাবু বেচারার কথা ব'লে ভৃত্য নবদা'কে দিয়ে চুপি চুপি রাতের খাবার পাঠাবার ব্যবস্থাটি করতেও ভুলল না; সেই সঙ্গে নবদাকে ডেকে কি ভাবে গিয়ে হাবুলকে খাইয়ে আসবে, তার হদিশটিও বলে দিল। এর পর এক হাতে হ্যারিকেন লণ্ঠন, অপর হাতে একটা দণ্ড নিয়ে, বইয়ের দপ্তরটি কাঁধে ঝুলিয়ে তাকে পুনরায় রাতের পড়ার জন্য গুরুস্থানে পাড়ি দিতে হল। সন্ন্যাসী আনন্দস্বামী যে তার প্রতীক্ষায় থাকেন! পরিপূর্ণ একটি ঘণ্টা ধরে সেখানে চলে সংস্কৃত কাব্যের সাধনা। মথুরবাবু যেদিন রাড়িতে উপস্থিত থাকেন, সুধীর সাথী হয় দিদির। কিন্তু তিনি এ সময় বাইরে থাকলে সুধীরকে পিসির কাছে রেখে, সাধনা একাই বেরিয়ে পড়ে গুরুস্থান লক্ষ্য করে। চলার পথে তার কণ্ঠনিঃসৃত সংস্কৃত স্তোত্রধ্বনি রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দেয়—প্রত্যূষের মত এই পথের সন্নিহিত গৃহবাসীরাও উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

ষোল

আনন্দস্বামী উৎকণ্ঠিতভাবে সাধনার প্রতীক্ষা করছিলেন তাঁর আশ্রমে। রাত্রির প্রথম ভাগে ঠিক এই সময়েই উদাত্তকণ্ঠে মধুর স্তোত্রধ্বনিতে সারা পথ সচকিত করে সে আসবেই—ঝড়-বৃষ্টির দরুণ কোনও প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ তার এই আসাকে বিঘ্নিত করতে পারে না। বড়বাড়ীর সামনে নূতন ঘোড়াটাকে উপলক্ষ করে যে বিভ্রাট ঘটে, আনন্দস্বামী সে তথ্য জ্ঞাত হয়েছেন। এক্ষেত্রে নিতাই ছেলেটির দিক দিয়ে একটা দুর্ঘটনা যেমন স্বাভাবিক, সাধনার পক্ষেও তৎসম্পর্কে কোন নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নয়—সেটা উপলব্ধি করেই স্বামীজী সাধনার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। তিনি জানেন, সাধনা সেই প্রকৃতির মেয়ে—বিপন্নের প্রকৃতি যার কাছে বিচার্য নয়, মানবতার প্রেরণায় সাহায্য ও সেবা যেখানে প্রাকৃতিক ধর্ম। শৈশব থেকেই এই সেবা-ধর্ম তাকে দরদিনী ও প্রাণময়ী করে তুলেছে। জীব-মাত্রকেই ভালবাসতে শিখেছে বলেই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ঝাঁপিয়ে পড়ে—পথভ্রষ্ট মানুষের ভুলভ্রান্তি দেখিয়ে দিয়ে তাকে ভালো করবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে সে। তাই উদ্ধত ও আনাড়ী সওয়ারটির অনুসরণ করে ছুটতে হয়েছে সাধনাকে, এই খবরটি শুনে স্বামীজী যেমন আশ্বস্ত হন, তেমনি

একটা কৌতূহলও তাঁকে উদ্রিক্ত করে। বড়বাড়ীর বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে সাধনাকে মানিয়ে নিয়ে কি ভাবে চলতে হচ্ছে, সে সব ঘটনা তাঁর অবিদিত নয়। কিন্তু এদিন অকস্মাৎ যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, এবং ঘটনাচক্রে সাধনাও তাতে যেভাবে জড়িয়ে পড়ে তার ভিতর থেকে সসম্মানে বেরিয়ে আসার ব্যাপারেই তার কুমারী-জীবনের মস্ত একটা সমস্যা রয়েছে বুঝতে পেরেই স্বামীজীকে উদ্বিগ্ন হতে হয়েছে। তিনি যে সাধনাকে বর্তমানের প্রয়োজনানুসারে আদর্শ এক যুগ-কন্যা রূপে সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ দেখতে চান; তাই এদিনের আকস্মিক দুর্যোগটাকেই উপলক্ষ করে তার বুদ্ধিদীপ্ত চিত্তটির দিকে সমগ্র চিত্ত নিবদ্ধ করে সোৎসাহে প্রতীক্ষা করেছেন। সত্যই সাধনার কুমারীজীবনে কঠিন এক পরীক্ষা উপস্থিত।

বাইরে থেকে দক্ষিণের বাতাস পরিচিত কণ্ঠের মধুর অস্পষ্ট শব্দাংশ বহন করে আনন্দস্বামীর কর্ণকুহরে ছড়াতে লাগল নীরবে ও অতি সন্তর্পণে। তৎক্ষণাৎ তিনি সোজা হয়ে বসে—দ্বারের দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। একটু পরেই অভ্যস্ত কৌশলে তোরণদ্বার মুক্ত করে সাধনা প্রবেশ করল আশ্রম প্রাঙ্গণে। তারপর দ্বার বন্ধ করে হাতের লণ্ঠন ও লাঠি যথাস্থানে রেখে আসনোপবিষ্ট গুরুদেবকে নত হয়ে প্রণাম করল। তখনো তার কণ্ঠ থেকে স্নিগ্ধস্বরে পরমদেবতার উদ্দেশে উপনিষদের পরম স্তোত্রটি ঝংকৃত হচ্ছিল:

সুষারথির শ্বানিব যন্ মনুষ্যান্ নেনীয়তে
অভিশুভির্বাজিন ইব,
হৃৎপ্রতিষ্ঠং যং অজিরং জবিষ্ঠং
তন্মে মনঃ শিব সঙ্কল্পমস্তু।

দীর্ঘ হাতখানি আশীর্ব্বাদের ভঙ্গিতে ছাত্রীর মাথার উপর সস্নেহে রেখে উৎফুল্লমুখে আনন্দস্বামী বললেনঃ সত্যই আমাকে ধন্য করলে সরস্বতি!

সাধনার কোন বিশেষগুণে অভিভূত হলেই আনন্দস্বামী তাকে 'সরস্বতী' বলে সম্ভাষণ করে তৃপ্তি পান। এ রাত্রে এই সময়ে স্নেহধন্যা শিষ্যা যেন গুরুর অন্তর্নিহিত ভাবটি উপলব্ধি করেই ঠিক কালোপযোগী শ্লোকটির সুমধুর ঝংকার তুলে এক মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করল। তাঁর প্রশস্তিবাচনে ছাত্রাকে আরক্তমুখে নীরব দেখে তিনি পুনরায় সস্নেহে বললেন: যথার্থই বলছি সরস্বতি, তোমার কণ্ঠের গুণে শব্দগুলি যেন আমার কানে সুধাবর্ষণ করলে। হ্যাঁ, এর অর্থটিও ব্যক্ত করত সরস্বতি! অবশ্য, তুমি যেমন বুঝেছ।

গুরুর কথাটি সমাপ্ত হবার আগেই সাধনা তাড়াতাড়ি তেমনি স্নিগ্ধস্বরে স্মিতমুখে বলল: এই শক্ত শ্লোকটির মোটামুটি অর্থ হচ্ছে দাদু—নিপুণ চালাক যেমন লাগাম টেনে তেজী ঘোড়াকে আয়ত্তে রাখে, তেমনি আমার এই বেগবান মনটিকেও কাজে লাগাবার জন্য শুভ সঙ্কল্প তাকে চালনা করুক।

'সাধু, সাধু' বলে ছাত্রীকে উৎসাহ দিয়ে আনন্দস্বামী

বললেন : আমি তোমার সম্বন্ধে এই কথাই ভাবছিলুম সরস্বতি! আত্মবুদ্ধির আলোকে তুমি যখন অন্তর্দেবতাকে চিনতে পেরেছ, তখন যত বড বিপদ বা লাঞ্ছনা আসুক না কেন, তোমাকে হারাতে কিম্বা দাবাতে পারবে না। যাক, বেগবান ঘোড়াটির বল্গা ধরে আনাড়ী ও অনিপুণ সওয়ারটিকে কি ভাবে বাধ্য করে এসেছ, সেই কাহিনীটি তোমার মুখে শোনবার জন্মে বিকেল থেকে অধীর হয়ে আছি যে সরস্বতি! আশা করি, সে বেচারার মনটাও শুভসঙ্কল্পযুক্ত হয়েছে?

তেমনি স্মিতমুখে সাধনাও জিজ্ঞাসা করল : আপনি তাহলে ঘোড়ার ব্যাপারে সব খবর শুনেছেন দাহু?

আনন্দস্বামী স্নিগ্ধস্বরে উত্তর করলেন : তুমি ত জান সরস্বতী, মধুমতী গ্রামখানার প্রত্যন্তদেশের এই আশ্রম থেকে গ্রহণযোগ্য প্রত্যেক খবরটি আমাকে সংগ্রহ করতে হয়—শুধু তোমার জন্য?

বিস্ময়ের সুরে সাধনা শুধাল : আমার জন্য?

তেমনি স্নিগ্ধস্বরে আনন্দস্বামী উত্তর করলেন : হ্যাঁ—সরস্বতি! আগে গ্রামের সংবাদ, তারপর দেশের সংবাদ, শেষে সারা বিশ্বের সংবাদ সংগ্রহ করে তোমাকেই শুনিয়ে আসছি তোমার সেই শৈশব কাল থেকে।

সাধনা তাড়াতাড়ি অপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলল : আমিই ভুল করেছি দাহু, সেজন্য ক্ষমা করুন। সেইসব সংবাদের ব্যাখ্যা করে পাঠ্য-বইএর মত পড়িয়ে আপনি আমার জ্ঞানের পুঁজি

বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেই থেকে খবরের কাগজ পড়া যেন মৌতাতের মতন হয়েছে। এখন হয়ত একবেলা না খেলেও কষ্ট হয় না, কিন্তু দাদু, খবরের কাগজ পড়ে দুনিয়ার খবর না জানলে মন খুস খুস করে।

আনন্দস্বামী বললেন ঃ এখন স্থির হয়ে বসে প্রথমে তোমার ঐ ঘোড়ার পিছনে ছোটার কাহিনীটা আমাকে আগাগোড়া শুনিয়ে দাও। আমি জানি, যখন নিজেই শোনবার জন্য জিদ করছি, তুমি কিছুই বাড়িয়ে বলবে না, কিম্বা চেপে রাখবে না।

'আমার ওপর এ বিশ্বাস আপনার যে আছে—আমারও তা অজানা নয়। তাহলে, সবই বলছি দাদু! শেষ পর্যন্ত শুনে আপনাকেই বলতে হবে—ভুল বা অন্যায় করেছি কিনা।' আস্তে আস্তে পূজনীয় গুরুকে লক্ষ্য করে কথাগুলি বলে, সাধনা সেদিনের সমস্ত ঘটনা ঠিক যেন গল্পের মত করে আনন্দস্বামীকে শুনিয়ে দিয়ে শেষে বলল ঃ এত কাণ্ড ত হয়ে গেল দাদু, কিন্তু আমার কর্তব্য কাজগুলির কোনটিই বন্ধ করিনি, সব সেরে ঠিক সময়েই আপনার কাছে এসেছি। এখন আপনাকেই বিচার করতে হবে আমার কাজের।

আনন্দস্বামী তাঁর দুটো চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি স্নেহের ছাত্রীটির নির্মল মুখখানির উপর নিবদ্ধ করে সহর্ষে বললেন ঃ তোমার মুখে উপনিষদের শ্লোকটি শুনেই বুঝেছিলুম সরস্বতি—তোমার আত্মবুদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই জাগ্রত হয়েছে। মানুষের মনে যখন আত্মবুদ্ধির আলো পড়ে, তখন বুঝতে হবে অন্তর্দেবতাও

তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাকে ধরা দিয়েছেন। দেখ, সংসার-যাত্রায় দুঃখই মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে নানা আকারে। তারপর, হয় কোন প্রাকৃতিক কারণে কিম্বা মানসিক কোন নীতির দিক দিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষের জীবনে। তখন সংঘর্ষ সুরু হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের জীবনের সঙ্গে আত্মবুদ্ধির যোগ থাকলে, দুঃখ শত চেষ্টা করেও দাবাতে পারে না, ধৈর্য ও শৌর্যের সঙ্গে মানুষই তাকে জয় করে। জীবনের এই অবস্থাকেই বলা যায়—অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। কিন্তু এখানে মানতে হবে যে, এভাবে দুঃখকে জয় করবার যে শক্তি—সে প্রাকৃতিক নয়, মানসিক নয়, সে হচ্ছে—আত্মিক। সেখানেই সে তার অন্তর্দেবতার সঙ্গে যুক্ত। আমার আনন্দও এই জন্য সরস্বতি, তুমি এই বয়সেই আত্মোপলব্ধি করেছ—ত্বং হি দেবম্ আত্মবুদ্ধি প্রকাশম্ !—জেনেছ যে, আত্মবুদ্ধিতেই সেই দেবতার প্রকাশ, আর—আত্মবুদ্ধির দ্বারাই তাঁকে জানতে হবে। এই আত্মবুদ্ধিই তোমাকে বিপন্ন নিতাই ছেলেটির সম্বন্ধে সময়োচিত কর্তব্য-পালনের নির্দেশ দিয়েছে।

সাধনা নত হয়ে গুরুর চরণযুগলে তার খোঁপাবাঁধা মাথাটি ঠেকিয়ে সহর্ষে বলল : আমিও এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম দাদু—আমার কাজ মন্দ বা নিন্দিত নয় জেনে। কিন্তু দাদু, এখানেই এর শেষ নয়—

আনন্দস্বামীও সস্নেহে বললেন : সে আমি জেনেছি সরস্বতি! আমি আরও কিছু নূতন খবর তোমাকে দিচ্ছি,

তুমি হয়ত এখনো শোনবার সুযোগ পাওনি। তুমি হাসপাতাল থেকে চলে আসবার কিছু পরেই তোমার বাবা আর জেঠামণি সেখানে গিয়ে নিতাইকে দেখে যেমন স্তম্ভিত হন, নিতায়ের মুখেই তোমার বৃত্তান্ত শুনে তেমনি অবাক হয়ে যান। ওদিকে কাল সকালেই কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে পুনরায় আলোচনার কথা থাকায় ওঁরা বাড়ী না ফিরে ওখানকার কাছারীবাড়িতেই রাতটা কাটাবেন ঠিক করেছেন। কোচোয়ান গাড়ীতে ফটিক ঘোষালকে তুলে নিয়ে ফিরে এসেছে। তার আগেই তোমার কথায় বাড়ীর শিবু চাকর নিতাই চন্দ্রের খবরটা তার মাকে শোনায়। তাতে মা-ঠাকরুণ ব্যাপারটা উল্টো বুঝে কেঁদে-কেটে হাঁকডাকে আবল-তাবল বকে বাড়ি মাথায় করতে থাকেন— সেও এক বিপর্যয় কাণ্ড! তারপর ঘোষাল ফিরে এসে তাঁকে ঠাণ্ডা করে। দুঃখের অভিঘাত আসে দুটো অবস্থায়; হয় প্রাকৃতিক কারণে, নয়ত—মানসিক নীতির দিক দিয়ে। ঐ মহিলাটির মানসিক নীতিই ওখানে উৎপাতের সৃষ্টি করেছে। তবে ওটা বাহ্য—অন্তরের সঙ্গে ওর কোন যোগ নেই— অনেকটা লোক দেখানো ব্যাপার! এখন আমার আশঙ্কা হচ্ছে সরস্বতি—ওঁর ঐ অভিঘাত তোমার জীবনে হয়ত একটা আঘাত হেনে বিপর্যয় ঘটাবে। তবে, তোমার সম্বন্ধে আমি এই ভেবে নিশ্চিন্ত যে, অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের উপায় স্থির করে ফেলা তোমার পক্ষে কঠিন হবে না।

এরপর প্রজ্ঞা চেতনা ও শুভ-সংকল্প সম্পর্কেই আনন্দস্বামী

শিষ্যার সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। সাধনা লক্ষ্য করল, দুঃখবাদ ও অন্তর্দেবতার প্রভাব সম্পর্কে তার গুরু-দাদু তাকে উদাহরণ দিয়ে অনেক জ্ঞাতব্য কথা বলবার জন্য যেন ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। তিনি শিষ্যাকে বুঝাতে চান যে, ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ সংকটে পড়লে কখনই শংকিত হবে না, বাইরের কারও কাছে নালিশ করতেও যাবে না। কেন যাবে? সে জানে, দেবতা তার অন্তরের মধ্যে; সে দেখছে—অন্তর থেকেই তার দেবতা দুঃখের পর দুঃখের ভিতর দিয়ে তাকে এমন ভাবে ধন্য করছেন, যাতে সে নিজে ধন্য হচ্ছে, তার দুঃখও মহনীয় হয়ে তাকে সম্মানিত করছে। সে যে এখন দেবতার একাত্ম।

এ রাত্রির আলোচনার পর গুরুকে প্রণাম করে সাধনা যখন বিদায় নিয়ে বাড়িতে ফিরে চলল, কেবলই তার মনে হতে লাগল—আজকের এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে তার জীবনে কি সত্যই কোন বিপর্যয় ঘটবে? দাদু কি সেটা জানতে পেরেই হৃদয়স্থ দেবতাকে জাগ্রত করে তাঁকে একাত্ম করবার জন্য এভাবে উপদেশ দিলেন? তবে কি সত্যই অভাবনীয় কোন দুঃখ তার জীবনে বিপর্যয় ঘটাবার জন্য ধেয়ে আসছে? কে জানে!

সাধনা তখন একাগ্রচিত্তে অন্তর্দেবতার উদ্দেশেই গাঢ়স্বরে আবেদন জানাল—দাদুর কথাই সত্য হোক, যত দুঃখ, যত অন্যায়, যতকিছু উৎপীড়ন আসুক না কেন, আমাকে যেন তার জন্য বাইরের কারও কাছে নালিশ জানাতে ছুটতে না হয়,

আমি যেন আমার অন্তরের দেবতাকেই জাগ্রত করে বাইরের সব অন্তরায়কে ঠেকাতে পারি।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল এ সম্পর্কে কবিগুরুর একখানি প্রাসঙ্গিক গান। সাধনার সবচেয়ে প্রিয় এই গানখানি ; তার মনে হয়—গানের কথাগুলি যেন তার সঙ্গে কথা বলে, তারই অন্তরের ইচ্ছা মিশে যায় গানের কথা স্বর ও সুরের সঙ্গে। গাইতে গাইতে সে গৃহাভিমুখে চলতে থাকে :

"বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়॥
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ
এ নহে মোর প্রার্থনা,
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি,
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়॥

সতেরো

এ-অঞ্চলের প্রজা ও প্রজাপালদের জমিজেরাৎ-সম্পর্কে একটা পুরাতন গোলযোগের নিষ্পত্তির জন্যই জেলার কালেক্টর জমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে টাউনহলের সভায় আহ্বান করেছিলেন। ওদিকে সদরপুর দাতব্য হাসপাতালের পরিচালকগণও এই সুযোগে সায়াহ্নে কালেক্টর সাহেবকে প্রেসিডেণ্ট করে হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা কানাই চৌধুরীকে সম্বর্দ্ধনার বিশেষ ব্যবস্থা করেন। সাহেবও তাঁদের অনুষ্ঠানে যোগদানে সম্মতি দেন। কিন্তু টাউনহলের সভার কাজ তার আগে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই বুঝে, এখানকার সভা পরদিনের জন্য মুলতুবী রাখতে বাধ্য হোয়ে সাহেব সভাজনকে জানালেন : আরও খানিকটা সময় সভা চালিয়ে আমরা আজই ব্যাপারটা শেষ করতে পারতাম। কিন্তু ঠিক ছ'টায় হাসপাতালের সভায় যোগ দেবার জন্য আগেই কথা দিয়েছি, সম্ভবতঃ আপনারাও সেখানে যাবেন। এ অবস্থায় এখানকার মিটিং এখন মুলতুবী রাখা হচ্ছে, আগামীকাল সকাল আটটায় পুনরায় মিটিং আরম্ভ করে বারোটার মধ্যেই নিষ্পত্তি হবে আশা করি। কাল সকালে যখন মিটিং, এক্ষেত্রে আজকের রাতটা আমরা সদরপুরের ডাকবাংলোয় কাটাবার ব্যবস্থা করেছি। আপনারাও যদি থাকবার বন্দোবস্ত করতে পারেন, তাহলে কাল সকালে যথাসময় মিটিং-এ যোগ দেওয়া সম্ভব হবে।

সাহেবের যুক্তি অনেকেই গ্রহণ করলেন। অবিশ্যি—সদরপুরে যাঁদের থাকবার অসুবিধা নেই। আবার কেউ কেউ স্থির করলেন, হাসপাতালের উৎসবের পর বাড়িতেই ফিরবেন, সেখান থেকে প্রত্যূষেই রওয়ানা হয়ে মিটিং-এ যোগ দেবেন।

খানিক পরেই স্বেচ্ছাসেবকেরা মিছিল করে কালেক্টর সাহেব ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে হাসপাতালের উৎসবস্থলে নিয়ে এলেন। কিন্তু সভাস্থলে প্রবেশ করবার মুখেই হাসপাতালের একজন সেবিকা কানাই চৌধুরীকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে বলল : স্যার, আপনার ভাগনে খানিক আগে এখানে এমারজেন্সী রুমে ভর্তি হয়েছেন। আমরা তাঁর সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব যত্ন—

কানাইবাবু ও মথুরবাবু পাশাপাশিই ছিলেন। হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ শুনে দু'জনেই চমকে উঠলেন। নার্স টা বলে কি! সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে কথার মাঝেই কানাইবাবু বললেন : কার খবর তুমি কাকে দিচ্ছ? আমার ভাগনে ত মধুমতীর বড় বাড়িতে—

নার্স সবিনয়ে জানাল : আজ্ঞে সেখান থেকেই সিরিয়াসলি উন্‌ডেড্ হয়ে আসেন। একটি কিশোরী মেয়ে স্যার—তাঁর নাম মিস্ সাধনা। সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! একটা টাট্টু ঘোড়ার পীঠে ছেলেটিকে চাপিয়ে নিজেই ঘোড়া চালিয়ে এখানে আনেন স্যার! দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই।

কানাইবাবু এ অবস্থায় মুখখানা ঘুরিয়ে মথুরবাবুর দিকে

চকিতে চাইতেই উভয়ের চোখে চোখে সংযুক্ত দৃষ্টি সংবাদটাকে সমর্থন করল। মথুরবাবু মেয়েটিকে কিছু প্রশ্ন করতে মুখখানা তুলেছেন, এমন সময় একজন ডাক্তার দ্রুতপদে সেখানে এসে বললেন: মাপ করবেন স্যার, কোথায় সভায় বসিয়ে আপনাকে খাতির করব, তা নয়—বাড়ির য়্যাকসিডেণ্টের ব্যাপারে রোগীর কাছে নিয়ে যেতে হচ্ছে। আপনার ভাগনে ভারি অস্থির হয়ে উঠেছেন, কারও কথা শুনছেন না, কাউকে কেয়ার করছেন না, যে মেয়েটি তাঁকে এনেছিলেন—ক্রমাগত তাঁরই নাম ধরে চেঁচাচ্ছেন, তাঁকেই চাইছেন। আপনি দয়া করে এখনি—

কানাইবাবু সংযতকণ্ঠে বললেন: খুলে বল ত ডাক্তার—ব্যাপারটা কি?

ডাক্তার ব্যাকুলভাবে বললেন: আপনি আসুন স্যার, যেতে যেতেই বলছি আপনাকে।

সুতরাং ইঙ্গিতে মথুরবাবুকে আহ্বান করে কানাইবাবু ডাক্তারের সঙ্গে খবরটা শুনতে শুনতেই ভিতরে চললেন, মথুরবাবুও তাঁকে অনুসরণ করলেন।

ইতিমধ্যে এ খবরটা জানাজানি হওয়ায় সভাজনদের মধ্যে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠেছে। এমন কি, কালেক্টর সাহেবও সবিস্ময়ে শুনেছেন যে, যাঁর দানে এই হাসপাতালটির প্রতিষ্ঠা, যাঁকে সম্বর্দ্ধনা করবার জন্য তিনিই মুখপাত্র হয়ে এসেছেন, সেই বদান্য ব্যক্তি কানাই চৌধুরীর ভাগনে আহত অবস্থায় এখানকার

বেড়ে ভর্তি হয়েছেন, কানাইবাবু এর বিন্দু-বিসর্গও জানেন না, এখানে এসেই খবরটা শুনে তাকে দেখতে গেছেন। এই সূত্রে একটি কিশোরী মেয়ে আহত ছেলেটিকে ঘোড়ার পীঠে তুলে যেভাবে লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে এনেছে, সে কথাও সভাজনের সঙ্গে কালেক্টর সাহেব শুনেছেন। একে জেলার শাসক, তার উপর এমন একটা দুঃসংবাদ; কর্তব্য-সচেতন জাতির পক্ষে আর নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভব হোল না—তৎক্ষণাৎ সাহেবও আহত ছেলেটিকে দেখবার জন্য সদলবলে হাসপাতাল ভবনে প্রবেশ করলেন।

ইনজেকসন দেবার পর নিতাই কিছুক্ষণের জন্য আচ্ছন্নের মত নীরব থাকে। সেই জন্যই সাধনার পক্ষে তখন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু সেই ভাবটা কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে সাধনার সন্ধান করে। নার্স ও ডাক্তার যতই তাকে শান্ত করতে সচেষ্ট হন, নিতায়ের উত্তেজনা ততই উগ্র হয়ে ওঠে। অনুরোধ, মিনতি, সতর্কতা সব কিছু উপেক্ষা করে পাগলের মত অনবরত সে চীৎকার করতে থাকে: সাধনা এসো, সাধনা এসো। তুমি না এলে আমি চলে যাবো—থাকবো না এখানে, আমি যাবো। তুমি এসো, সাধনা—সাধনা—

ডাক্তারের সঙ্গে কানাইবাবুরা কক্ষে এসেই নিতায়ের এইভাবে অস্থিরতা দেখে এবং সেই সঙ্গে সাধনার নাম ধরে তারস্বরে চীৎকার শুনে স্তম্ভিত হলেন। ডাক্তার বললেন:

পায়ে জবর ব্যাণ্ডেজ, তার ওপর দারুণ ব্যথা, নতুবা ওকে শুইয়ে রাখা সম্ভব হোতনা ; সামর্থ থাকলে লাফিয়ে পড়ত, সে অবস্থায় বেঁধে রাখা ভিন্ন এ রোগীকে সামলানো যেতো না।

যাই হোক, কানাইবাবু সাড়া দিয়ে সামনে দাঁড়াতেই রোগীর উগ্রভাব তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কে বলবে, একটু আগেই এই অস্থির ছেলেটিই চীৎকারে ঘরখানা কাঁপিয়ে তুলেছিল।

উপরে আসতে আসতেই ডাক্তারের কাছে রোগীর বর্তমান অবস্থাটা জেনেছিলেন কানাইবাবুরা। সেই একই কথা—যন্ত্র-পাতির সাহায্যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত আঘাতপ্রাপ্ত পায়ের সঠিক অবস্থা এখন জানানো সম্ভব নয়। যন্ত্রণা উপশমের জন্য সম্ভবমত ব্যবস্থা অবশ্য করা হয়েছে।

মথুরবাবুর সঙ্গে মামাকে দেখে নিতাই প্রথমে বালিশে মুখখানা গুঁজে নীরব থাকে। তারপরই মামার প্রশ্নে সে দোষটা সমস্তই নিজের স্কন্ধে নিয়ে এক নিশ্বাসে শুনিয়ে দিল যে, ঘোড়াটাকে দেখেই আহ্লাদে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে তার পিঠে চড়ে বসেছিল। হেবো প্রথমে ঘোড়ার লাগাম ধরে নিয়ে যায়, কিন্তু সেটা ভালো দেখায় না ভেবে, সে লাগামটা কেড়ে নিয়ে জোরে জোরে চাবুক কষিয়ে দেয় ঘোড়ার পিঠে, ঘোড়াও ক্ষেপে উঠে ছুটতে থাকে। কিছুতেই সে তাকে ফেরাতে বা থামাতে পারে না—মাঝ পথে একটা হাটের কাছে এসেই, টাল

সামলাতে না পেরে ঘোড়া থেকে সে পড়ে যায়। ঠিক সেই সময় সাধনা এসে পড়ে। আনাড়ী সওয়ারকে পীঠে নিয়ে ঘোড়া ছুটেছে দেখেই সেও মেঠো রাস্তা দিয়ে ঘোড়ার সামনে গিয়ে তাকে রোখবার মতলব করেছিল। সেটা সার্থক না হলেও সে-যে তার জন্যেই বেঁচে গেছে তাতে ভুল নেই। তারপর, সাধনার সেবা-শুশ্রূষা ও তাকে ঘোড়ার পীঠে তুলে নিয়ে হাসপাতালে আনার কথা সবই সংক্ষেপে বলে শেষে আক্ষেপ করল: কিন্তু আমার ভারি দুঃখ্যু হয়েছে—এখানে চিকিৎসার বন্দোবস্ত সব করে দিয়ে আমাকে কিছু না বলেই সে কিনা চলে গেছে!

যে সুদর্শনা তরুণী নার্সটি এখানে মোতায়েন ছিল আগে থেকেই, সে এই সময় বলল: ইনজেকসন দিতেই তুমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলে যে! তাকেও তো বাড়িতে ফিরে গিয়ে খবর দিতে হবে; তারপর আমার উপরে তোমার সেবা-শুশ্রূষার ভার পড়েছে দেখেই সে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যায়। এত কম বয়সে বাঙালী ঘরের মেয়ের আক্কেল-বিবেচনা আর সাহস দেখে আমরা অবাক হয়ে গেছি।

এই সময় কালেক্টর সাহেবও রোগীর বিছানার কাছে এসে কানাইবাবুকে বললেন: মিষ্টার চৌধুরী, একেই বলে অদৃষ্টের খেলা। এরা কোথায় আপনাকে অনার দেবে, আপনার বদান্যতার কথা বলবে, আমিও সেই সঙ্গে আপনার আদর্শ অনুসরণ করবার জন্য দেশের ল্যাণ্ডলর্ডদের উদ্বুদ্ধ করব, এমনি

সময় এই কাণ্ড! অনার নিতে এসে আপনি দেখলেন—আপনারই বাড়ির ছেলে এমারজেন্সী রুমে শয্যাশায়ী! কিন্তু ব্যাপারটা যা শুনলাম, ভারি ইণ্টারেষ্টিং মনে হচ্ছে যে! একটি দুঃসাহসিকা মেয়ে নাকি এই বয়কে উদ্ধার করে ঘোড়ার পীঠে তুলে এখানে এনেছে! এ যে সত্যিই আশ্চর্য হবার কথা মিঃ চৌধুরী!

কানাইবাবু সংক্ষেপে ঘটনাটির কথা সাহেবকে শুনিয়ে দিলেন—যেমন এই মাত্র শুনেছেন নিতায়ের মুখে। সাহেব তো এই বয়সের এক বাঙালী মেয়ের দুঃসাহসের কথা—বিশেষ করে তার ঘোড়া-চালানোর ব্যাপারটা শুনে চমকে বললেন: কলকাতা সহরেও এ পর্য্যন্ত এমন কোন বাঙালী কিশোরীকে দেখিনি—যে ঘোড়ায় চড়তে পারে, এবং একটা উন্‌ডেড্‌ ম্যানকে সেই ঘোড়ায় তুলে নিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়! আচ্ছা, মেয়েটি কি আপনারই ফ্যামিলির কেউ?

কানাইবাবু এক্ষেত্রে মথুরবাবুকেও টানতে বাধ্য হলেন। টাউন হলেই সাহেব মথুরবাবুর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। এখন সেই দুঃসাহসিকা কন্যাটি জমিদারী-সেরেস্তার এ-হেন শক্ত মানুষটির উপযুক্তা কন্যা শুনে আনন্দে আর একবার তাঁর করমর্দ্দন করলেন এবং সেই সঙ্গে পীঠ চাপড়ে শয্যাশায়ী নিতাইকে উৎসাহ দিলেন সাহেব। এই সময় উদ্যোক্তাগণ এসে এঁদের সকলকে আবার সভা-মণ্ডপে নিয়ে গেলেন।

সেখানে সভাপতির ভাষণে সাহেব আদর্শ ভূস্বামী কানাই

চৌধুরীর বদান্যতা প্রসঙ্গে প্রশস্তিবাচনের সঙ্গে তাঁর ভাগনের আরোগ্য কামনা তো করলেনই, অধিকন্তু তাঁর ষ্টেটের দেওয়ান মথুরবাবুর অশ্বারোহিণী মেয়েটির সম্বন্ধেও উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বাহবা দিলেন।

সভাভঙ্গের পর হাসপাতালের পরিচালক-ডাক্তার মিঃ রায়-চৌধুরী কানাই বাবুকে জানালেন যে, এক ঘণ্টার মধ্যেই জেলার সদর থেকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এখানে এসে পড়ছেন ; সুতরাং তাঁদের থাকা বিশেষ প্রয়োজন। এই সময় গো-যানে ফটিক ঘোষালও এসে পড়লেন এবং কানাইবাবু তাঁর মুখে শুনলেন যে, তিনি যখন বড়বাড়ি থেকে রওয়ানা হন, তখনো নিতাইবাবুর সম্পর্কে দুর্ঘটনার কথা নীরদা দেবী শোনেন নি। এই সূত্রে অতিরঞ্জিত সংবাদ পরিবেষণে অভ্যস্ত ঘোষাল সরোদনে নিবেদন করলেন : এ খবর শুনে বড়বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে হুজুর ! দিদিরাণীকে সামলে রাখা কঠিন হয়েছে। তিনিও আমার সঙ্গে এখানে আসতে চাইছিলেন, অনেক ব'লে ক'য়ে তাঁকে নিবৃত্ত ক'রে খবর নিতে আমাকে এভাবে আসতে হয়েছে হুজুর !

ঘোষালকে পেয়ে কানাই বাবু কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। এর পর এখানকার খবর দিয়ে তাঁকেই বাড়ির গাড়ীতে তাড়া-তাড়ি ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেন। বললেন : নীরুকে চিন্তা করতে নিষেধ করবেন। বলবেন যে, ভয়ের কিছু নেই। নিজের দোষেই নিতাই ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে চোট খেয়েছে।

সাধনাই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে গেছে। জেলার সদর থেকে বড় ডাক্তার আসছেন ওকে ভালো করে দেখবেন বলে, সেই জন্যেই আমরা এখানকার কাছারী বাড়িতে রাতটা কাটাব—সকালেই আবার মিটিং আছে কিনা! বেলা দশটার পর টাউন হলে যেন গাড়ী পাঠানো হয়।

ফটিক ঘোষাল কথাগুলি মনে মনে কণ্ঠস্থ করে নিলেও, দিদিরাণীর সামনে দাঁড়িয়ে শোনা কথাগুলির কোন্ কোন্ অংশে কি পরিমাণে খাদ মিশিয়ে পরিবেষণ করবেন, শুনতে শুনতেই তার একটা পরিকল্পনা মস্তিষ্ক মধ্যে ছকে ফেলেন। এখন প্রয়োজন শুধু দিদিরাণীর আদুরে দুলালটির এখানকার অবস্থাটা একবার চাক্ষুষ দেখে মাথার পরিকল্পনাটিকে বাস্তবের ভিত্তিতে পরিপুষ্ট করে নেওয়া। সুতরাং মনের ইচ্ছাটি প্রকাশ করা মাত্রই কানাইবাবু বললেন: বেশ ত, এমার্জেন্সী রুমে গিয়ে দেখে আসুন তাকে—নীরুকে বলতে পারবেন, এরা কি রকম তোয়াজে তার ছেলেকে এখানে রেখেছে।

এরপর ঘরখানা খুঁজে নিয়ে নিতায়ের সঙ্গে দেখা করতে ফটিক ঘোষালকে কোন অসুবিধা ভোগ করতে হলো না। দেখলেন, ভালো ঘরে স্বতন্ত্রভাবে নিতাইকে এঁরা কত আরামে রেখেছেন। ভালো তক্তপোষের উপর নূতন পরিচ্ছন্ন শয্যা, আশে-পাশে ব্যবহার্য সামগ্রী-সম্ভার সাজানো, উপরন্তু একজন সুদর্শনা তরুণী নার্স রোগীর বিছানার কাছে টুলের উপর বসে পাহারা দিচ্ছে।

শয্যাশায়ী নিতাইকে দেখেই ফটিক ঘোষাল মেয়েমানুষের মত ফুঁফিয়ে কেঁদে ফেললেন। নার্স হতচকিত হয়ে বলে উঠল: একি, এমন করে কাঁদছেন কেন?

ঘোষালের কান্না দেখে নিতাই কষ্টে হাসি চেপে নার্সকে বলল: আমার পায়ের ব্যাণ্ডেজ দেখে হয়ত ভেবেছেন, পা'টা সত্যিই ভেঙে গেছে!

কোঁচার খুঁটে চোখের জল মুছতে মুছতে ঘোষাল বললেন: বাঁচলুম বাবা, ত'াহলে পা ভাঙেনি! ভগবান রক্ষা করেছেন। কিন্তু কি-রকম পেজোমি বলত বাবাজী! ঘোড়াটাকে সবাই মিলে বিগড়ে দিতেই তো…

আবার কি ভেবে ঝাঁ করে কথাটা চাপা দিয়ে বললে: যাইহোক, ভেবনা বাবাজী! আমি খবর নিয়ে যাচ্ছি, দিদিরাণী তো সেখানে হা-পিত্তেশ হয়ে ঘরবার করছেন!

একটুতে উতলা হয়ে ওঠা, তিলকে তাল করে তোলা—এই মানুষটির যে মস্ত মুদ্রাদোষ, নিতায়ের মত ছেলেও সেটা ভাল-ভাবেই জানে, তাই এ লোকের সান্নিধ্য এড়াবার উদ্দেশ্যেই সে ব্যগ্রভাবে বলল: হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি শীগগীর বাড়ী ফিরে যান—মা সত্যিই খুব ভাবছেন। তাঁকে বলবেন, ভাবনার কিছু নেই। আর দেখছেন তো—এঁরা কি রকম আরামে আমাকে রেখেছেন!

'রাখবে না! এঁরা কি জানেন না—তুমি বাবাজী মানুষটা কে! কার ছেলে, কার ভাগনে! বিশখানা গাঁয়ের লোক

খবর শুনে হৈ হৈ করে উঠেছে। আচ্ছা—বাবাজী, আমি তাহলে এখন চলি !' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি জায়গায় জায়গায় গমক দিয়ে বলে ফটিক ঘোষাল সত্যই চলে গেলেন।

নার্স মেয়েটি অবাক হয়ে এই বিচিত্র মানুষটির কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনতে শুনতে বক্তার চেহারাখানিও দেখছিল। ফটিক ঘোষালের প্রস্থানের পর সে নিতাইকে জিজ্ঞাসা করল : ইনি ?

নিতাই বলল : আমাদের সেরেস্তার নায়েব। ভারি হিসিবি মানুষ, তবে কথাগুলো বড়্ডো ফেনিয়ে বলেন, এই দোষ। এঁর আবার একটি মেয়ে আছে—কথায় বাপকেও হারিয়ে দেয়।

মেয়েটি কত বড় ?

যে মেয়েটি আমাকে এনেছিল তারই মত।

মুচকি হেসে নার্স বলল : সেই তুরুক-সওয়ারনী ?

নিতাই গম্ভীরমুখে জবাব দিল : হ্যাঁ, কিন্তু তুমি পার ঐ মেয়েটির মতন ঘোড়ায় চেপে আমার মত একটা ছেলেকে সামলে নিয়ে আসতে ?

মুখে আতঙ্কের ভঙ্গি ফুটিয়ে নার্স বলল : রক্ষে করো—আমি চড়ব ঘোড়ায় ? বলে, ঘোড়ার গায়েই বড় হাত দিতে পারি !

নিতাই একটু খোঁচা দিয়ে বলল : কিন্তু তোমার চেয়ে কত ছোট্ট ঐ মেয়েটি, কি রকম তুখোড় বল দেখি !

চোখে মুখে বিস্ময়ের ভঙ্গি ফুটিয়ে নার্স বলল: বাব্বা! আমি ত একটা নার্স, আমার বলার কি আছে, স্যারেরা পর্য্যন্ত দেখে চোখগুলো কপালে তুলেছেন। কালেক্‌টার সাহেব তো দেখেননি, তবু শুনেই থ্যাঙ্কস্ দিলেন। জাঁহাবাজ মেয়ে বাবা! আচ্ছা, তোমার সঙ্গে ওর কি সম্বন্ধ?

নিতাই মনে মনে একটু ভেবে ঝাঁ করে বলল: আদা আর কাঁচকলায় যে সম্বন্ধ—তাই ছিল আগে। কিন্তু এখন—

মুখ টিপে হেসে নার্স বলল: সোনায় সোহাগা হয়েছে—কেমন?

'ধ্যেৎ! তুমি বড় দুষ্টু।' বলেই নিতাই শয্যাপার্শ্বে টুলটির উপর উপবিষ্টা তরুণী নার্সের সুন্দর মুখখানার উপর কৃত্রিম কোপদৃষ্টিতে তাকাল।

কুড়ি একুশ বছরের এই মেয়েটি প্রতিষ্ঠানটির প্রবীণ পরিচালক ডাক্তার হিতেন রায় চৌধুরীর প্রচেষ্টায় 'ধাত্রীবিদ্যায়' উত্তীর্ণা হয়ে এখানেই কাজ পেয়েছে। মেয়েটির কর্তব্যজ্ঞান ও পরিচর্যাপটুতায় সকলেই সন্তুষ্ট। দিদির মত আদর ও স্নেহে নিতায়ের মত অশিষ্ট ছেলেকেও সে বাধ্য করে ফেলেছে। এইখানেই তার কৃতিত্ব। তার নাম ললিতা রায়। কিন্তু সে মিস লিলি নামেই এখানে পরিচিতা।

আঠারো

ফটিক ঘোষালকে নীরদা ঠাকরুণই গো-যানে সদরে দাদার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—ঘোড়ায় চড়ে ছেলের নিরুদ্দেশ হবার খবরটা তাঁকে দেবার জন্যে। কেননা, তার পরবর্তী কোন খবরই তিনি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত পান নি। ফটিক ঘোষালকে তিনি বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন—পাঠশালার দজ্জাল ছোঁড়া-ছুঁড়িগুলোর বেয়াদপির জন্যেই এ কাণ্ড ঘটে, আর সাধিই তাদের নাচায়—এ কথাটা যেন ভালো করে তাঁকে জানিয়ে দেয়। সাধিও টস্ দেখিয়ে ঘোড়ার পিছনে পিছনে নাকি ছুটে গেছে। তাতে তাঁর বিশ্বাস, ঐ বাবা-নাচুনে মেয়ে সদরেই গেছে আগে থেকে নিজের দোষ কাটাবার মতলব নিয়ে। দাদা যাতে সাধির কথায় বিশ্বাস না করেন, এ কথাও ফটিক ঘোষালকে চুপি চুপি জানাতে বলে দেন এবং সেই সঙ্গে এ কথাটিও বলতে ভুলেননি যে, এর পর যদি পথেই তিনি দেখেন কর্তা ফিরছেন, তাহলে সেইখানেই তাঁকে খবর দেবেন, তারপর দাদা যা বলবেন—সেই মত কাজই যেন করেন তিনি।

দুর্গা নাম স্মরণ করে ফটিক ঘোষাল বেরিয়ে পড়লেও, নীরদাদেবীর বৈঠক তখনো ভেঙ্গে পড়েনি—বরং আরো জেঁকে ওঠে। আলোচনা ক্রমে ছেলের ব্যাপারটাকে অতিক্রম করে পাঠশালার ছেলেমেয়েগুলোকে সায়েস্তা করা এবং এদের

ছুকরি মাষ্টারনী সাধ্বিকেও সেই সঙ্গে জব্দ করবার জন্যে রীতিমত একটা হিংসাত্মক পর্য্যায়ে এসে ঘরের বাতাসকে পর্য্যন্ত প্রতপ্ত করে তোলে। এমনি সময় বড় বাড়ির পুরাতন প্রবীণ ভৃত্য শিবকুমার এসে যেই ব্যাকুলভাবে ক্লিষ্টকণ্ঠে ঠাকরুণকে সাধনার নির্দেশমত ঘোড়া থেকে খোকাবাবুর পড়ে যাওয়া এবং সেই দুর্ঘটনা থেকে উদ্ধার করে তাকে সদরের হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে আসার খবরটা দিল, সেই সঙ্গে যেন অতি সাংঘাতিক কোন মারাত্মক বিপদ্‌প্রাপ্তির মত নিদারুণ এক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো ঘরখানির ভিতরে।

নীরদা বসেছিলেন—তক্তপোষের উপর বিছানো একখানা রঙ্গিন সুতান্‌চির উপরে। ছেলে ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে, সেখান থেকে তাকে সদরপুরের হাসপাতালে চালান করে দেওয়া হয়েছে এবং সাধ্বিই সে খবরটা দিয়ে গেছে—এটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপর থেকে ধড়াস করে মেঝের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দেহের সমস্ত শক্তি গলায় এনে আর্তনাদ তুললেন: ওরে বাবারে! এ কি সর্বনাশ আমার হলোরে! ওরে—কেন আমি এই শত্রুপুরীতে হত্যে হবার জন্যে এসেছিনু রে! ওগো দাদা—দুধ কলা দিয়ে কি কালনাগিণী পুষেছ গো তুমি!

বিনিয়ে বিনিয়ে কথাগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিলাপের সুরে বলার সঙ্গে সঙ্গে সাধনা, তার বৃদ্ধ পিতা ও বালক ভ্রাতাকে উদ্দেশ করে অশ্রাব্য কুবচন প্রয়োগ দ্বারা পুত্রব্যথাতুরা নারী

যেভাবে নিদারুণ একটা দৃশ্যের সৃষ্টি করলেন, পুত্রবতী নারী মোক্ষদা এবং মহানগরী কলকাতার আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত নিধান, রমেশ ও স্বপ্না পর্য্যন্ত বুঝি বিস্ময়ে কাঠ হয়ে চেয়ে রইল। সত্যই, মোক্ষদা দেবী লাগানি-ভাঙানিতে যত বড় নিপুণাই হোন, এভাবে শাপমন্যি দিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নাকাটির সাধনা করেন নি কোনদিন। এমন কি, তাঁর স্বপ্না মেয়েটি এই বয়সেই দেখে শুনে ও শিখে ব্যাপকপনার সঙ্গে নানা দোষে পটিয়সী হোয়েও বড় বাড়ীর এই মা-মণির কাণ্ড দেখে প্রথমে ঘাবড়ে যায় এবং তারপর হাসি চেপে রাখা তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠে। কিন্তু ওদিকে মায়ের চোখের ভ্রূকুটি চোখে পড়তেই তৎক্ষণাৎ আঁচলে মুখ চেপে পালিয়ে গিয়ে বাঁচে। মোক্ষদাই একলা মুখখানা কাঁচুমাচু করে জোর করে নীরদার চোখে মুখে জলের ঝাপটার সঙ্গে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। খানিক পরে কান্নার নিবৃত্তি হলো বটে, কিন্তু আর্তকণ্ঠের বাক্যগুলি কর্কশ তর্জ্জনের আবেষ্টনে ভীষণ হ'য়ে ঠাকরুণের ক্রন্দসী মুখখানাকেও বীভৎস করে তুললো।

স্বামীজীর আশ্রম থেকে বাড়ি ফিরেই সাধনা প্রথমেই গৃহ-ভৃত্য নবদাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল যে, নব তার নির্দ্দেশ মত কর্তা বাবুর খাস চাকর শিবু খুড়োকে হাত করে চুপিসাড়ে হাবুলকে খাইয়ে এসেছে। নির্বিঘ্নে কাজটি সম্পন্ন

হয়েছে শুনেই মনটি তার পরম পরিতৃপ্তিতে ভরে গেল! এমন কি, একটু পরেই নব যখন পিসিমার অজ্ঞাতে সাধনাকে চুপি চুপি শুনিয়ে দিল—ঘোষাল মশাই ফিরে এসে কি কয়েছেন কে জানে! কিন্তু দিদি ঠাকরুণের মেজাজ ত নরম হয়ই নি, বরং বেজায় চড়ে উঠেছে! ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকার ঘরে খেতে খেতে হাবুল নবকে বলেছে—খবরদার! সাধনা-দি'কে বলবে নবদাদাভাই, কর্তাবাবু ফিরে না আসা পর্য্যন্ত দিদিমণি যেন বড়বাড়ি-মুখো না হন—দিদি ঠাকরোণ গায়ে যেন কেরোসিন তেল ঢেলে বসে আছেন গো—ওঁরে দেখলেই লঙ্কাকাণ্ড বাধাতে কসুর করবেন নি! কিন্তু এমন একটা অপ্রীতিতিকর খবরও সাধনার চিত্তের পরিতৃপ্তির কাছে ম্লান হয়ে গেল! যদি সে বাড়িতে ফিরে এসে শুনত, তার চাল ব্যর্থ হয়ে গেছে, হাবুলের মুখ থেকে খাবার কেড়ে নিয়ে পিসিমা ফেলে দিতে বেচারী অভুক্ত আছে—তাহলে সে কি খাবার ঘরে খাবার আশায় সেঁধুতে পারত! হয়ত, তার এই শান্ত কোমল মূর্তি তখনি পাল্‌টে যেত—ছুটতে হতো নিজের খাবার নিয়ে বড় বাড়ির সেই দুর্গত ভৃত্য-বেচারার সামনে বসে তাকে খাইয়ে দেবার উদ্দেশ্যে। ও-বাড়ির পিসিও তখন প্রত্যক্ষ করতেন প্রতি পদে সহনশীলা পিছিয়ে-পড়া সেই শান্তশিষ্টা ভীরু প্রকৃতি মেয়েটির আর এক তেজস্বিনী মূর্তি। সাধনা করযোড়ে তার অন্তর্দেবতাকে প্রণাম করে আপন মনেই বিড়বিড় করে বলল: তুমিই বাঁচিয়েছ ঠাকুর, তুমিই সত্য।

নিয়ম ও সময় ধরে কাজ করা সাধনার বরাবরের অভ্যাস, কোনক্রমে একটুও এদিক-ওদিক হবার জো নেই। আগের দিনের অত হাঙ্গামার পর এদিনও অন্যান্য দিনের মতনই সে বড় বাড়ির দেউড়ির কাছে এসেই থমকে দাঁড়াল। দেউড়ির পাশ দিয়ে খানিকটা গেলেই প্রাচীর ঘেরা বারমহল—এই-দিকেই আস্তাবল, গাড়ী ঘোড়া ও কোচোয়ান সহিসদের আস্তানা। বড়বাড়ির কাছে আসতেই ঘোড়ার কথাটা তার মনে পড়ে গেল। সকালে বাড়ি থেকেই নবদা'কে কোচোয়ানের কাছে পাঠিয়ে নূতন ঘোড়াটার দলাই মলাই ও খাবার তদ্বির করবার কথা সে বলে দিয়েছিল। হয়ত এর প্রয়োজন ছিল না, কোচোয়ানের যখন করণীয় কাজ; তথাপি সাধনা এ সম্বন্ধে অবহিত না হয়ে পারে নি। পূর্বাহ্ণে জানিয়ে দেওয়া সত্বেও বড়বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে স্বচক্ষে ঘোড়াটার অবস্থা দেখবার জন্য সাধনা বারমহলে সেঁধুলো। কোচোয়ান তখন সদরে রওয়ানা হ'বার জন্য ঘোড়াকে সাজ পরাতে ব্যস্ত। সাধনাকে দেখেই সেলাম করে জানাল যে, নয়া ঘোড়ার কোন তগলিফ হয়নি; বহুৎ আরামে সে আছে—তাকে দেখলেই দিদিজীর মালুম হবে।

ভিতরে গিয়ে সাধনা দেখল, ঘোড়াকে আর এক দফা ভিজা ছোলা খেতে দেওয়া হয়েছে। ছোলার থলে ঘোড়ার মুখে ঝুলছে। সাধনার সাড়া পেয়ে সেই অবস্থায় ঘোড়াটা কান দুটো খাড়া করে তার পানে থলি-বাঁধা মুখে তাকাল, মুখ

থেকে একটা আওয়াজও বেরিয়ে এল, সেটা আনন্দের অভিব্যক্তি।

এগিয়ে গিয়ে সাধনা আস্তে আস্তে তার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে সস্নেহে ডাকল: খবর ভালো ত বিজলী—তবিয়ত আচ্ছি?

সঙ্গে সঙ্গে কোচোয়ানকে ডেকে বলল: ঘোড়াটার আমি নাম রেখেছি—বিজলী, ইয়াদ থাকবে ত?

'জরুর' বলেই মাথা নীচু করে কোচোয়ান বিনীতভাবে জবাব দিল। এ মহলেও সাধনা মেয়েটি সকলের পরিচিতা এবং তাকে 'আজব লেড়কী' জেনে সকলেই শ্রদ্ধা করে। তাদের প্রত্যেকের অভিবাদন নিয়ে ও শিষ্টভাবে প্রত্যাভিবাদন জানিয়ে সাধনা ফিরে এসে বড় বাড়ির দেউড়ি দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল।

উঠানে তখন ছাত্র-ছাত্রীরা দল বেঁধে খেলায় ব্যস্ত। যেহেতু, পাঠশালার শিক্ষকরা তখনো আসেননি, পড়াও আরম্ভ হয়নি। সাধনাকে দেখেই সকলে খেলায় নিরস্ত হয়ে চারদিক দিয়ে ঘিরে দাঁড়াল। সবাই জানতে ব্যগ্র—কালকের সেই ঘোড়দৌড়ের পর কি কাণ্ড হলো, কি করে খোকাবাবু পড়ে গেল, আর সাধনাদি' তাকে কি ভাবে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

সাধনা বুঝল, কালকের খবর পাড়ায় রাষ্ট্র হতে আর বাকি নেই। গম্ভীরভাবে শুধু বলল: সবই যখন শুনেছ, আবার জিজ্ঞাসা করছ কেন? খোকাবাবু সেরে-সুরে বাড়ি এলে তাঁর কাছ থেকেই সব শুনতে পাবে।

এই সময় ছেলেমেয়েদের উভয় বিভাগের শিক্ষক মশাই-রাও এসে পড়লেন। তাঁরাও আজ বিস্ময়ানন্দে সাধনার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। সেই হাসিই যেন সাধনার দুঃসাহসিক কর্মের প্রশস্তি জ্ঞাপন করল।

পাঠশালার প্রাথমিক কাজের পর দুই পণ্ডিতই দু'দিক থেকে সাধনাকে আগের দিনের দুর্ঘটনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে থাকায়, খুব সংক্ষেপেই সে ঘটনাটির বৃত্তান্ত ব্যক্ত করতে বাধ্য হ'ল। ইতিমধ্যে দালানের পাশের দিকে যে দরজাটি বরাবর ভিতর থেকেই বন্ধ থাকে, হঠাৎ সশব্দে খুলে গেল এবং কাল-বৈশাখীর উদ্দাম ঝাপটার মত নীরদা ঠাকরুণ সবেগে দালানে এসে দাঁড়ালেন।

তাঁর হিংস্র মূর্তি ও মারমুখী ভঙ্গি ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের শিক্ষক দুটি, এমন কি—সাধনাকে পর্য্যন্ত হতচকিত করে দিল।

পূজার দালানের পাঠশালায় বড় বাড়ির বড় কর্তার ভগিনীর এভাবে এসে দাঁড়ানো অপ্রত্যাশিত ব্যাপার বলেই এমন একটা হতচকিত ভাব পাঠশালার প্রত্যেকের মুখেই প্রকাশ পেল। আগের দিনের ঘটনার পর থেকেই সাধনা খুব সন্তর্পণেই নীরদা ঠাকরুণের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে তফাতে রেখে চলেছে। নানা সূত্রেই তার মত মনস্বিনী মেয়ে বুঝতে পেরেছিল যে, নীরদা পিসি তাকেই যখন ঐ অনর্থের জন্য দায়ী ও অপরাধিনী স্থির করে রেখেছেন, তখন তাঁর ছেলে কিম্বা জেঠামণি এ বাড়িতে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত, তাঁর সম্মুখীন হওয়া তার পক্ষে বিধের

নয়। কিন্তু সাধনার সমস্ত সতর্কতা ব্যর্থ করে তিনি যে নিজেই হন্তদন্ত হয়ে সদর মহলের দালানে পাঠশালায় এসে দাঁড়াবেন, এতদূর তলিয়ে ভাবতে পারেনি সাধনা।

এই মহিলাটির সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রী এবং দুই শিক্ষকের ধারণাও খুব ভাল ছিল না। পুত্রের সম্পর্কে তাঁর পক্ষপাতিত্ব এবং সেইসূত্রে অনমনীয় মনোভাবের জন্য তিনি পাঠশালার বালক-বালিকাদেরও প্রীতি আকর্ষণে সমর্থা হননি। সুতরাং সেই অবাঞ্ছিতা মহিলাটিকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অবস্থায় একেবারে তাদের সামনে উপস্থিত দেখে তাদের পক্ষে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এক্ষেত্রে কাছের মেয়েগুলি নিরুপায় হয়ে অগতির গতি সাধনার দিকে সভয়ে তাকাতে থাকে এবং কতকগুলি সরে সরে তার কাছ ঘেঁষে বসবার জন্য এগিয়ে আসে।

কিন্তু এ নীরবতা ক্ষণিকের। ঝড়ের বেগে এসেই নীরদা ঠাকরুণ মেয়েদের দিকে তাকাতেই একপাল মেয়ের সামনে সাধনাই তাঁর চোখে পড়ল আগে। তিনিও তখনি জোর দিয়ে যেন দু' চোখের পরদা ও মুখের বল্‌গা ছিঁড়ে ফেলে সাধনাকে উদ্দেশ করে অত্যন্ত অশিষ্ট ভাষায় হেঁকে ও ডেকে বললেন : হ্যাঁরে হারামজাদী সাধি, তুই কি সাপের সাতপা' দেখেছিস্—কি ঠাওরেছিস্-রে হতচ্ছাড়ী ছুঁড়ি? ওখানে লুকিয়ে কেন, আয়—উঠে আয়; সবার সামনে আমি তোকে ঝাঁটার বাড়ি মেরে—

কিন্তু নীরদা ঠাকরুণের কণ্ঠধ্বনি সর্বোচ্চ গ্রামে উঠে সহসা এখানে স্তব্ধ হতেই ছাত্রছাত্রী ও প্রবীণ শিক্ষকদের হুঁস হলো যে, যাকে উদ্দেশ করে এই সব দুর্বাক্য উদ্গীরণ করছিলেন তিনি, ইতিমধ্যে সেই মেয়েটি কোন্ ফাঁকে একবারে তাঁরই মুখের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাতেই ঠাকরুণের মুখের কথা সেইখানে যেন একটা ধাক্কা খাবার মত হয়ে থেমে গেছে।

একদিকে রুদ্ধকণ্ঠি স্থুলাঙ্গী প্রৌঢ়টি দারুণ ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত অবস্থায় মনের আক্রোশে ফুলছেন, অন্যদিকে এই প্রতিভাময়ী কিশোরী দীর্ঘায়ত দুটি চক্ষুর উজ্জ্বল দৃষ্টি প্রৌঢ়ার মুখে নিবদ্ধ করে স্থির শান্তভাবে তাঁরই সেই বক্রোক্তির উপসংহারটুকু শোনবার প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু প্রৌঢ়ার রুদ্ধ কণ্ঠ থেকে আর কোন বাক্যোদ্গমের সম্ভাবনা নেই বুঝে দিব্য সহজভাবেই সাধনা বলল : থামলেন কেন, কথাটা শেষ করে ফেলুন—আমি ত সেই আশাতেই এগিয়ে এসে আপনার সামনে দাঁড়িয়েছি পিসিমা!

সাধনার শান্ত কণ্ঠের সুস্পষ্ট নির্ভীক কথাগুলি শুনতে শুনতে নীরদা ঠাকরুণের মনে হলো, তাঁর খোলাখুলি হুমকীটাকে খেলো করে দেবার জন্যেই ডেঁপো মেয়েটা এই চাল চেলেছে। তিনি ভেবেছিলেন, তাঁকে দেখেই এবং সেই সঙ্গে তাঁর শাসানী শুনেই মেয়েটা ভয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, মুখ তুলতে সাহস করবে না ; কিন্তু সে ধারণাকে পালটে

দিয়ে তাঁর কথার মধ্যেই ঝাঁ করে উঠে একেবারে তাঁর সামনে এসে তাকে দাঁড়াতে দেখেই তিনি চমকে ওঠেন, সেই সঙ্গে শেষের কথাগুলিও বন্ধ হয়ে যায়। যেন আগুন জ্বলে উঠতেই তার উপর একখণ্ড তুষার এসে পড়ে অগ্ন্যুৎপাত স্তব্ধ করে দিয়েছে।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজের দুর্বলতাকে উপলব্ধি করে আত্ম-প্রসাদী অহংকারে উত্তেজিত হয়ে উগ্রভাবে তিনি বললেন: থামব কেন রে হারামজাদী—পরক্ষণেই এই অশিষ্ট কথাটায় থামা দেবার উদ্দেশ্যে ডান হাতখানি তুলে তার তর্জনীটি নীরদা ঠাকরুণের নাকের দিকে ঈষৎ হেলিয়ে কণ্ঠস্বর বেশ দৃঢ় অথচ সংযত করে সাধনা বলল: থামুন পিসিমা, আপনি এখানে মস্ত ভুল করেছেন! আপনার দাদা হচ্ছেন আমার জেঠামণি, অর্থাৎ আমার বাবার মতন পূজনীয়—সে হিসেবে আপনিও আমার মা। তাহলেই বুঝে দেখুন—ঐ বিশ্রী কথাটা মুখ থেকে বার করে, নিজের মুখেই কালি মাখাচ্ছেন!

সাধনার কথাগুলি শুনেই দুই পণ্ডিত 'সাধু সাধু' বলে তাকে বাহোবা দিয়ে উঠলেন মনের আনন্দে। অত্যন্ত অশ্রাব্য ও অসহ্য একটা গালি শুনেও সাধনা মেয়েটি যে যুক্তিতে তার আপত্তি জানাল, যথার্থই সে যুক্তিটি কি চমৎকার! যেন জোঁকের মুখে কেউ নুন ঢেলে দিল।

সাধনার কথায় নীরদা ঠাকরুণের মনটা হয়ত নড়ে ওঠবার মতন হয়েছিল, কিন্তু দুই ধেড়ে পণ্ডিতের মুখের বাহোবা ধ্বনি

তখনি তাঁকে ক্ষেপিয়ে দিল। আবার তিনি পূর্ববৎ চীৎকার করে উঠলেন : কী, আমার মুখে তুই কালি মাখিয়ে দিবিরে কালা মুখী! জানিস্, তোর ধিঙ্গীপনায় পাড়াময় ঢি ঢি পড়ে গেছে—তাই তোর মুখে নুড়ো জ্বেলে দেবার জন্যে দশ গাঁয়ের লোকের হাত নিসপিস্ করছে, সে খবর কি রাখিসরে হতচ্ছাড়ি। যার খাবি, তারই বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবি বেইমান ছুঁড়ি, সাধে কি বলেছিনু—সবার সামনে ঝাঁটার বাড়ি মারব—

এমনি অসংলগ্নভাবে হয়ত আরো কত কটূক্তি করতেন নীরদা ঠাকরুণ, যেহেতু—মুখের বাধা তখন সরে গিয়েছে, কিন্তু সাধনাই খপ করে এইখানে বাধা দিয়ে বলল : বেশ! বুঝেছি আপনার কথা—সবার সামনে আমাকে ঝাঁটার বাড়ি মারবার জন্যে ছুটে এসেছেন। কিন্তু এই পাঠশালার শিশুরাও জানে, সাজা দেবার জন্যে গুরুজনই মারধর করেন। কোন দোষ করলেই সাজা দেবার কথা ওঠে। বেশত, আমার দোষটা আগে দেখিয়ে দিন—তখন মাথা পেতে আমি তার জন্যে শাস্তি নেব। কিন্তু দোষের কথাটা চেপে রেখে পাঠশালায় মা-সরস্বতীর সাধনার স্থানে এসে এ-ভাবে হৈ চৈ করা কি আপনার দিক দিয়ে দোষের হচ্ছেনা পিসিমা! জানেন, পাঠশালায় বসে দোষের বিচার করা, কিম্বা শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন শুধু শিক্ষকরা—বাইরের লোকের সেখানে এসে হুম্‌কী দেবার বা কিছু করবার কোন অধিকারই নেই।

সাধনার কথাগুলি শুনতে শুনতেই নীরদা ঠাকরুণ অধীরা হয়ে উঠছিলেন! কথা তার শেষ হ'তেই তিনি আরো বেশী উত্তেজিত হয়ে ঝংকার দিলেন: আহাহা, উনি দারোগা মেজিষ্টর হয়ে বিধেন দিচ্ছেন গো! জানিস, আমার দাদা দয়া করে এই পাঠশালা বসিয়েছেন। আমি তাঁর বোন—এক মায়ের পেটে আমরা জন্মেছি; আমাদের ঘরবাড়ী, আর কোথাকার কে তুই হতচ্ছাড়ি—এত বড় তোর বুকের পাটা, মুখ নেড়ে বলতে চাস্—আমরা হনু বাইরের নোক! আমাদের কোন ক্ষ্যামতাই নেই?

কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে সাধনা বলল: নেই ত। অবুঝের মত এখানে এসে যে ক্ষমতা আপনি চালাতে চাইছেন, সে অন্যায়। তাই আমি ও কথা বলেছি। জানেন, জেলার হাকিমও নিজে পাঠশালায় জোর করে ঢুকে কোন ছাত্র-ছাত্রীকে শাস্তি দিতে পারেন না—তাঁর পক্ষেও সেটা অন্যায়। তাঁর যা বলবার পাঠশালার শিক্ষককে বলবেন—যিনি পাঠশালার কর্তা। আমার এ কথা ঠিক কি না, জেঠামণিকে জিজ্ঞাসা করবেন!

এবার যেন আগুনের উপর বারুদ পড়ল। নীরদা ঠাকরুণ রাগে তিড়বিড় করে উঠে গলার জোর আরো চড়িয়ে বলে উঠলেন: দাদাকে আবার জিজ্ঞেস করব কি রে এঁচোড়ে-পাকা দজ্জাল ছুঁড়ি! এইখানে দাঁড়িয়ে আমি হুকুম করব, দেখি তোর কোন্ বাবা এসে আমাকে ঠেকায়!

এইখানে কথার মোড় ঘুরিয়ে ভিতরের সেই দরজাটার

দিকে তাকিয়ে তিনি ডাকতে লাগলেন ঃ এই—নারাণী, এই—ঈষাণী, নিয়ে আয় ত এক একগাছা মুড়ো ঝাঁটা, আমি বলছি নিয়ে আয়—দেখি কার ঘাড়ে পাঁচটা মাথা আছে আমাকে ঠেকায়।

যদু পণ্ডিত এই সময় তাঁর আসন ছেড়ে উঠে বাধা দানের ভঙ্গিতে বললেন ঃ করছেন কি আপনি দিদি ঠাকরুণ! এ সব কি বলছেন? আপনার দাদা যাকে কন্যার মতন স্নেহ করেন, ভালবাসেন—সেই বালিকার ওপর—

পণ্ডিতের কথা শেষ হতে না হতেই তাঁর দিকে মুখখানা ফিরিয়ে ঠাকরুণ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন ঃ থামো, থামো ; টিকি নেড়ে আর সরফরাজি করতে হবে না তোমাকে। ওর কি ঐ সব বালিকের মতন—কথারে ধেড়ে মিন্‌সে? পড়াতে আস, শাসন করতে শেখনি? গুরুমশাইগিরি ফলাচ্ছ এই দজ্জাল ধামড়ীকে এগিয়ে দিয়ে! দাঁড়াত—তোদের পাঠশালার নিকুচি করেছে—

ঠাকরুণের ক্রোধ তখন সীমা অতিক্রম করে এমনি দুর্বার হয়ে উঠেছে যে, ক্ষিপ্তার মত ছুটে গিয়ে দালানের স্তম্ভে ও দেওয়ালে টাঙানো মানচিত্র, ক্যালেণ্ডার, লিখবার কাঠের বোর্ড, দেব-দেবী, মহাপুরুষ ও শিক্ষাব্রতীদের বাঁধানো ছবি ও অন্যান্য শিক্ষাসংক্রান্ত বস্তুগুলি দু'হাতে টেনে ছিঁড়ে ছুঁড়ে উঠানে ফেলতে লাগলেন। সেই সব দামি ও ভারি জিনিস-পত্র লক্ষ্য-হীন অবস্থায় ইতস্তত: নিক্ষিপ্ত হওয়ায় কতিপয় ছাত্র-ছাত্রী

তাদের চাপে রীতিমত আহত ও আতঙ্কিত হয়ে যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল! এইভাবে চণ্ডলীলার মধ্যে শিশুকণ্ঠের আর্তনাদ এবং একখানা বোর্ডের ধাক্কায় আঘাতপ্রাপ্ত একটি ছেলের আহত মাথা থেকে রক্তস্রাব তাঁকে পুনরায় প্রকৃতিস্থা করল।

তখন বালক-বালিকাদের কলরবে বড় বাড়ীর বিশাল প্রাঙ্গণ মুখর হয়ে উঠেছে। সেরেস্তা থেকে কর্মচারীরা দালানের নিচে উঠানে এসে জমায়েত হয়েছে। সাধনাও এ অবস্থায় আহত বালক-বালিকাদের পরিচর্য্যায় বসে গেছে, ভুই পণ্ডিতও বয়স্ক ছেলেমেয়েদের নিয়ে তার সাহায্যে হাত লাগিয়েছেন।

অবস্থা দেখে নীরদা ঠাকরুণ বুঝলেন, তিনি খুবই বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। এখন বড়বাড়ীর চারদিক থেকে লোকজন এসে ব্যাপারটাকে ঘোরালো করে তুলেছে। তিনিও এক্ষেত্রে নিজের দিকটা সামলে নেবার উদ্দেশ্যে নিজের মনেই শিক্ষাস্থান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদিগকে উদ্দেশ করে চড়া গলায় তাঁর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন ঃ এত বড় আস্পর্দ্ধা, বলে কিনা— এই দালানে আমাদের কোন ক্ষ্যামতাই নেই! সাধ করে কি এ কাণ্ড করেছি! এই আমি সবার সামনে বলে যাচ্ছি—এর পর বেচাল কারো দেখলেই ঝাঁটা মেরে সায়েস্তা করব···একথা মেনে নিয়ে তবে এখানে নিকতে-পড়তে আসবি।

হাত নেড়ে ভঙ্গির সঙ্গে বিশেষ বিশেষ কথাগুলির ওপর জোর দিয়ে বক্তব্যটি বলেই নীরদা ঠাকরুণ পাশ-দরজা দিয়ে ভিতরে চলে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সাধনাও হাতের কাজ করতে করতেই তুই শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদিগকে উদ্দেশ করে বলল : এখন আমিও বলছি সকলকে—আত্মমর্য্যাদাবোধ যদি আমাদের থাকে, এ দালান থেকে আমরা আজই বিদায় নিয়ে যাব। আমাদের মনের জোর থাকলে, মা সরস্বতীই আমাদের জন্যে এমন জায়গায় পাঠশালা বসাবেন, যেখানে আমরা নিশ্চিন্ত মনে করব বিদ্যা-সাধনা—কেউ কোন বিঘ্ন ঘটাতে পারবে না।

যদু পণ্ডিত সহর্ষে বলে উঠলেন : সাধু, সাধু!

শর্মা পণ্ডিত উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন : তুমি মা বিদ্যাদেবীর সাধিকা—তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।

উনিশ

যথাসময় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিতাইকে পরীক্ষা করে জানালেন যে, হাড়ে দারুণ চোট লাগায় সন্ধিস্থলের হাড় সরে গেছে। যন্ত্রের সাহায্যে অস্থি-সংযোগ করে জ্যাকেট বাঁধা অবস্থায় নিরাময় না হওয়া পর্য্যন্ত নিতাইকে হাসপাতালে থাকতে হবে।

সেই রাত্রেই রোগীর টেবিলে নিয়ে গিয়ে বিশেষ যত্নে সে কাজ সম্পন্ন করা হয়। আষ্টেপৃষ্ঠে ট্রাপ বেঁধে রোগীকে তার শয্যায় এনে যথাযথভাবে নির্দেশ দিয়ে সেই রাত্রেই ডাক্তার সদরে চলে যান।

সদরপুরে মধুমতী এষ্টেটের কাছারী-বাড়ী সংলগ্ন সুসজ্জিত বাসভবনটি স্বতন্ত্রভাবে জনৈক কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে বাসোপযোগী অবস্থায় বরাবর সংরক্ষিত থাকে। সুতরাং কালে ভদ্রে হঠাৎ জমিদার বাড়ীর কেউ এসে পড়লেও সাময়িক ভাবে বসবাস সম্বন্ধে কোন অসুবিধা ঘটে না। কানাইবাবু ও মথুরবাবু সেই বাড়ীতেই রাত্রিবাস করেন। পরদিন সকালে টাউন হলের সভার পর সরাসরি হাসপাতালে দুজনেই নিতাইকে দেখতে এলেন।

নার্স মিস্ লিলিকে জিজ্ঞাসা করে তাঁরা জ্ঞাত হলেন—রাত্রে নিতায়ের ঘুমটা ভালো হয়নি; অন্ততঃ পাঁচিশবার সে

অস্থিরভাবে সেই সাধনা মেয়েটিকে ডেকেছে। নার্সকে শেষে ধমক দিতে বাধ্য হতে হয়।

নার্সের সঙ্গে তাঁরা উভয়েই নিতায়ের শয্যার কাছে গিয়ে বসলেন এবং নার্সের নির্দ্দেশ মতই তাকে শান্তভাবে থাকতে পরামর্শ দিলেন। কানাইবাবু তার গায়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন : শুনলাম রাতে চেঁচামেচি করেছ, এ কি ভাল কথা ? জানো ত, এখানে আরো রোগী থাকে, তাদের অসুবিধা করা কি উচিত ? ব্যস্ত হয়োনা, আমরা বাড়ী পৌঁছেই নীরকে পাঠিয়ে দেব এখানে।

নিতাই ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠল শেষের দিকের কথাটা শুনেই। আর্তকণ্ঠে মিনতির সুরে বলল : না, না, মাকে পাঠাবেন না মামাবাবু—মাকে নয় !

কানাইবাবু বললেন : এখানে তোমার সম্বন্ধে এঁরা যে রকম যত্ন নিয়েছেন, বিশেষ ইনি নিজের দিদির মত তোমাকে দেখছেন, সেবা করছেন, সব দিকে লক্ষ্য রেখেছেন, তাতে কারও আসবার কোন প্রয়োজনই দেখি না। পাছে তোমার মায়ের জন্যে মন কেমন করে, সেইজন্যেই নীরকে—

তেমনি আর্তকণ্ঠে নিতাই পুনরায় বলে উঠল : না, মামাবাবু, আপনি ত জানেন মায়ের স্বভাব, এসেই বকাবকি সুরু করে আমাকে পর্য্যন্ত অস্থির করে তুলবেন। তবে যদি—

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই মুখখানা ফিরিয়ে নিল নিতাই।

কানাইবাবু ও মথুরবাবু উভয়েই লক্ষ্য করলেন, তার দুই গণ্ড দিয়ে অশ্রুর ধারা নেমেছে।

মথুরবাবু বললেন: বল না বাবা, থামলে কেন? কি করতে হবে, বল?

নিতাই অশ্রুসিক্ত চোখ দুটি বিস্ফারিত করে তাঁর দিকে চেয়ে বলল: সাধনা যদি আসে কাকাবাবু, তাহলে সব কষ্ট আমার—

এই পর্য্যন্ত বলেই চুপ করল। মথুরবাবু তাকালেন কানাইবাবুর দিকে। তাঁর দৃষ্টির অর্থ উপলব্ধি করে কানাইবাবু বললেন: কাকাবাবু! আপনাকে এর আগে আর কোনদিন বোধ হয় নিতাই এ নামে—

মথুরবাবু একটু গম্ভীর মুখেই বললেন: না। আজই প্রথম শুনলাম।

গাঢ়স্বরে নিতাই বলল: আপনার মেয়ের জন্যেই আমি অপঘাতে মরিনি কাকাবাবু! মা আমার ভারি অবুঝ, পরের কথায় তিনি নাচেন। ঐ ঘোষাল মশাই, আর তাঁর মেয়ে আমার মায়ের মন বিষিয়ে দিয়েছে কাকাবাবু! মামাবাবু কিছু কিছু জানেন—তাই ত সাধনাকে দিয়ে নতুন করে গড়ে তুলতে চান আমাকে। কিন্তু মার জন্যে—

আবার নিতাই কথা বন্ধ করে মুখখানা ফিরিয়ে নিল। দুই বৃদ্ধও অভিভূত হয়ে পুনরায় তাকালেন পরস্পরের পানে।

নিতাই পুনরায় মুখ খুলল; বলল: য্যাদ্দিন মামাবাবুর

সামনে বসে সাধনার পড়া শুনে যা না হয়েছে, কাল অত বড় বিপদে আমার মতন অভদ্র মূর্খ দুরন্ত ছেলের উপর তার সেবা-যত্ন দেখে, তার অনেক বেশী শিক্ষা আমি পেয়েছি। সেইজন্যই ত'—

মথুরবাবুর মুখখানির উপর কানাইবাবুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিবদ্ধ হতেই তিনি ধীরে ধীরে বললেন: তুমি ত জান বাবা, সাধনা এ-যুগের সত্যই এক অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে; যে-বয়সে মেয়েরা প্রতি ব্যাপারে বাপ-মা'র মুখাপেক্ষী—নিজেদের স্বাধীন মত বলতে কিছু থাকে না, সাধনা কিন্তু একেবারে এর উল্টো। দশ বছর বয়েস থেকেই ঘর-সংসার, ক্ষেত-খামার, পড়া-শোনা, লোকজনদের প্রতি আদর-যত্ন সবকিছু নিজে থেকেই এমন মানিয়ে নিয়ে করে আসছে যে, কোথাও একটু খুঁত পায় না কেউ। তারপর ক' বছরে—এখন ত একবারে পাকা গিন্নী হয়ে পড়েছে। সংসারে কোন দিকেই আমাকে মাথা দিতে হয় না। তাহলেই বুঝতে পারছ, তার সম্বন্ধে নিজে থেকে কিছু বললেও তাকে বাধ্য করবার মত মনোবল আমি খুঁজে পাইনে। আরো আশ্চর্য যে, আমাদের কথা তার মনে না লাগলে, নিজে থেকে যুক্তি দেখিয়ে সে যা বলে—শুনে অবাক হয়ে চেয়ে থাকি; তখন সাধনার কথাই মেনে না নিয়ে পারিনে। তাই বলছি বাবা, আমি বলব তাকে, তোমার মায়ের সঙ্গে এখানে আসবার জন্যে। সে যদি আসতে রাজি হয়, আমি খুসিই হব।

কানাইবাবুও প্রসন্ন মনে মথুরবাবুর কথাগুলি সমর্থন করে বললেন : তোমার কাকাবাবু সাধনার সম্বন্ধে যা বললেন, খুব সত্য। তুমিও যে কিছু কিছু না শুনেছ তা নয়। যাই হোক, তুমি মনস্থির করে থাকো ; লিলি দিদিও যে তোমাকে ছোট ভাইটির মতন সেবা-যত্ন করছেন, সে ত দেখেই যাচ্ছি। তবে বাপু, বেশী উতলা হয়ে ওঁকে যেন বিব্রত ক'র না।

এই সময় খবর এল, বাড়ী থেকে গাড়ি এসেছে। এরপর কানাইবাবু পরিচালক ডাঃ রায় চৌধুরীর হাতে হাসপাতাল ফণ্ডে সাহায্য এবং নার্স ও পরিচালকগণকে বখশিস দেবার উদ্দেশ্যে মোটা অংকের একখানি চেক দিয়ে মথুরবাবুর সঙ্গে গাড়িতে উঠলেন।

গাড়ির মধ্যে বসে দুই বর্ষীয়ান ব্যক্তি হাসপাতালে শয্যাশায়ী নিতায়ের মনস্তত্বমূলক কথাগুলি নিয়েই আলোচনা করছিলেন। নিতায়ের মুখ দিয়ে তার মনের যে কথাগুলি আজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্গত হয়েছে, মথুরবাবুর চিত্তে সে সূত্রে চিন্তার রেখাপাত হয়ত অস্বাভাবিক নয় ; কিন্তু কানাইবাবুর চিত্তমধ্যে সংগোপনে সংরক্ষিত একটা পরিকল্পনার সঙ্গে তার সাকাঙ্ক্ষ সাদৃশ্য তাঁকে এতই উৎফুল্ল করে তুলেছে যে, তিনি সে গোপনীয় প্রসঙ্গটি কর্মজীবনে ও কর্মক্ষেত্রে একান্ত বিশ্বস্ত মানুষটির সমক্ষে উদ্ঘাটিত করাই সমীচীন ভেবে নিতায়ের মুখে শোনা এদিনের আপ্তবাক্যগুলিকেই ভূমিকা স্বরূপ ব্যবহার করলেন।

মথুরবাবু ভালভাবেই জ্ঞাত ছিলেন যে, অসাধারণ বিদ্যা ও প্রজ্ঞাশীল আনন্দ স্বামীর শিক্ষাধীনে সাধনা কিশোরকালেই বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতাসূত্রে যে ভাবে আত্মসচেতন, তাতে তার উপর অভিভাবকসুলভ কর্তৃত্ব চালানো অনাবশ্যক। সকল দিক দিয়েই সাধনা যেন সন্দেহ ও নিন্দার অতীত। বড়-বাড়ীর বর্তমান কর্তাটি যেমন তাঁর সহৃদয়তাসূচক সহজ ধারায় সবার চিত্তের উপর প্রভাব স্থাপনে সমর্থ হয়েছেন, সাধনাও যেন তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে। তার কাছে মানুষ মাত্রই ভালো ; শিক্ষা ও সঙ্গদোষে মানুষের প্রকৃতি বিকৃত হলেও, সাধনার ধারণা—মনে বিকৃতি না এনে প্রীতি দিয়ে আনন্দ দিয়ে সহজ ধারায় তার মনের গ্লানি সব ধুয়ে মুছে ফেলা যায়। তাই বড়বাড়ীর সদাশয় কর্তার ভগিনীটির পক্ষপাত-মূলক স্বার্থিক বহু অশোভন আচরণ এবং তাঁর পুত্রটির পক্ষ থেকেও আত্মম্ভরিতার অপ্রীতিকর নিদর্শন পেয়েও সাধনা প্রতিকারকল্পে কোন দিনই নালিশ জানায়নি, কিম্বা অসহিষ্ণু হয়েও ওঠেনি। সেইজন্যই সেই আত্মম্ভরী ছেলেটির চরম সঙ্কটে ঘনিষ্ঠভাবে সাহচর্যদান তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ছেলেটি যে সঙ্কটকালের সেই অবস্থাটিকেই সুযোগ স্বরূপ গ্রহণ করে তার সাহচর্য সম্বন্ধে প্রলুব্ধ হয়ে উঠবে, এ যেন পিতৃত্বের অধিকারীরূপে মথুরবাবুর পক্ষে অসহনীয় ব্যাপার। তথাপি, রোগীকে মানসিক শান্তি ও আনন্দদানের অনুরোধে তিনি ধৈর্যসহকারে সম্ভবমত সহানুভূতি প্রদর্শনে

কুণ্ঠিত হন নাই। এখানেও কন্যার বিচার-বিবেচনার প্রতিই তিনি আগ্রহশীল থাকেন।

গাড়ির মধ্যে মথুরবাবুকে একটু গম্ভীর দেখে কানাইবাবুই কথাটি তুললেন। সহসা বলে উঠলেন: আমি বুঝতে পেরেছি মথুরবাবু, মুখে আপনি যাই বলুন, নিতায়ের এই অন্যায় আব্দারটা খুসি মনে গ্রহণ করতে পারেননি। অবিশ্যি, যেন ভেবে বসবেন না—তার জন্যে আমি ক্ষুব্ধ হয়েছি। বরং বলব একথা—আমি যদি আপনার অবস্থায় পড়তাম, ওভাবে প্রস্তাবটি শুনে বিরক্তই হতাম।

মথুরবাবু কর্তার মুখে প্রসঙ্গটা শুনে প্রথমটা চমকে উঠলেন। তারপর নিজেকে সামলে বললেন: আপনি মন দিয়ে সব কিছুই দেখেন, বিচার করেন, তাই মনের কথাটাই খপ করে বলে দিলেন। তবে আমি যা বলেছি, সেও মন-গড়া নয়—কন্যার প্রতি যে বিশ্বাস ও নির্ভরতা আমার মনকে শক্ত করে রেখেছে, সেদিকে চেয়েই বলেছি ও কথা।

মথুরবাবুর মুখে গম্ভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কানাইবাবু বললেন: তাহলে আমার এ-কথাটার উত্তর দিতে হবে আপনাকে মথুরবাবু! যদি আপনার কন্যা নীরদার সঙ্গে এখানে আসতে রাজী হয় এবং নিতাই সেরে উঠলে, তখন যদি বিদ্যা-বুদ্ধি ও প্রকৃতিগত তার হীনতা সত্বেও নিতায়ের প্রতি সে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে, আপনি সেটা কিভাবে নেবেন—সেটি অকপটে আমাকে দয়া করে শুনিয়ে দিন মথুরবাবু।

মথুরবাবু মনে মনে একটু ভেবে বললেন ঃ দেখুন, প্রত্যেক পিতাই চায়, ঘরগৃহস্থালীর ব্যাপারে ছেলে-মেয়েরা তারই ইচ্ছামত চলবে, তার অমতে কেউ কিছু করবে না ; সন্তানের উপর কর্তৃত্বের দাবী তারই থাকবে। এ ব্যাপারে গরমিল হলেই গণ্ডগোল বাধে। পিতা হিসেবে হয়ত আমার মনোবৃত্তিও এই রকমই সঙ্কীর্ণ হোত—যদি সাধনার মত মেয়ের পিতা হবার সৌভাগ্য থেকে আমি বঞ্চিত হতাম। সাধনার কথা, তার বুদ্ধি, আক্কেল-বিবেচনা এতই যুক্তিসহ ও নির্ভুল যে, তার ইচ্ছার উপরে আমি অভিভাবকরূপে নিজের মত চালানো প্রয়োজন বোধ করি না। আমি বেশ জানি, সাধনা যে কাজ করতে এগিয়ে যাবে, বা যার অনুকূলে মত দেবে, সে সব কিছুতেই অসঙ্গত হতে পারে না। আমার এই কথা থেকেই আপনি ও প্রশ্নের উত্তর পাবেন। তবে এই সঙ্গে একথাও বলি, নিজের সম্বন্ধে কিছু করতে হলে সে শিশুর মত আমার উপরেই নির্ভর করে, সেখানে কিছুতেই সে নিজেকে এগিয়ে দিতে চায় না। এক্ষেত্রে আজ্ঞাধীনা অবোধ বালিকার মতই তার আচরণ সবাইকে চমকে দেয়।

গাঢ়স্বরে কানাইবাবু বললেন ঃ বুঝেছি। এইখানেই সুসন্তানের পরিচয় পাওয়া যায় ; তাই বলতে হয়—সন্তান যেন এমনিই হয়। এখন তাহলে এই অকৃতদার নিঃসন্তান বৃদ্ধটির অন্তরক্ষেত্রে ঘটনাচক্রে যে ইচ্ছাটির অঙ্কুর উঠেছিল একদিন, আজ আপনার কাছে সে কথা অকপটেই বলছি মথুরবাবু,

আপনি নিবিষ্টমনে আগে শুনুন : তারপর এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

মথুরবাবু বললেন বেশ ত, বলুন—শোনা যাক্।

কানাইবাবু বলতে আরম্ভ করলেন : দেখুন, আমিও প্রথমদিন আপনার া সাধনাকে দেখে, তার বিদ্যার পরিচয় পেয়ে ও মুখের কথা শুনে স্তম্ভিত হই। জীবনে বহুলোকের সঙ্গে জানা-শোনা, আলাপ-আলোচনা ও মেলা-মেশা হয়েছে। কিন্তু এমন একটি অদ্ভুত রকমের নির্মল চরিত্র দেখি সেই প্রথম। তার পর দু'চার দিনের ঘনিষ্ঠতায় তার জীবনের অপর দিকগুলোও চোখে পড়ে। সেই সময় মথুরবাবু, নিজের মনের সঙ্গে বিচার করে স্থির করে ফেলি যে, এই মেয়েকেই অপুত্রক আমি সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করে আমার উপার্জনটাকে সার্থক করব। কিন্তু এ সঙ্কল্প মনের মধ্যেই চেপে রাখি, দ্বিতীয় কোন প্রাণীকে জানাই নি। এমনি সময় এলো বজবজ থেকে নিজের সহোদরা বোন নীরদার চিঠি। সে চিঠি পড়ে জানলাম, সংসারে তা'হলে আমার এক আপনজনও আছে, নিজের বোন এবং তার খোকা। আমার মনে জাগল নতুন চিন্তা। সেও এক রীতিমত দ্বন্দ্ব বই কি! অগত্যা স্থির করি—নীরদার পুত্র যদি যথার্থই দুগ্ধপোষ্য খোকা হয়, আমার সাধনা মা'র হাতেই তুলে দেব তাকে। নিজের আদর্শে সেই শিশুকে সে মানুষ করবে এবং সে বড় হলে—থাকগে সে কথা। হ্যাঁ, বজবজে গিয়ে জানতে পারলাম যে, নীরদার

ছেলে দুগ্ধপোষ্য নয়, নামে সে খোকা হলেও দিব্যি স্বাস্থ্যবান সুদর্শন বালক—সাধনার চেয়ে বয়সে বছর তিনেকের বড়োই হবে। তবে বিদ্যা, বিনয়, আচার-ব্যবহার, সভ্যতা-ভব্যতা সব দিক দিয়ে অনেক ছোট। তবুও মনে আশাকে স্থান দিলাম বৈকি—সাধনার সাহচর্যে তাকে তার যোগ্য করে নেব, সাধনা মা-কেই সে ভার দেব। তবে আসল উদ্দেশ্যটি ঘুণাক্ষরেও জানাবো না। তবে বজবজের সহর দেখতে বেরিয়ে গঙ্গার ধারে নতুন তৈরী কালী মন্দিরে গিয়ে মাতৃমূর্তির সামনে মনের সঙ্কল্পটা জানিয়ে তাঁর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষাও করেছিলাম।

এর পরের কথা—নিত্যকার ঘটনা, ঘাত-প্রতিঘাত—যা কিছু হয়েছে, আপনিও জ্ঞাত আছেন। কিন্তু কোনদিন আমার মনের কথা আপনার কাছে প্রকাশ করিনি। তার কারণ, বহু চেষ্টা করেও নিতাইকে সাধনার যোগ্য করে তুলতে পারি নি। আমি করেছি যত প্রচেষ্টা, আমার ভগিনী নীরদার কাছ থেকে এসেছে ততোধিক বাধা। তবু হাল ছাড়িনি ; সাধনার পরিবেশ থেকে তফাৎ হতে দিই নি নিতাইকে। এই অবস্থার মধ্যেই আকস্মিকভাবে যে বিপর্যয় এসে গেছে—তাকে দৈব-ব্যবস্থা ছাড়া কি বলি? তারপর, আজ শয্যাশায়ী রুগ্ন নিতায়ের মুখের কথা শুনে হয়ত আপনি চমৎকৃত হয়েছেন, কিন্তু আমি ভেবেছি, একি করুণাময়ী মহামায়ার ইচ্ছা! এরপর আমার আর বলবার কিছু নেই। আপনি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, সবই

বুঝেছেন, এখন—এর পর, এ সব শুনেও আপনি কি বলবেন, সেইটিই জানবার জন্য আমি সমস্ত চিত্তকে নিবিষ্ট করে রাখছি মথুর বাবু!

মথুর বাবুর মুখে কোন প্রকার গাম্ভীর্যের ছাপ পড়ল না। তিনি সহজ ও স্বচ্ছন্দ চিত্তেই বললেন : আমার বলা ত আগেই হয়ে গেছে কানাই বাবু। আপনি ত শুনেছেন, সাধনাকে আমি সর্বতোভাবে স্বাধীনতা দিয়েছি এবং সাধনার ইচ্ছার উপর আমার আপত্তি করবার কিছু নেই।

গাড়ি এই সময় বড় বাড়ীর দেউড়ীর সামনে এসে দাঁড়াতেই কানাইবাবু নেমে পড়লেন। কোচোয়ান তাঁর নির্দেশমত মথুর বাবুকে বাড়ীতে পৌঁছে দিতে গেল। বাড়ীর ভিতরে এসে উঠান থেকে পূজার দালানের অবস্থা দেখে কানাইবাবু চমকিত হয়ে চেয়ে রইলেন। ছাত্রছাত্রীদের স্বরগুঞ্জনে যে স্থান মুখরিত হত এ সময়, জনপূর্ণ দালানটি গমগম করত, কি আশ্চর্য, সব ফাঁকা! কেউ কোথাও নেই—কেমন একটা থমথমে ভাব মনটাকে পর্য্যন্ত বিষণ্ণ করে তুলছে। দেউড়ীর দ্বারবান বাবুকে নামতে দেখেই সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে তার কর্তব্যটুকু পালন করলেও, ভিতরের বিশ্রী অবস্থার কোন আভাসই দেয় নি। কিন্তু বাবুর খাস-পরিচারক শিব-কুমার গাড়ীর আওয়াজ পেয়েই বাবুর সন্ধানে ছুটে এসেছিল। কানাইবাবুকে দেখতে পেয়েই কম্পিত পদে এগিয়ে এসে মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে ঢিপ করে প্রণামটি সেরে উঠতে না উঠতেই

প্রণম্য ব্যক্তিটি প্রশ্ন করলেন : এসব কি কাণ্ডরে শিবু ? হয়েছে কি ? পাঠশালা বন্ধ, চারদিকে এলোমেলো ভাব—

হাত দু'খানা কচলাতে কচলাতে শিবু উত্তর করল : এজ্ঞে হুজুর, খানিক আগে দি'ঠাউরুণ পোড়োগুলোকে তেড়িয়ে দ্যাছেন।

সে কি!

কানাই বাবুর কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মত শোনাল। ইতিমধ্যে সেরেস্তা থেকে ফটিক ঘোষাল এবং আরও কতিপয় কর্মচারী এসে পড়লেন। ঘোষাল মশাই এগিয়ে গিয়ে বলতে গেলেন : আজ্ঞে হুজুর—

কানাই বাবু কথাটা বলেই স্তব্ধভাবে তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য শিবকুমারের মুখের পানে চেয়ে থেকে বুঝি অবস্থাটা উপলব্ধি করতে চাইছিলেন। পিছন থেকে ঘোষাল মশায়ের গায়ে পড়ে খবরটা জানাবার প্রয়াসে তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন : থাক্, আমি এখন ভারি ক্লান্ত, একটু পরে সব শুনব।

পরক্ষণে শিবকুমারকে তাঁর বৈঠক-ঘরের চাবি খুলে দেবার ইঙ্গিত করে ক্ষিপ্রপদে সেইদিকেই এগিয়ে চললেন। শিবকুমার এ ইঙ্গিতের অর্থ ত বোঝেই, উপরন্তু সে জানে—বড় বাড়ীতে কোন ব্যাপারে গণ্ডগোল কিছু হলেই তার খবর রাখতে হয় তাকে; যেহেতু, বাবু জানেন, মিথ্যা করে কিম্বা অতিরঞ্জিত করে বাড়িয়ে বলবার পাত্রই নয় মেদিনীপুরবাসী এই স্পষ্টভাষী মানুষটি।

বৈঠকখানায় কানাইবাবু হাত পা ছড়িয়ে ফরাসে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসতেই, শিবু তাড়াতাড়ি আগে থেকে সাজিয়ে রাখা তাওয়াদার কলিকাটি গড়গড়ার মাথায় বসিয়ে দিয়ে ফরাসের পাশে এসে দাঁড়াল। দীর্ঘ সটকায় গোটা দুই টান দিয়ে কানাইবাবু বললেন: আমাদের বেরিয়ে যাবার পর যা যা হয়েছে, সব কথা আমি তোর মুখেই আগে শুনতে চাই।

সুতরাং শিবুকেও শক্ত হয়ে আগের দিন নিতাইবাবুর ঘোড়ায় চড়া থেকে আরম্ভ করে এ দিনের পূজার দালানে হাঙ্গামা পর্য্যন্ত সব ঘটনাগুলিই পর পর শোনাতে হলো—আগের দিন সন্ধ্যার মুখে সাধনা কর্ত্তৃক সর্বপ্রথম খোকাবাবুর সম্বন্ধে খবর দেওয়া, নিজেদের বাড়ী থেকে চাকর দিয়ে খাবার পাঠিয়ে হাবুকে খাওয়ানো এবং এদিনের পাঠশালায় এসে দিদিঠাকুরাণীর দাপাদাপি পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনার কাহিনী।

ওদিকে ফটিক ঘোষাল সেরেস্তায় ফিরে গিয়ে সহকর্মী-দিগকে উদ্দেশ করে অপ্রসন্ন ভঙ্গিতে বলছিলেন: দেখলেন ত কর্তার কাণ্ড! পেয়ারের চাকরকে নিয়ে খাস-কামরায় সেঁধুলেন—তার মুখেই ব্যাওরা সব শুনবেন আর কি! ঘাসে মুখ দিয়ে তো চলি না, বুঝি সব।

শিবকুমারের কথা শেষ হলে সেরেস্তায় ঘোষালের ডাক পড়তেই, আর সব আমলারা বলতে থাকেন: আপশোষ আপনার ঘুচিয়ে দিয়েছেন হুজুর, এখন চুটিয়ে ম্যানেজার বাবুর মেয়ের কেচ্ছা করে আপনার দিদিরাণীকে স্বর্গে তুলুন গে!

ঘোষাল মশাই নীরবে সহকর্মীদের প্রতি কোপকটাক্ষ নিক্ষেপ করেই হুজুরের হুকুম তামিল করতে ছুটলেন।

কিন্তু মনে মনে কল্পনার জাল বুনে যে বৃত্তান্তটি হুজুরকে শোনাবার জন্য সযত্নে সাজিয়ে রেখেছিলেন ঘোষালমশাই, কানাইবাবুকে সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র উৎসাহী দেখা গেল না। তিনি শুধু হাসপাতালে পরিবেষিত সংবাদ সম্পর্কে এমন একটা কৈফিয়ৎ চাইলেন, শোনামাত্র ঘোষালের মাথা ঘুরে গেল। কানাইবাবু জানতে চাইলেন : আপনি ত হাসপাতালে গিয়ে জানালেন, নীরদা ছেলের খবর পেয়ে বেসামাল হয়ে পড়ে, আপনার সঙ্গে হাসপাতালে আসবার জন্যে ক্ষেপে ওঠে, আপনি তাঁকে অতি কষ্টে শান্ত করে রেখে যান। এই কথাই ত বলেছিলেন ?

স্বীকৃতির ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে ঘোষাল বললেন : আজ্ঞে— হুজুর।

পরক্ষণে কানাইবাবু জেরার ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলেন : কিন্তু সন্ধ্যার সময় সাধনাই তো হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে শিবুকে দিয়ে নীরদাকে তার ছেলের খবর দেয়। পথে দেখা হতে আপনিও তার কাছেই জানতে পারেন যে, নিতাইকে সে হাসপাতালে রেখে এসেছে। নয় কি ?

কথাগুলো শুনতে শুনতে ফটিক ঘোষালের মনে হতে থাকে দুটো কাণের মুখে এক এক জোড়া ভীমরুল গুরু-গম্ভীর আওয়াজ তুলেছে। সর্বনাশ—একি বেফাঁস কথা বলে ফেলেছে সে! তখনি ডান হাতখানা মাথায় তুলে খুব ছোট করে কাটা

চুলগুলো টেনে সাফাইরূপে প্রয়োগ করবার মত কোন মোক্ষম কথার সন্ধান করতে থাকে। কিন্তু কানাইবাবু সেটা বুঝতে পেরে তাঁকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে শ্লেষের সুরে বললেন : এই জন্যেই ওখানে আপনাকে থামা দিয়েছিলাম ঘোষাল মশাই। আমার বোন নীরদা আজ সবার সামনে পাঠশালার ওপর হামলা চালিয়ে পাগলের মত যে-সব যাচ্ছেতাই কাণ্ড করেছে, তার পিছনেও এমনি বিশ্রী লাগানি ভাঙানি আছে—যার বনেদটাই মিছে।

ফটিক ঘোষাল আত্মসমর্থনের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু নিরীহ প্রকৃতি কানাইবাবুর চোখ মুখের ভঙ্গি এমনই ভীষণ হয়ে উঠল যে, তাঁকে নীরবেই হুজুরের সামনে থেকে সভয়ে সরে যেতে হলো।

মধ্যাহ্নকাল ; তখনো পর্য্যন্ত কানাইবাবুর স্নানাহার হয় নাই। শিবকুমার পীড়াপীড়ি করে তাঁকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে তৈলমর্দন করে তোলা জলে স্নানে বসাল। তারই মধ্যে বাবুর মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করবার জন্য পাচিকা পরিচারিকা প্রভৃতি প্রত্যেককেই তাড়া দিতে লাগল।

একাই নীরবে ভোজনে বসলেন কানাইবাবু। পাচিকা ভিন্ন অন্য কেহই তাঁর সংস্পর্শে আজ এলেন না। ভোজনান্তে তিনি দিবানিদ্রার আকর্ষণে শয়নকক্ষে যাবেন, এমন সময় তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন নীরদা। এ পর্য্যন্ত তিনি অন্তরালে থেকেই দাদার আহারাদির তদ্‌বির করছিলেন ; পাঠশালার

ব্যাপারে অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য দাদার সামনে এসে মুখ তুলে দাঁড়াবার মত সাহসটুকুও বুঝি হারিয়ে ফেলেছিলেন। দাদাকে এ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন দেখে বুঝতে পারেন যে, তিনি রীতিমত বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এ পর্য্যন্ত নিজেও অভুক্ত থেকে মনস্তাপে দগ্ধ হচ্ছিলেন এবং অপ্রত্যাশিত প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির পর এই সূত্রে আকস্মিক আশ্রয়চ্যুতির আশঙ্কাও যে মাঝে মাঝে চিত্তে বিহ্বলতা আনেনি, এমন কথাও বলা যায় না। সুতরাং অবশেষে সঙ্কোচজনিত দুর্বলতাকে সবলে ঠেলে ফেলে দাদার সঙ্গে এ সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া সাব্যস্ত করেই সহসা সামনে এসে দাঁড়ালেন নীরদা ঠাকরুণ।

কানাইবাবু দালান থেকে সিঁড়িতে পা তুলবেন উপরে ওঠবার জন্য, ঠিক সেই সময় ভগিনীর আর্তস্বর তাঁকে তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ করে দিল। মুখ তুলে তাকাতেই নীরদার শুষ্ক ম্লান মুখখানা তাঁকে অভিভূত করল এবং সেই মুখনিঃসৃত 'দাদা' কথাটার রেশ বুঝি কাণের মধ্যে অনুরণন তুলছিল।

ভ্রাতা ও ভগিনীকে সেই অবস্থায় মুখোমুখী দণ্ডায়মান দেখে যে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি সহজেই উপলব্ধি করতেন যে, এভাবে ভগিনীর আকস্মিক আবির্ভাবে ভ্রাতাই এত সঙ্কুচিত, বিভ্রান্ত ও বিপন্ন হয়ে পড়েছেন যে, বাহিরের ব্যাপারে সর্বাংশে অপরাধিনী জেনেও সে সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ তোলার সামর্থ্যটুকুও এখন তাঁর নাই। তিনি যেন বাদ-প্রতিবাদের ঝঞ্ঝা থেকে নিষ্কৃতি পেলেই নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হন।

কানাইবাবুর এই বিমূঢ় অবস্থার সুযোগ নিয়ে নীরদা দেবী আর্তস্বরে বলে উঠলেন : শাস্তি নেব বলে আমি সেই থেকে তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছি দাদা, মুখে এখনো জল পর্য্যন্ত দিই নি, ছেলের ভালো-মন্দের কথাও জিজ্ঞেসে করিনি তোমাকে। কি শাস্তি বিহিত করেছ, সেটা জানিয়ে দিয়ে তবে ওপরে যাও।

স্তব্ধভাবে ক্ষণকাল ভগিনীর বাষ্পাচ্ছন্ন বিশুষ্ক মুখখানার দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মানব-দরদী কানাই চৌধুরী। এ-দিনের ব্যাপারে ভগিনীর স্বেচ্ছাচারিতার অংশ যে অনেকখানি, সুস্পষ্টভাবে সেটা জেনেও, তিনি এ পর্য্যন্ত কোনও কৈফিয়তই চাননি তার কাছে—পাছে তাঁর মুখ দিয়ে কোনরূপ অপ্রিয় কথা বেরিয়ে পড়ে সংসার-মধ্যেও আর একটা অশান্তি সৃষ্টি করে! এই আশঙ্কায় তিনি যখন উভয়ের অবাঞ্ছিত সাক্ষাৎকার কাটিয়ে তাড়াতাড়ি কোনপ্রকারে ভোজন-পর্ব সেরেই বিশ্রাম কক্ষে গিয়ে নিশ্চিন্ত হতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় এই সংঘাত। কিন্তু এমনই অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ এই কানাই চৌধুরী—নীরদাদেবীর সমগ্র উক্তির মধ্যে এত বেলা পর্য্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় গৃহস্বামীর প্রতীক্ষার ব্যাপারটিই সব চেয়ে তীক্ষ্ণতর হয়ে তাঁকে প্রচণ্ড আঘাত দিল। একটু পরেই তিনি সমবেদনার সুরে বললেন : সে কি! এখনো পর্য্যন্ত তুমি অভুক্ত আছ! সেই জন্যই মুখখানা এমন শুকনো দেখাচ্ছে! ছি, ছি, এ তোমার ভারী অন্যায় নীর, আগে তুমি খেয়ে নাও, তারপর—

নীরদা দেবী কিন্তু দাদার এই কথা থেকেই তাঁর মনোভাব মোটামুটি বুঝে নিয়েই আরো চেপে ধরলেন। চোখে-মুখে ও বাক্যে অভিমানের ভাবটুকু পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে সরোদনে বললেন: না দাদা, ঢের হয়েছে—আর নয়; এ বাড়ীতে জলগ্রহণ করবারও আমার আর মুখ নেই। সে আশাও আমি রাখিনে এর পর। আগে তুমি আমার শাস্তির ব্যবস্থা কর—হ্যাঁ দাদা, আমাকে শাস্তি দাও, শাস্তি দাও, যা তোমার মন চায়—নৈলে আমি তোমার পায়ের তলায় মাথা খুঁড়ে নিজেই শাস্তি নিতে রক্তগঙ্গা হব—'

বলতে বলতে হঠাৎ তিনি কানাইবাবুর সামনে বসে পড়ে পাশের শ্বেতপাথরে তৈরী সিঁড়ির গায়ে জোরে জোরে মাথা ঠুকতে লাগলেন: সঙ্গে সঙ্গে কপাল ফেটে তাজা রক্ত বেরিয়ে সাদা পাথরখানাকে রাঙিয়ে দিল।

বিহ্বলভাব কাটিয়ে সবেগে ভগিনীর মাথাটা দুহাতে তুলে ধরে কানাইবাবু ভয়ার্ত স্বরে চীৎকার করে উঠলেন: নারাণী, শীগগীর জল আন্। ঈষাণী, বাইরে গিয়ে শিবুকে বল্—ছুটে গিয়ে ডাক্তার বাবুকে—

কিন্তু নীরদা দেবীর উচ্চ স্বরে কানাইবাবুর শেষের কথা চাপা পড়ে গেল। জোরে দাদার হাত ছাড়িয়ে তাঁর নাগালের বাইরে গিয়ে রক্তাপ্লুত মুখে কণ্ঠস্বর চরমে তুলে প্রতিবাদ জানালেন: না, না, না, যাবি না তোরা—খবরদার! তোমার পায়ে পড়ি দাদা, ডাক্তার ডেকে আর আমার মুখ পুড়িয়ো না।

নারাণী তাড়াতাড়ি ঘটিভরা জল ও তোয়ালে নিয়ে এ সময় এগিয়ে আসতেই নীরদা দেবী তার হাত থেকে ঘটিটা কেড়ে নিয়ে সেটা উঁচু করে তুলে হুঙ্কার করলেন: এই ঘটি মাথায় মেরে—

কানাইবাবু তার পূর্বেই ছুটে গিয়ে ঘটিটা ভগিনীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে স্নেহসিক্ত ভৎর্সনার সুরে বললেন: কি হচ্ছে নীরো! তবে কি তুমি চাও, আমি বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে যাই—

এ কথার পর হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন নীরদা দেবী। সরোদনে বললেন: অমন কথা ব'ল না দাদা—ব'ল না! তোমার বাড়ী, তুমি মালিক, দয়া করে এনে ঠাঁই দিয়েছিলে—তুমি কি দুঃখে বেরিয়ে যাবে দাদা, তার চেয়ে আমাকে সাজা দিয়ে তোমার বাড়ী থেকে বের করে দাও।

গাঢ় স্বরে কানাইবাবু বললেন: এক তরফা এ সব কি বলছ নীর? আমি কি তোমাকে এ-বাড়ীতে এনে কোন দিক দিয়ে কোনদিন অশ্রদ্ধা করেছি! তোমার সম্মানে আঘাত দিয়েছি?

রোদনবেগ কিছুটা লঘু করে নীরদা উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বললেন: না দাদা, অমন কথা কখনো বলব না—কোন অভাব আমার রাখনি তুমি, যখনি মনে যে সাধ জেগেছে, তুমি একটি দিনের তরেও তাতে বাধা দাও নি—মিথ্যে বলব না দাদা!

কানাইবাবু পুনরায় বললেন: আজকের ব্যাপারে আমার

মুখখানা পুড়ে গেলেও আমি কি তোমাকে কোন কথা বলেছি, কিম্বা কোন কৈফিয়ৎ চেয়েছি তোমার কাছে? বল তুমি —বল?

নীরদা দেবী পুনরায় ফুঁফিয়ে উঠলেন এবং তারই মধ্যে বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগলেন: সেই কথাই তবে বলি দাদা! আমি জেনেছি, বাইরের ঘরে বসে তুমি তোমার পেয়ারের চাকর শিবুকে ডেকে সবই জেনেছ—ও যা বলেছে, তাই ধ্রুব সত্যি জেনে গুম হয়ে ভিতরে এসেছ। অন্য দিন এসেই আগে নীর, বলে ডাকতে; আজ কিন্তু একেবারে চুপ। মুখ ভার করে নাইলে, খেলে, তারপর ওপরে শুতে চললে। একবার জিজ্ঞেসও করলে না—কি হয়েছিল? কেন যে আমি তোমার হাতে গড়া পাঠশালায় গিয়ে—

এখানে বাধা দিয়ে কানাইবাবু বললেন: সেটা ত পালিয়ে যাচ্ছিল না নীর; যদি বুঝতাম, ভিতরে এসে ঐ নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে পাঠশালা আজই আবার বসবে, তাহলে না হয় সে ব্যবস্থা করতাম; কিন্তু ওপাঠ চুকেই যখন গেছে, যে কোন কারণেই হোক—তুমি যখন ওটা তুলেই দিয়েছ, তখন আর ও ব্যাপারটা নিয়ে কেলেঙ্কারী করে কোন লাভ আছে বলতে চাও? তাই মুখ বুজেই ছিলাম, আর—তুমি এখানে এ সময় ইচ্ছা করে এ-কাণ্ড না বাধালে এ নিয়ে আর খুলতামও না—এ মুখ।

কানাইবাবুর কথায় নীরদার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

একটা নিশ্বাস ফেলে সে প্রশ্ন করল : এত বড় কাণ্ড একটা ঘটে গেল, তুমি চুপ করে থাকবে ? বিচার করবে না ?

দৃঢ় স্বরে কানাইবাবু বললেন : তুমি ত জান নীর, বাজে কথা আমি বলি না। আর বিচারের কথা বলছ ? যেখানে প্রতিকারের কোন সম্ভাবনা থাকে না, সেখানে বিচার বৃথা। যে কাণ্ড হয়ে গেছে, তারপর পাঠশালা যখন আর বসবে না, তখন সেই হয়ে যাওয়া কাণ্ডটাকে নিয়ে আর একটা অশান্তি বাধিয়ে কোন ভালো ফল হবে না জেনেই আমি নিশ্চুপ ছিলাম। বুঝেছ এখন ?

নীরদা দেবী এখন ধরা গলায় বললেন : না দাদা, আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। কাণ্ড ত কতই হয়, কিন্তু তাতে কি সব শেষ হয়ে যায় ? যদি বোঝ, ও কাণ্ড বাধিয়েছি আমি, তখন আমাকে শাস্তি দিয়ে, তাড়িয়ে দিয়ে ও পাঠশালা আবার তুমি বসাতে পারবে না কেন—এ কথা আমি বুঝতে পারছি না !

গম্ভীর মুখে কানাইবাবু কথাগুলির উত্তরে বললেন : আমি বসাতে চাইলেও ও দালানে আর পাঠশালা বসবে না নীর। স্বকর্ণে আমি না শুনলেও, ওখান থেকে বিদায় নেবার সময় সাধনা-মা যে-কটা কথা বলে গেছেন, শুধু এ-বাড়ী নয়—মধুমতীর পাড়ায় পাড়ায় তার প্রতিধ্বনি উঠেছে, আমার কানেও ঝংকার দিচ্ছে—'আত্মমর্য্যাদা-বোধ যদি আমাদের থাকে, এ-দালান থেকে আজই আমরা বিদায়

নিয়ে যাব—আর এখানে পড়তে আসব না।' তার এ কথার অন্যথা হবে না নীর। বড় বাড়ীর পূজোর দালানে আর পাঠশালা বসবে না, ছেলেমেয়েগুলোর কলগুঞ্জনে আর ও-দালান গমগম করবে না। এর পর—ঐ দালান খাঁ খাঁ করবে, চড়ুইপাখী আর চামচিকের আস্তানা হবে। তাই হোক ; তাই হোক। এতে আমার এই মাত্র সান্ত্বনা নীর—তুমি সুখী হয়েছ, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে··· বাস্-বাস্— !

কানাইবাবুর কথাগুলি শুনতে শুনতে নীরদা দেবীর সর্বাঙ্গ যেন একটা রূঢ় অনুভূতির সঞ্চারে মোচড় দিয়ে উঠল। কাঁপতে কাঁপতে তিনি কানাইবাবুর সামনে বসে পড়ে তাঁর পা দু'খানা জড়িয়ে ধরে আর্তস্বরে বলে উঠলেন ; দাদা, দাদা ! আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

অদ্ভুত প্রকৃতির স্নেহশীল দাদাটিও তখন পদযুগল থেকে রোরুদ্যমানা ভগিনীর হাত দু'খানি ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে নিকটে দণ্ডায়মানা পরিচারিকাদের উদ্দেশ্যে বললেন : আগে নীরর মুখখানা ধুয়ে মুছে দাও।

কুড়ি

গাড়ির মধ্যে বসে দুই বাড়ীর দুই কর্তা যখন সাধনা ও নিতাইকে উপলক্ষ করে কঠিন একটা সমস্যার সমাধানকে অনেকটা সহজ করে আনেন, প্রায় সেই সময়ই বড় বাড়ীর পূজার দালানে নীরদা দেবীর হঠকারিতায় সে সম্ভাবনার উপর নূতন করে যে আর এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, বাড়ীতে ফিরে এসে উভয়েই সেটা জানতে পেরে বুঝি এক সঙ্গেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন।

অবশ্য, বাড়ীতে ঢুকেই কানাইবাবুর মত মথুরবাবুকে বড় বাড়ীর ব্যাপারটি শুনে চমকিত হতে হয়নি। এর কারণ, সাধনা বাড়ীর বৃদ্ধ ভৃত্য নবদা ও পিসি কালিদাসীকে আগে থেকেই সতর্ক করে দিয়েছিল, বাড়ীতে আসা মাত্রই মথুরবাবুকে যেন খবরটা শোনানো না হয়—স্নানাহার ও বিশ্রামের পর জানালেই হবে। পাছে সাধনা ও সুধীরকে এ সময় বাড়ীতে দেখে বাড়ীর কর্তার মনে সংশয় জাগে, সেই আশঙ্কায় বুদ্ধিমতী সাধনা বাড়ী থেকে সরে পড়েছিল আগেই এবং সে আরও বুঝেছিল যে, অসময়ে পড়ুয়ারা বাড়ী ফিরলেই বড় বাড়ীর সেই বিশ্রী কাণ্ডটি নিয়ে ঘরে ঘরে কথা উঠবে, হয়তো ঘটনাটা অতিরঞ্জিত হয়ে পাড়ার সবার মন বিষিয়ে তুলবে। সেটা বন্ধ করবার জন্যেই ছোট ভাই সুধীরকে নিয়ে পাড়ায় বেরিয়ে পড়েছিল সাধনা।

ভোজনের পর মথুরবাবু শয্যায় আশ্রয় নিয়ে পরিতৃপ্তির সঙ্গে ধূমপান করছিলেন সেদিনের সংবাদপত্রখানি সামনে ধরে। এমন সময় তাঁর কাণে এলো কালিদাসীর কণ্ঠনিঃসৃত একটি প্রশ্ন : ও-বাড়ীর খবর শুনেছ দাদা ?

মথুরবাবুর চোখ ও মুখ একসঙ্গে পত্রিকা ও সটকার সংস্পর্শ কাটিয়ে কালিদাসীর দিকে আকৃষ্ট হলো। কয়েক মুহূর্ত নীরবে চেয়ে থেকে বললেন : খবর ? কি হয়েছে ?

কয়েক ঘণ্টা পূর্বে বড় বাড়ীর পূজার দালানে যা যা হয়েছিল, এবং সাধনার কাছে তিনি যে সব কথা শুনেছিলেন, সবই বললেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

মথুরবাবুর আর বিশ্রাম করা হলো না। বিছানা যেন কাঁটার মত গায়ে ফুটতে লাগল। বুঝতে বিলম্ব হলো না— ইচ্ছা করেই সাধনা ভাইটিকে নিয়ে বাড়ী থেকে সরে গেছে। কেবলই মনে পড়তে থাকে, গাড়ির মধ্যে পাশাপাশি উপবিষ্ট অবস্থায় কানাইবাবুর কথাগুলি : 'আমি করেছি যত প্রচেষ্টা, আমার ভগিনী নীরদার কাছ থেকে এসেছে ততোধিক বাধা। মনে পড়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী অবস্থায় নিতায়ের কথা : 'মা আমার ভারি অবুঝ, পরের কথায় তিনি নাচেন…'

চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল ভৃত্য নবকুমারের আগমন ও আহ্বানে : বাবু, বাবু ! ও বাড়ীর বড়কর্তা আইছেন…

সোজা হয়ে উঠে বসেন শয্যার উপরে মথুরবাবু।

কোথায় ? বাইরের ঘরে বসিয়েছ বুঝি ?

আজ্ঞা। তার লাগে ত ছুটো্য এনু।

তিক্ত কণ্ঠে বললেন মথুরবাবু : এখানেই আনলে না কেন? যাও, এই ঘরেই নিয়ে এসো।

ন ভৃত্য বুঝতে পারল যে, ভুল করে ফেলেছে সত্যই সে ভুল শোধরাবার উদ্দেশ্যে তেমনি ব্যগ্রভাবেই সবেগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কালিদাসী পালঙ্কের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন ; বিস্ময়ের সুরে বললেন : ওমা, নিজেই এসেছেন হন্তদন্ত হয়ে—আজ আর শোয়া হয়নি দেখছি।

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে মথুরবাবু বললেন : আমারই দশা হয়েছে ওঁর -- এ খবর শোনবার পর চোখে কি আর ঘুম আসে!

কালিদাসী আর কোন কথা না বলে মাথায় ঘোমটাটি টানতে টানতে ঘরের অন্যদিকে দরজার আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

কানাইবাবুকে ঘরে পৌঁছে দিয়েই নব সরে গেল সেখান থেকে। মথুরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে বললেন : আসুন, আসুন—বসুন এখানে। তাহলে—

কানাইবাবু পালঙ্কের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন : একই দশা দেখছি। ঘুমটা আর পাত্তা পায়নি।

মথুরবাবু বললেন : ধরেছেন ঠিক। আমিও উঠি উঠি করছিলাম ও বাড়ী যাবার জন্যে। আপনি না এলে—

আমার আর ধৈর্য্য সইল না! কিন্তু সাধনা-মাকে ত' দেখছি নে?

মথুরবাবু বললেন, কাণ্ডটার পর সাধনার সতর্কতা, আর কিছু আগে কি ভাবে খবরটা তিনি শুনেছেন। এরপর ঘটনাটা সম্বন্ধে উভয়েই আলোচনা ও বিশ্লেষণ করতে বসে গেলেন। নব এসে নূতন করে গড়গড়ার চূড়ায় তাওয়াদার কলকেটি বসিয়ে দিয়ে গেল।

সটকায় গুটি দুই টান দিয়েই কানাইবাবু বললেন: আমরা দুজনে যখন ফেরবার মুখে গাড়িতে বসে মিলন-গ্রন্থী রচনা করছিলাম, ঠিক সেই সময় নীর তার খেয়াল-খুসিমত বাড়ীতেই সবার সামনে সেটা ভণ্ডুল করে দিয়েছে। আমিই নিজে জিদ করে সাধনা-মাকে বড় বাড়ীর পাঠশালায় নিয়ে যাই। তখন কোথায় ছিল নীর আর নিতাই। ওরা আসার পর থেকে যা যা ঘটেছে সদরে অন্দরে, তাতে মা'র মহত্বই প্রকাশ পেয়েছে! পাবারই ত কথা। এই বয়সেই সাধুপুরুষদের মত সবাইকে ও যে ভালবাসতে শিখেছে—আপন পর বলে ওর কাছে কিছু নেই, তার নিদর্শন ত আমরা হাসপাতালেই পেয়েছি। তাই আমাকে শক্ত হয়েই বলতে হচ্ছে মথুরবাবু, সাধনাকে ওখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আমি আসিনি। আমি এখন বুঝেছি, নিরুপায় অবস্থায় যে ক'টি কথা বলে সাধনা-মা বিদায় নিয়ে এসেছেন, সেই সঙ্গে পাঠশালাও ওখান থেকে উঠে এসেছে। আমি এখন বহু দোষ সত্বেও আমার ভগিনী নীরদার সম্বন্ধে

নিজের দুর্বলতা যেমন বুঝেছি, আপনার কন্যার বিচিত্র প্রকৃতিও তেমনি চিনেছি। নিজের বয়স আর সম্পর্কের অহঙ্কারে তাঁর সেই প্রকৃতির উপর আঘাত দেবার ইচ্ছা আমার নেই।

মৃদুস্বরে মথুরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি এখন কি করতে চান?

অবিচলিত কণ্ঠে কানাইবাবু বললেন: প্রায়শ্চিত্ত। আমার এবং আমার ভগিনী—উভয়ের পক্ষ থেকে।

মথুরবাবু বুঝি মনে মনে চমকে উঠলেন কথাটা শুনে। নীরবেই চেয়ে রইলেন কানাইবাবুর প্রশান্ত মুখখানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। কানাইবাবুই কথা বলে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন: নিজে থেকেই আমি জানি মথুরবাবু, অন্যায় ও অসত্যের ছায়া কখনো পড়েনি যে চিত্তে, সেখান থেকে যে কথা সহসা বেরিয়ে আসে, বিস্ময়কর হলেও তা সার্থক হতে বাধ্য। ওখান থেকে বিদায় নেবার সময় সাধনা-মা বলেছিলেন—মা-সরস্বতীই তাঁর পাঠশালা বসিয়ে দেবেন। ওঁর সেই কথা যে মা-সরস্বতীর কাণে গেছে, তিনি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, সেই কথাই আমি আপনার বাড়ী বয়ে বলতে এসেছি মথুরবাবু!

স্নিগ্ধ স্বরে মথুরবাবু বললেন: নিজেই আপনি সত্যাশ্রয়ী, তাই সহজেই পান সত্যের সন্ধান। আপনার সঙ্কল্প আমি বুঝেছি। সাধনা এখানে থাকলে তার সামনেই আলোচনা করা যেত। এদিকে সেরেস্তায় যাবারও সময় হয়ে এসেছে। চলুন, আপনার বৈঠকখানায় বসেই আপনার মুখে শোনা যাবে,

মা সরস্বতী পাঠশালা বসানো সম্বন্ধে কি রকম নির্দ্দেশ আপনাকে দিয়েছেন।

মথুরবাবুর কথা শুনে কানাইবাবু হেসে ফেললেন এবং সেই হাসিমুখেই বললেন: আপনি তো সাধনার বাবা, অন্যের কল্পনা মন থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মনের ক্যামেরায় ধরা পড়ে যায়। বেশ, সেই ভালো—চলুন। আপনিই ফিরে এসে সাধনা-মা'কে বলবেন। সত্য বলছি মথুরবাবু, আসতে আসতে কেবলই মনে সঙ্কোচ হয়েছে, কেমন করে সাধনা-মা'র সঙ্গে কথা বলব! নিজের ভগিনীই মুখখানা আমার এতো ছোট করে দিয়েছে যে, ছোট একটি মেয়ের সামনে মুখোমুখী দাঁড়াবার সাহসটুকুও আজ হারিয়ে ফেলেছি।

একুশ

বড় বাড়ীর বৈঠকখানায় এক-একটা উপাধান অবলম্বনে মুখো মুখো বসে দুই প্রবীণ সুধী অনেকক্ষণ ধরেই আলোচনা করলেন। কোন জটিল বা বিশ্রী ঘটনার মীমাংসার ব্যাপারে কোন প্রীতিকর সূত্র যদি প্রকাশ পায়, সেটা সূত্রধারকে পরম তৃপ্তি দিয়েই থাকে। এক্ষেত্রেও তেমনি একটা অনুকূল অবস্থার উদ্ভব হয়।

যে কঠিন কথাটি ব'লে সাধনা মেয়েটি বাড়ীর দালান থেকে বিদায় নিয়ে যায়. সেই কথাটাকে কেন্দ্র করেই কানাইবাবু আলোচনা আরম্ভ করেন। তেরো বছরের একটি কিশোরী মেয়ের মুখের কোন কথার উপর এতখানি গুরুত্ব প্রদান—বিশেষ করে কানাই চৌধুরীর মত একজন ঝানু মানুষের পক্ষে যে খুবই বিস্ময়াত্মক ও কৌতুকাবহ, হয়ত সাধারণভাবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু যারাই এই অসাধারণ মেয়েটির সংস্পর্শে এসে তার অনন্যসাধারণ ধী-শক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন. তাঁরা কানাই চৌধুরীকে কখনই ভুল বুঝবেন না। কানাই চৌধুরীও অনেক চিন্তা ও বিবেচনার পর এ-দিনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতিটি সম্বন্ধে একটা সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। মথুর বাবুও তাঁর সিদ্ধান্তটি শুনে নিশ্চিন্ত হলেন এবং এই বিচক্ষণ মানুষটির বুদ্ধির তারিফ করতে লাগলেন।

সিদ্ধান্তটি স্থির হবার পর সুখটানের জন্য উভয়েই সচকিত হয়ে উঠলেন। বাহিরের দিকের দরজাগুলি বন্ধ করেই দুই বৃদ্ধ বৈঠকঘরে পরামর্শ করতে বসেছিলেন। কানাইবাবুই তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিয়ে শিবকুমারকে আহ্বান করতেই সে তাওয়াদার প্রকাণ্ড কলিকাটি প্রায় প্রস্তুত অবস্থায় নিয়ে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে যথাস্থানে বসিয়ে দিল।

পর্য্যায়ক্রমে উভয়েই কতিপয় সুখটান দিয়ে বিশেষ সুখানুভব করলেন। কানাই চৌধুরীর বুকের উপর থেকে যেন গুরুভার একখণ্ড পাষাণ নেমে গেছে। সেই আনন্দে নিজেই বলে ফেললেন ঃ তাহলে আপনিই সাধনাকে কথাটা বলবার ভার নিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করুন মথুরবাবু।

মথুরবাবু তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করতে করতেই বললেন ঃ আমি ভাবছি, এখান থেকে স্বামীজীর আশ্রমেই প্রথমে যাব। আপনার প্রস্তাবটি আগে তাঁকে বলাই সঙ্গত মনে করছি। কারণ, শিক্ষার ব্যাপারে সাধনা তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন কাজেই হাত দেয় না, এ আমার জানা কথা। তা ছাড়া, এখানকার ব্যাপারটা তাঁর কাণে ওঠাও আশ্চর্য নয়। সেইজন্যই আপনার সিদ্ধান্তটি তাঁকেই জানানো আমি সঙ্গত মনে করি।

উৎফুল্ল মুখে কানাই চৌধুরী বললেন ঃ খুব ভালো কথা। বেশ, তাহলে আপনি ঘটনাটি আগাগোড়া তাঁকে জানিয়ে আমার মানসিক অবস্থাটার কথাও বলবেন। তারপর, দু'দিক

বজায় রাখতে যে ব্যবস্থা করেছি, আপনিই খুলে সব বলবেন। হয়ত এই সূত্রে স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনারও সুযোগ ঘটবে।

এরপর বড় বাড়ী থেকে বেরিয়ে মথুরবাবু গ্রামের মেঠো পথ ধরে স্বামীজীর আশ্রমের দিকে চললেন। বড় রাস্তা ধরে গেলে অনেকটা সময় লাগে, তাই মাঠের আল ধরে ঘুরে ঘুরে অল্পক্ষণের মধ্যেই আশ্রম-সংলগ্ন রাস্তাটি দেখতে পেলেন। এই সংযোগস্থলের কাছেই আশ্রম এবং এখান থেকেই তার বড় নিদর্শন প্রাচীন যুগের দেবায়তনের আদর্শে নির্মিত তোরণটি লতাপাতাফুলে সমাচ্ছন্ন অবস্থায় পথচারীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে।

পূর্বে এই বিস্তীর্ণ স্থানটির চারদিকে বেউড় বাঁশের ঘন জঙ্গল ও মাঝখানে একটা জলাশয় ছিল। স্বামাজী এই দুর্গম পতিত স্থানটিকেই তাঁর আশ্রমের উপযুক্ত ভেবে খরিদ করে নিজের পরিকল্পনায় নির্মাণকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। চারপাশের বাঁশগুলির উচ্ছেদ না করে তাদের নিয়েই একটা প্রাণবন্ত প্রাচীর গড়ে তোলেন। বাঁশের গায়ে লতানে বেতের চারা লাগিয়ে দেন। অল্পদিনেই বেতের কণ্টাকাকীর্ণ শাখা-প্রশাখা-গুলি বাঁশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হওয়ায় এমন নিবিড়, নিশ্ছিদ্র ও দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে যে, মানুষের দৃষ্টিত দূরের কথা, বন্দুকের গুলিও এই অদ্ভুত প্রাচীর-বেষ্টনী ভেদ করতে রীতিমত বাধা পায়। জলাশয়ের অর্দ্ধেকটুকু ভরাট করে আশ্রম এবং বাকিটুকু গভীর করে কাটিয়ে ব্যবহারযোগ্য পুষ্করিণী ও পাড়ে-

পাড়ে উদ্যান রচনার ব্যবস্থা হয়। সমস্ত আশ্রমটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, জীবন্ত বংশবৃক্ষরাজির সঙ্গে কণ্টকাকীর্ণ পল্লবিত বেত্র-লতা-গুচ্ছের মিলন-বেষ্টনী রচনা করে বিচিত্র এক প্রাচীরের অবতারণা। আশ্রমের ফটকটিও অপূর্ব। দুই দিকের বংশগুচ্ছকে তোরণের আকৃতি ধারণে বাধ্য করে অপরূপ এক স্থাপত্য শিল্পের আদর্শ দেখানো হয়েছে। এখানে বেতের পরিবর্তে লবঙ্গ-লতিকার প্রসারিত অসংখ্য শাখা-প্রশাখাগুলি নানা বর্ণের কুসুম সম্ভারে সমারোহ অবস্থায় সমগ্র তোরণটিকে আচ্ছন্ন করে এমনই চক্ষুচমৎকারী শোভা ফুটিয়ে তুলেছে যে, প্রথম দর্শনেই প্রাকৃতিক কোন মনোরম সৃষ্টি বলেই ভ্রান্তি ঘটায়।

ফটকের এপারে আশ্রমের আঙিনা। বংশপ্রাচীরের কিনার ঘেঁষে কেতকী, করবী, গন্ধরাজ, টগর, জবা, মালতী, মল্লিকা প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ফুলগাছের সমারোহ। মধ্যভাগের মুক্ত স্থানটি মাটি ও গোময় সাহায্যে এমন নিপুণভাবে নিত্য নিকানো হয় যে, সিমেণ্টের পলেস্তারা পড়েছে বলে ভ্রম হয়। এর পরেই আশ্রমের চণ্ডীমণ্ডপ। আঙিনাটি চণ্ডীমণ্ডপের পৈঠা-গুলির তলদেশ পর্য্যন্ত এগিয়ে গেছে। পৈঠা অর্থাৎ ওঠবার সোপানগুলিও বিচিত্র ধরণের। আঙিনার মাটি থেকে খানিকটা উপরে চণ্ডীমণ্ডপের অলিন্দ পর্য্যন্ত এই অভিনব পৈঠাগুলি এমন কৌশলে ঢালুভাবে সাজানো হয়েছে, অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের পক্ষেও উঠানামায় কোন অসুবিধা নেই। একই

আকারের এক একটি আস্ত তালগাছের গুঁড়ি ও আগাটুকু মাত্র বাদ দিয়ে এই দীর্ঘ সোপানশ্রেণী নির্মিত। আল্‌কাতরার প্রলেপ দিয়ে এগুলিকে সুদৃশ্য ও বর্ণাঢ্য করা হয়েছে। পৈঠাগুলির মধ্যে ব্যবধান অল্প থাকায়, স্বচ্ছন্দে সকলেই আরোহণ বা অবতরণে সমর্থ হন।

পৈঠার পরেই টানা বারান্দা বা দালান। কিনারার দিকে সারি সারি শালের খুঁটি। তার উপর উলুর চালা। দালানের পর আসল চণ্ডীমণ্ডপ। তিন দিকে মাটীর উঁচু দেওয়াল, সামনের দালানের উপরেই শালের ধরণী—থামের মত সুশ্রী, স্থূল ও মসৃণ; উপরের উঁচু চালার সঙ্গে সংযুক্ত। বারাণ্ডার দিকে চালা ঢালু হয়ে আসায় এখানকার সারিবদ্ধ খুঁটিগুলি আয়তনে ছোট। চণ্ডীমণ্ডপ ও সংলগ্ন বারাণ্ডার আকৃতি দেখে অনুমান করা যায় শতাধিক ব্যক্তির অবস্থান এখানে স্বচ্ছন্দভাবেই সংকুলান হতে পারে। চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়াল-গুলির উপর পল্লী অঞ্চলে পরিচিত দুধে-মাটির প্রলেপ পড়ায়, উচ্চাঙ্গের স্থাপত্য শিল্প পংখের কাজ বলে মনে হয়। এই বিস্তীর্ণ চণ্ডীমণ্ডপের পিছনে আশ্রম-স্বামীর স্বতন্ত্র পাঠাগার, ক্ষুদ্র একটি অঙ্গনযুক্ত পাকশালা, তার পর পুষ্করিণী ও উদ্যান আশ্রমটির সর্বাঙ্গীন পরিপুষ্টতার পরিচয় দেয়।

নিত্য অপরাহ্ণে উদ্যানের গাছপালাগুলি দেখাশোনার পর আশ্রমের ভৃত্য পঞ্চুকে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে আনন্দস্বামী বাইরের প্রাঙ্গণে এসে বসেন। সাথী হয় কোন না কোন বই।

এদিনও একখানি দর্শনের বই নিয়ে তিনি বসেছেন, এমন সময় মথুর বাবু সাড়া দিয়ে ফটকের দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলেন।

স্বামী মহারাজ আছেন কি?

বেতের মোড়া থেকে তাড়াতাড়ি উঠে স্বামীজী সম্মানীয় অভ্যাগতকে সম্বর্দ্ধনা করলেন: আসতে আজ্ঞা হোক ভট্টাচার্য মশাই—নমো নারায়ণায় নমঃ।

মথুর বাবুও যুক্ত কর কপালে তুলে নারায়ণায় নমঃ বলে প্রতিনমস্কার করলেন।

সামনে আর একখানি মোড়া ছিল। স্বামীজী সেখানি দেখিয়ে অভ্যাগতকে বসবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

উভয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আসন গ্রহণ করবার পর মথুর বাবুই বললেন: বড় বাড়ী থেকেই মেঠো পথ ধরে আপনার কাছে আসা হয়েছে। ওখানকার ব্যাপারেই কিছু জরুরী কথা আছে।

উভয় চক্ষুর উৎসুক দৃষ্টি মথুর বাবুর মুখে নিবদ্ধ করে স্বামীজী বললেন: বড়বাড়ীর পাঠশালায় আমার সরস্বতী-মাকে নিয়ে তো আজ তুমুল কাণ্ড হয়ে গেছে শুনেছি। তাতে খুব ক্ষুব্ধ হয়েই সরস্বতী নাকি ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ করে বলেছেন—এর পর এ-বাড়ীতে তাদের পড়াশোনা আর হবে না, মা সরস্বতী নিজেই তাদের জন্য পাঠশালার ব্যবস্থা করে দেবেন। কথাটা আপনিও নিশ্চয়ই শুনেছেন?

মথুরবাবু বললেন : কানাইবাবু নিজেই আমাকে বলেছেন আমার বাড়ীতে এসে।

কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ রুক্ষ করে স্বামীজী শুধালেন : তিনিও কি ঐ বিশ্রী ঘটনার জন্য আপনার কন্যাকেই দায়ী করেছেন ?

প্রতিবাদের সুর ও ভঙ্গিতে মথুরবাবু বললেন : না, না, না ; তিনি সব শুনে সাধনাকেই সমর্থন করেছেন। এক সঙ্গেই আমরা সদর থেকে ফিরি ; অনেক বেলা হওয়ায় আগে আমাকে বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে তারপর তিনি বড় বাড়ীতে যান। পূজার দালানখানি দেখেই নাকি থমকে দাঁড়ান। সেখান থেকে তাঁর বৈঠকখানায় গিয়েই বিশ্বাসী ভৃত্য শিবুকে ডেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে সব জানতে পারেন। সম্যকভাবে স্নানাহার হয়নি বললেই চলে। তারপর বিশ্রাম না করেই আমার কাছে ছুটে আসেন পরামর্শ করতে।

স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন : পরামর্শ করতে ? কি রকম—

মথুরবাবু বললেন : শুনেছেন তো, সর্বেসর্বা হয়েও তিনি ঝন্‌ঝাটের মধ্যে থাকতে চান না। ব্যাপারটা সব শুনে গুম হয়ে থাকেন, এবং এর পর আর গোলযোগ যাতে না ঘটে, সে সম্বন্ধেই এই সিদ্ধান্ত স্থির করেছেন যে, সাধনা বড় বাড়ীর দালানে দাঁড়িয়ে সবার সামনে যে কথা বলেছে, তাই হবে। পাড়ার কোন ছেলেমেয়ে এর পর আর বড় বাড়ীতে পড়তে আসবে না—মা-সরস্বতীই ওর কথা রাখবেন।

মথুরবাবুর মুখে কানাইবাবুর মুখের এই উক্তি শুনেই সচকিতভাবে সহসা সোজা হয়ে বসে স্বামীজী বলে উঠলেন: কানাই চৌধুরী একথা বলেছেন?

মথুরবাবু সমর্থনের সুরে বললেন: আজ্ঞে হাঁ; সঙ্গে সঙ্গেই স্থির করে ফেলেছেন—এই গ্রামের মধ্যেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, একটা বড় করে পাঠশালা বসাতে হবে। বড় বাড়ীর পাঠশালায় যে দু'জন পণ্ডিত পড়াতেন, তাঁরাই পড়'বেন। সাধনাই সেটি পরিচালনা করবে। বড় বাড়ীর মতই—ছাত্র-ছাত্রীরা বিনা ব্যয়ে পড়বে, তার ওপর বইপত্র সবই পাবে। সমস্ত খরচ তিনি বহন করবেন, কিন্তু খুব গোপনে—বাইরের কেউ জানবে না, খুব ঘনিষ্ঠ দু' তিনজন ছাড়া। অর্থাৎ—আপনি, আমি ও সাধনা ভিন্ন আর—

মথুরবাবুর কথাটায় এখানে বাধা দিয়ে দৃঢ়গম্ভীর স্বরে স্বামীজী বললেন: তার প্রয়োজন আর হবে না মথুরবাবু। আমার সরস্বতী-মা'র মুখ থেকে পরম ক্ষণে যে বাক্য নির্গত হয়েছে, স্বয়ং বাচামীশ্বরী অর্থাৎ বাক্যের স্রষ্টা বাগ্‌দেবী সরস্বতীও স্বস্তিবাচনের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই গ্রামেই হবে সেই সার্বজনীন পাঠশালার প্রতিষ্ঠা—কোন ধনীর অর্থের প্রত্যাশা না করেই।

মথুরবাবু এ হেন অপ্রত্যাশিত কথাটা শুনে স্তব্ধভাবে তাকিয়ে রইলেন স্বামীজীর দিকে। এ কি সম্ভব? কিন্তু স্বামীজী যে এভাবে ব্যঙ্গ করতে পারেন না, কৌতুক করেও

অসত্যকে প্রশ্রয় দেবেন না, এ ত জানা কথা। অগত্যা সন্দিগ্ধ কণ্ঠেই তাঁকে বলতে হলো: বলেন কি—এরই মধ্যে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়ে গেছে! কানাই বাবুর প্রস্তাবটা তাহলে—

স্বামীজী বললেন: আপনি তাঁকে বলবেন—ঐ সঙ্কল্প থেকেই তাঁর প্রকৃতির মহানুভবতা প্রকাশ পেয়েছে। তবে তার আগেই সরস্বতীর কথাটিও ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাতে পাকা হয়ে গেছে। এর জন্য তিনি যেন দুঃখ না করেন।

তথাপি মথুরবাবু বিমূঢ়ভাবে স্বামীজীর মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নীরবে প্রতীক্ষা করতে থাকেন, বিশদভাবে যদি স্বামীজী বৃত্তান্তটি ব্যক্ত করেন এই আশায়।

কিন্তু স্বামীজী তাঁর গম্ভীর মুখখানির উপর সহসা স্নিগ্ধ হাসির আভা ফুটিয়ে ধীরে ধীরে বললেন: আপনি বিজ্ঞ ব্যক্তি, কাল বা সময়ের প্রভাবকে নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। কালই সর্বস্রষ্টা, তাই সর্বভুবন সে ব্যাপ্ত করে থাকে। বেদও এই কালের উদ্দেশে বলেছেন—

স এব সংভুবনান্যাভবং
স এব সংভুবনানি পর্যৈৎ।

অর্থাৎ—যে সত্য এখনি দেখতে পাইনা আমরা, কালে তাই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। তখনই তার রহস্য বুঝা যায়। এই সঙ্গে দর্শনের চিৎ বা চিত্ত এবং প্রাণশক্তির কথাও এসে পড়ে। দর্শন বলেছেন—চিদ্ হীদং সর্বং প্রকাশতে। চিত্তই সর্বরূপে

প্রকাশমান। চিত্তমেব হি সংসারম্—এই চিত্তই সংসার। প্রাণশক্তিতেই চিত্ত ওতপ্রেত—প্রাণৈশ্চিত্তং সর্বম্ ওতম্ প্রজানাম্। চিত্ত বিশুদ্ধ হলেই আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়। এই সৎ ও শুদ্ধ চিত্তের মূল হচ্ছে প্রাণশক্তি। আমাদের এই জগতের সব কিছুই—ইচ্ছাই বলুন, কর্মই বলুন, সিদ্ধিই বলুন —সবার মূলে এই প্রাণশক্তি। এর চেয়ে বিস্ময়কর বস্তু এ বিশ্বে আর কিছু নেই। আমাদের সরস্বতী এই বয়সেই দর্শনের এই রহস্য জেনেছেন বলেই তাঁর চিত্তের ইচ্ছা প্রাণের ছন্দে ছন্দোময় হয়েছে। এখানে কানাইবাবুর, আপনার বা আমার কোন হাত নেই। কাজেই এখন আর বেশী কিছু বলব না, শুধু এইটুকুই আমি বলতে পারছি যে, সরস্বতীর চিত্তের সাধনাই তার ইচ্ছাকে বাস্তব করেছে। তাকেও এই কথাই বলবেন। হ্যাঁ, আমাকে এখন সায়াহ্নকৃত্য—

মথুরবাবু তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করে বললেন: কথায় কথায় এটা লক্ষ্য করিনি, তাহলে আমি এখন উঠছি।

স্বামীজীও আসন ত্যাগ করে শিষ্টাচারের সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত সঙ্গে এসে তাঁকে বিদায় দিলেন।

বাইশ

যুগকন্যার আখ্যানটি এখন উপসংহারের পথে এগিয়ে চলেছে।

কানাই চৌধুরী মথুর বাবুর মুখে পাঠশালা সম্পর্কে আনন্দ স্বামীর সিদ্ধান্তটি শুনে কিছুক্ষণ নীরবে গুম হয়ে বসে রইলেন। মথুর বাবুর মনে হলো যে, নিজের প্রস্তাবটি কার্যকরী না হওয়ায় কানাইবাবু বুঝি মনের উপর খুবই আঘাত পেয়েছেন। কিন্তু খানিক পরেই মথুরবাবু আত্মসচেতন হয়ে অল্প কথায় তাঁর মনের সে ধারণা মুছে দিলেন। তিনি বললেন: আমার প্রস্তাবটি স্বামীজী গ্রহণ করেননি বলে আমি ভেঙে পড়িনি মথুর বাবু; আর, আপনিও ত জানেন, আলাদা পাঠশালা খুলে বাহাদুরী দেখাবার ইচ্ছাও আমার ছিল না, আমি বরাবরই আড়ালে থাকতাম। কিন্তু সাধনা-মা'র শুদ্ধ মনের আর্জি যে সঙ্গে সঙ্গেই উপরওয়ালার টনক নড়িয়ে দিয়েছে, এটা আপনার মুখে শুনেই আমি স্তব্ধ না হয়ে পারিনি। এখন ভাবছি, বিশুদ্ধ ও বলিষ্ঠ মন থেকে যে চিন্তার উদ্ভব হয়, তা কখনই ব্যর্থ হতে পারে না। সাধনা-মা'র কথা এ ভাবে সার্থক হওয়ায় আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি।

বাড়ীতে ফিরে এসে সাধনার সঙ্গে দেখা হতেই তিনি প্রথমে গ্রামের কথা তুলে জিজ্ঞাসা করলেন: প্রায় প্রত্যেক

বাড়ী থেকেই ছেলেমেয়ে কেউ না কেউ ওবাড়ীর পাঠশালায় পড়তে আসে। তাদের কাছে ঐ বিশ্রী ব্যাপারটা শুনে নিতায়ের মায়ের ওপর পাড়াশুদ্ধ সবাই খুব রেগে গেছে—নয় মা? যাচ্ছে তাই বলেছে নিশ্চয়ই ?

সাধনা বেশ স্নিগ্ধ স্বরেই কথাটার জবাব দিল: না বাবা, পাছে এমনি কিছু হয়, সেজন্যে সুধীরকে নিয়ে আমি পাড়ায় বেরিয়েছিলাম। বাড়ী বাড়ী ঘুরে সকলকে তাঁর ছেলের বিপদের কথাটা বলে বুঝিয়ে দিয়েছি—যাতে কেউ যাচ্ছেতাই তাঁকে না বলে।

বিস্ময়ে চোখ দুটো বড় করে মথুরবাবু বললেন: বটে! কিন্তু সবাই জেনেছে নারদা ঠাকরুণের যত রাগ তোমারই ওপরে—লাঞ্ছনাও কম করেননি। তা ছাড়া, কারো হাত ভেঙেছে, পায়ে লেগেছে, মাথা কেটেছে তাঁর দাবাদাবির জন্যে। আর তুমি তাঁরই পক্ষ নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ওকালতী করে এলে? আশ্চর্য!

কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ করে সাধনা বলল: কিন্তু বাবা, পাড়াময় তাঁর নামে যদি ধিক্কার উঠত, সবাই মিলে ঘোঁট পাকাতো, সেটা কি ভালো হ'ত? আর, জেঠামণিও কি তাতে ভেঙে পড়তেন না? অন্যায় যদি কেউ করে, তার জন্যে আর একটা অন্যায় করে তার জবাব দেওয়ার চেয়ে, তাকে শোধরাবার চেষ্টা কি ভালো নয় বাবা!

গলায় জোর দিয়ে মথুরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন: কানাই

বাবুর ঐ অবুঝ বোনটিকে তুমি কি শোধরাবার আশা রাখ মা?

দৃঢ় স্বরে সাধনা বলল: হ্যাঁ বাবা, আমি ওঁকে শুধরে আমার এই পিসির মত মিষ্টি মানুষ একদিন করবই। আমার কথা মিথ্যা হবে না বাবা।

মথুরবাবুর শক্ত বুকখানা বুঝি কথাটা শুনেই একবারে কোমলতা প্রাপ্ত হলো। ক্ষণকাল কন্যার উদ্দীপ্ত মুখখানার দিয়ে চেয়ে থেকে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন: ভালো, তা যেন হলো। কিন্তু উপস্থিত ছেলেমেয়েগুলোর পড়ার কি ব্যবস্থা করে এলে?

সুধীর ছেলেটি কাছে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনছিল, এই সময় বাবার কাছে এগিয়ে এসে বলল: জানো বাবা, দিদি সবাইকে বলে এসেছে—কাল দশটার সময় স্বামীজীর আশ্রমে সবাই পড়তে যাবে। শুনে তাদের কি আহ্লাদ। পণ্ডিত-মশাইরাও আসবেন বলেছেন।

কন্যার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মথুর বাবু এরপর বললেন: এ যে, এক যাত্রায় পৃথক ফল হলো মা! নীরদা ঠাকরুণের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের পথটাই না-হয় বন্ধ করে এলে, কিন্তু যা থেকে তার উৎপত্তি, সেইটিই তাঁর সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলে!

মৃদু হেসে সাধনা বলল: সাধু দাদু বলেন বাবা, অন্যায় সম্পর্কে ব্যক্তির উপর আঘাত করার চেয়ে তার বিবেকে লাগে

এমন কিছু করাই উচিত। তাতে আর সংঘর্ষের ভয় থাকবে না, বিবেকের কাছ থেকেই সে তখন শিক্ষা পাবে। এই জন্যেই পাঠশালা ওঁর সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছি। পাঠশালা ও-বাড়ীতে থাকলে তার ফল আরো খারাপ হ'ত—জেঠামণির সঙ্গেও ওঁর সদ্ভাব থাকত না।

মথুরবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন: কিন্তু মা স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা না করেই কাল থেকে সেখানে পড়ার ব্যবস্থা করে এলে! তিনি যদি—

সাধনা সহাস্যে বলল: আপত্তি করবেন বলছেন? না বাবা, সে মানুষ তিনি নন। শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এ-অঞ্চলে এসেছিলেন, আমি ছাড়া আর কেউ তাঁর কাছে শিক্ষা নিতে যায় নি। এতদিন পরে গ্রামবাসীর সেই ভুল যদি ভাঙে, আমার মনে হয়, সাধু দাদু তাতে পরম তৃপ্তিই পাবেন।

মথুরবাবু এই সময় বেশ সহজভাবেই বললেন: তোমার জেঠামণি এখানে এসেছিলেন শুনেছ?

সাধনা বলল: হ্যাঁ, বাড়ীতে আসতেই পিসিমা বলেছেন সে কথা। তাঁর মনে যে কত আঘাত লেগেছে, আমি সেটা বুঝতে পারছি। আরো বেশী আঘাত যাতে না পান, সেই জন্যই আমাকে পাড়ায় বেরুতে হয়েছিল। জেঠামণি আপনাকে কিছু বলেছেন?

এতক্ষণ পরে বলবার সুযোগ পেয়ে মথুরবাবু কানাই চৌধুরীর এ বাড়ীতে আসা থেকে তাঁর প্রস্তাব এবং সেটি খণ্ডন

করে আনন্দ স্বামীর সিদ্ধান্তটিও কন্যার কাছে প্রকাশ করলেন। তিনি ভেবেছিলেন, স্বামীজীর সিদ্ধান্ত শুনেই সাধনা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে—তাঁর আশ্রমে পাঠশালা বসাবার প্রস্তাবটি তাকে আর নূতন করে তুলতে হবে না। কিন্তু সাধনার মুখের দিকে তাকাতেই তাঁর সে ধারণার অবসান হলো; তিনি লক্ষ্য করলেন, এরই মধ্যে তার সুন্দর মুখখানা যেন সহসা কালো হয়ে গেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন: ব্যবস্থা কি তোমার মনঃপুত হয় নি। তাই কি? তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে।

গাঢ় স্বরে সাধনা বলল: হ্যাঁ বাবা।

আহতকণ্ঠে মথুরবাবু শুধালেন: কিন্তু তুমিই ত মা বাড়ী বাড়ী ঘুরে পাঠশালার ছেলেমেয়েগুলোকে বলে এসেছ, কাল থেকে তারা স্বামীজীর আশ্রমে গিয়ে পড়াশোনা করবে। অথচ, তিনি স্বেচ্ছায় যে ব্যবস্থা করেছেন—

কথাটা শেষ না করে মথুরবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কন্যার দিকে তাকাতেই সে তেমনি গাঢ় স্বরে বলল: তাঁর ব্যবস্থা, আর আমার ব্যবস্থা ঠিক এক রকম নয় বাবা! তাঁর কথা থেকেই আমি বুঝতে পেরেছি—আমার কথা সার্থক করতে আশ্রমটি তিনি আমাকে দান করে…চলে যাবেন এখান থেকে। এ যে আমার পক্ষে কত বড় ক্ষতি…তাঁর এ শুভেচ্ছা যে আমার প্রতি কি মর্মান্তিক অভিশাপ…না, না, আমি এ সহ্য করতে পারব না বাবা—আমাকে আজই তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে।

উভয় হস্তে দুই চোখের উদ্গাত অশ্রুধারা সবলে রুদ্ধ করে সাধনা দ্রুতপদে পড়ার ঘরের দিকে ছুটে চলে গেল। তার ছাত্র-ছাত্রীরা সেখানে এসে গেছে; তাদের পড়িয়ে পুনরায় তাকে আশ্রমে যেতে হবে নিজের পড়ার জন্য।

আশ্রমে আনন্দস্বামীর পদতলে মাথাটি নত করে প্রণাম করেই সাধনা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কেঁদে ফেলল। আনন্দস্বামী সবিস্ময়ে দু'হাতে তার মুখখানি তুলে স্নেহার্দ্রস্বরে বললেন: এ কি সরস্বতি! তুমি কাঁদছ?

সরোদনে সাধনা সম্ভাষণ করল: দাদু—

সস্নেহে শিষ্যার মাথায় হাতখানি রেখে তিনি শুধালেন: কি বলতে চাও সরস্বতি?

আর্তস্বরে সাধনা উত্তর দিল: বাবাকে আপনি ভোলালেও আমি কিন্তু আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারব না দাদু!

স্নিগ্ধ স্বরে স্বামীজী বললেন: সে কি সরস্বতি! কি বলছ তুমি? জানো, কন্যাজীবনে তোমার কত আনন্দের দিন আজ—বাক্‌সিদ্ধার মত তোমার মুখের কথা সত্য হতে চলেছে নূতন বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠায়!

সাধনা তেমনি আর্তকণ্ঠেই বলল: এ যে আমার পক্ষে হরিষে বিষাদ হচ্ছে দাদু! আমি বিদ্যাপীঠ চাই না, আমার কথা মিথ্যা হোক; সত্যময় ধর্মরূপে আপনি থাকুন আমার পথের আলো হয়ে।

শান্ত সংযতকণ্ঠে আনন্দস্বামী বললেন: শৈশব-সাধনা সম্পূর্ণ করে যে দুর্লভ আলো তুমি পেয়েছ সরস্বতি, তাতেই ভাবী জীবনযাত্রার পথ দেখতে পাবে। আজকের এই ঘটনা তারই সূচনা। তুমি যখন ভারতীর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলে প্রায় সেই সময়েই সংঘ-গুরুর আদেশ নিয়ে এই পত্র আসে আমার হাতে।

বলেই সামনের থলি থেকে পত্রখানি বা'র করে স্বামীজী সাধনার হাতে দিলেন। সাধনাও খাম থেকে হরিদ্রাবর্ণের কাগজখানি খুলে পাঠোদ্ধারে মনোযোগ দিল। স্বামীজীও বলতে লাগলেন: পড়লেই বুঝবে সরস্বতি; আমাকে যেতেই হবে। হয়ত ব্যাপারটা কাকতালীয়বৎ হয়েছে। কিন্তু আমি বলব, তথাপি তোমার কথার সার্থকতা আছে। তোমাকেই এখানকার ভার গ্রহণ করতে হবে সরস্বতি!

পত্রখানি খামের মধ্যে ভরে স্বামীজীর হাতে দিয়ে নিষ্প্রভ চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সাধনা বলল: কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন দাদু, দেবভাষায় আমাকে সিদ্ধা করে—

বাষ্পাচ্ছন্ন চক্ষু দুটি অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে এখানেই কথা তার রুদ্ধ করে দিল। স্বামীজীও তৎক্ষণাৎ প্রিয় শিষ্যার মাথার উপর হাতখানি রেখে আশ্বাসিত স্বরে বললেন: সে ব্যবস্থাও আমি করে রেখেছি—দেখবে চলো।

স্বামীজীকে উঠতে দেখে সাধনাও তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল এবং তাঁর অনুসরণ করে আশ্রমের অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত

নিভৃত অংশে রুদ্ধ-দ্বার একটি কক্ষের সামনে এসে দাঁড়াল। স্বহস্তে দ্বার উন্মুক্ত করে কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হয়েই স্বামীজী সস্নেহে শিষ্যাকে আহ্বান করলেন : ভিতরে এসো সরস্বতি।

এই নিভৃত কক্ষটি যে আশ্রম-স্বামীর নিজস্ব পাঠগৃহ এবং অন্যের প্রবেশ-সাপেক্ষ নয়, সাধনা ভালভাবেই জানে। এমনি তার শিক্ষাসিদ্ধ স্বভাব যে, কোনদিন কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ-প্রচেষ্টা তো দূরের কথা, এ সম্বন্ধে গৃহস্বামীকে কোন প্রশ্নও করেনি কোনদিন। আজই মুক্ত দ্বারপথে দাঁড়িয়ে সে প্রথম দেখল, প্রাচীন যুগের পদ্ধতি অনুসারে চতুর্দিকেই অসংখ্য পুঁথি ও দুষ্প্রাপ্য বিবিধ পটের সমারোহ। মধ্যস্থলের পাটাতন মৃগচর্মে আবৃত। তার উপর কারুকার্যখচিত প্রশস্ত আলম্ব। সেখানে পাঠ্যগ্রন্থ, খাতাপত্র, লেখনী, মসিপাত্র প্রভৃতি পরিপাটিরূপে সাজানো। এক নজরে ঘরখানি দেখেই সাধনা বলল : বাইরে থেকে দরজার চৌকাঠে মাথা রেখে এতদিন এই ঘরখানিকে প্রণাম করেই গেছি দাহু!

আনন্দস্বামী বললেন : জানি। কোনদিন বালিকা-সুলভ সাধারণ কৌতূহলও তোমাকে এ ঘরের ভিতরটা দেখবার জন্য প্রলুব্ধ করতে পারেনি। তাইত, রুদ্ধদ্বার আজ স্বতঃই মুক্ত হলো সরস্বতি।

এ কথা শুনে সাধনাও গাঢ়স্বরে বলে উঠল : কিন্তু, এর পর—আপনার অদর্শনের ব্যথা যে আরো গভীর হয়ে বাজবে দাহু!

স্বামীজী একটু গম্ভীর হয়ে বললেন: সেই জন্যেই তো তোমাকে এই ঘরে প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছি সরস্বতি। এই ঘরে—পাটাতনে আস্তৃত এই শয্যায় তুমিই আমার স্থলাভিষিক্তা হয়ে বসবে—অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধই থাকবে। তোমার অধ্যয়নের পুঁথিপত্র সমস্ত গুছিয়ে রেখেছি। প্রতিটি তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে যাব—যাতে পরে না অসুবিধাবোধ কর। এখান থেকেই তোমার পরবর্তী জীবন-পরীক্ষার বিকাশ হবে সরস্বতি।

সঙ্গে সঙ্গে সাধনা স্বামীজীর পদতলে বসে পড়ে আবেগভরে বলল: আমার বিদ্যা-সাধনার সঙ্গে আপনার স্মৃতিও এই ঘরে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে দাদু! একলব্যের মত আপনার আলেখ্য সামনে রেখে আরম্ভ হবে আমার এর পরবর্তী সাধনা।

সস্নেহে ভক্তিমতী শিষ্যার শিরোদেশে হাতখানি রেখে আনন্দস্বামী স্নিগ্ধস্বরে আশীর্ব্বাদ করলেন: তোমার চিত্তের সাধনাই তোমাকে পরিপূর্ণ সিদ্ধদান করবে সরস্বতি!

হাসপাতালে নিতাই ক্রমশঃই সুস্থ হতে থাকে। ডাক্তার রায় চৌধুরী আশ্বাস দিয়েছেন, সপ্তাহ-কাল মধ্যেই বাঁধন খুলে দেওয়া হবে—সাত দিনের বেশী তাকে হাসপাতালে থাকতে হবে না। খবরটা কানাইবাবুকেও জানানো হয়েছে। মধুমতীতে ফিরে গিয়ে অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়লেও, প্রত্যহ বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে তিনি নিতায়ের সংবাদ সংগ্রহের কথা বিস্মৃত

হননি ; ইতিমধ্যে নীরদাদেবী হাসপাতালে গিয়ে পুত্রকে দেখবার জন্য জিদ ধরায় কানাইবাবু তৎক্ষণাৎ সে ব্যবস্থা করে দেন। সেই দিনই বাড়ীর গাড়িতে একান্ত অন্তরঙ্গদের নিয়ে নীরদাদেবী রওনা হলেন। সঙ্গে চললেন মোক্ষদা, স্বপ্না, রমেশ, নিধান ও ভৃত্য হাবুল। হাবুল গাড়ির কোচবাক্সে চালকের পাশে স্থান করে নেয়। নিধান ছেলেটি সাইকেল চালাতে ওস্তাদ—সাইকেল চেপেই সে গাড়ির অনুগমন করে।

এই ক'দিনে নিতাই কতবার যে লিলি মেয়েটির কাছে সাধনার কথা বলেছে, তার সংখ্যা হয় না। প্রত্যহই সে আশা করে, বাড়ী থেকে তাকে দেখতে আসছে, আর তাদের মণ্ডড়ায় আছে সাধনা। নিতাই ভেবে রেখেছে, এ ঘরে আসবার আগেই সে মুখখানা বালিসে গুঁজে রাখবে, ডাকলেও সাড়া দেবে না। সাধনা যেন বুঝতে পারে, সে তার উপর ভারি অভিমান করেছে। তারপর, মান ভঙ্গ হলে লিলি দিদিই সাধনাকে শুনিয়ে দেবে, সেদিন তার চুপি চুপি চলে যাবার পর সে তাকে কতবার ডেকেছে, ঘুমের মাঝেও তার নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠেছে কিভাবে। তখন সে দেখবে, সাধনার মুখখানা কি রকম হয়! নিত্যই এমনি কত কথাই ভাবে নিতাই ; কিন্তু বাড়ী থেকে মেয়েরা তাকে দেখতে এসেছে—এ খবর তো কেউ নিয়ে আসে না! ক্রমশঃ তার ধৈর্যের বাঁধন শিথিল হতে থাকে।

একদিন বৈকালের দিকে হাসপাতালের এক পরিচারক এসে

খবর দিল, জমিদারবাবুর বাড়ীর মেয়েরা এসেছেন গাড়ি করে। শুনেই নিতায়ের মনে হলো, উঠে বসে বিছানার উপর। কিন্তু নিজের অসহায় অবস্থাটি উপলব্ধি করবার সঙ্গে সঙ্গে তার সেই পরিকল্পনাটাও মনে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ সে মুখখানা জোর করে বালিসের মধ্যে চেপে ধরল। এই সময় লিলি পরিচারককে খান কয়েক চৌকী আনবার নির্দেশ দিয়ে বড় বাড়ীর মেয়েদের সম্বর্দ্ধনার জন্য তার টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

দরজার পরদা ঠেলে আগন্তুকদের প্রবেশ করতে দেখেই লিলি এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করল: আসুন, আসুন। ঐ দেখুন আপনাদের খোকাবাবুর কাণ্ড! দেরী করে দেখতে এসেছেন বলে মুখখানা বালিসে কি ভাবে লুকিয়েছেন!

নীরদাদেবী বললেন: দাদার মুখে তোমার কথা শুনেছি মা, বড় বোনটির মত হয়ে আমার খোকাকে তুমি কত যত্নই করেছ!

লিলি বলল: এতো আমার কর্তব্য মা! তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই—আপনার ছেলেকে আর বেশীদিন শুয়ে থাকতে হবে না। এত শীগ্‌গীর যে হাড়টা বসে যাবে সেটা আমরা ধারণা করতেই পারিনি।

ইতিমধ্যেই সেখানে কয়েকখানি চৌকী এসে পড়ে; লিলিও শিষ্টাচারের সঙ্গে প্রত্যেককে এক এক খানি চৌকীতে বসিয়ে দিল। গোড়া থেকেই স্বপ্নার লক্ষ্য ছিল শয্যাশায়ী নিতায়ের দিকে এবং সে যে অভিমানে মুখখানা বালিসের বুকে চেপে

রেখেছে সেটা বুঝতে পেরেই চৌকী থেকে উঠে তার শয্যায় বসে মাথার উপর হাতের একটু চাপ দিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বলল : কি হলো নিতাইদা, আমাদের মুখদর্শন করবে না নাকি। বা-রে, একেই বলে—চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া!

নিতায়ের কাণে এই পরিচিত স্বর ঠিক যেন শরের মতই বিঁধল। তৎক্ষণাৎ বালিস থেকে মুখখানা তুলেই একনজরে সান্নিধ্যে উপবিষ্ট সকলকেই দেখে নিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে যেন ঘরখানাকেই উদ্দেশ করে জিজ্ঞাসা করল : সাধনা আসেনি—সাধনা?

সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নাও বিদ্যুদ্বেগে শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে শ্লেষের সুরে বলল : ও! শুয়ে শুয়ে বুঝি সাধনাকেই স্বপ্ন দেখা হচ্ছিল!...পরক্ষণে নীরদা দেবীর দিকে মুখখানি ফিরিয়ে ঠোঁট দুটি ফুলিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে বলল : মা-মণি, শুনলেন তো আপনার ছেলের কথা! এখন কৈফিয়ৎ দিন—ওঁর সাধনা কোথায়—তাঁকে আনা হয়নি কেন?

ছেলের কথায় নীরদা দেবীর চিত্তও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। এখন স্বপ্নার কথায় সর্বাঙ্গ বুঝি জ্বলে উঠল। চোখে মুখে তার আভা ছড়িয়ে তিনি স্থান কাল পাত্র সব বিস্মৃত হয়ে ছেলেকে ভর্ৎসনার সুরে বললেন : তুই কি লজ্জা সরম আক্কেল বিবেচনা সব খুইয়ে ফেলেছিস্ খোকা যে আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে সেই পাড়া-ঢলানী নচ্ছার ছুঁড়িটার নাম তুলে মাথাটা নীচু করে দিলি সবার সামনে?

বড় বাড়ীর মেয়েরা আসছেন শুনেই নিতাই ভেবেছিল, সাধনা নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে আছে। সে যখন এই হাসপাতাল দেখে গেছে, সব কিছুই জানে, তার ওপর মায়ের যে ধারণাই থাক, এ অবস্থায় তাকে না এনে পারবেন না। কিন্তু নার্সের সঙ্গে মায়ের সংলাপ শোনার পর স্বপ্নার ওভাবে গায়ে পড়ে কথা বলার বিশ্রী সুরটা শুনেই তাকে যেন উপেক্ষা করেই সাধনার কথাটা তুলে সবাইকে সচকিত করে দেয়। কিন্তু সাধনা সম্বন্ধে. প্রশ্নটা শুনেই মা যে এমন উগ্র কণ্ঠে অনুযোগ করে সর্বসমক্ষে তাকে হেয় এবং সাধনার প্রতি এখানকার সবার বদ্ধমূল উচ্চ ধারণাকে লঘু করে অপদস্থ হবেন, সেটা সে কল্পনাও করে নি। পক্ষান্তরে তার বুঝতেও বিলম্ব হয়নি যে, সাধনাকে ইচ্ছা করেই তার মা সঙ্গে করে আনেন নি; তার স্থলে স্বপ্নাকেই দিব্যি সাজিয়ে গুজিয়ে আনা হয়েছে। অমনি নিতায়ের মনটাও বিগড়ে গেল এবং গায়ে আবৃত চাদরখানা এক ঝটকায় খুলে ফেলে উর্দ্ধাঙ্গটুকু যতটা সম্ভব তুলে বলে উঠলো: এই জন্যেই আমি মামাবাবুকে মিনতি করে বলেছিলাম—তোমাকে যেন হাসপাতালে আসতে মানা করেন। তুমি এলেই একটা কেলেঙ্কারী বাধাবে—এ জানা কথা।

ভ্রাতৃসংসারে এসে অবধি ছেলের মুখে নীরদা দেবী এমন রূঢ় কথা আর কোনদিন শোনেন নি। ছেলে উদ্ধত হলেও তাঁর মুখের উপরে এভাবে চড়া সুরে কথা বলতে কখনো সাহস করেনি। এরপর তিনিও হয়ত কণ্ঠস্বর চরমে তুলে এর পাল্টা

উত্তর দিয়ে ছেলেকে দাবিয়ে দিতেন, কিন্তু ঐ চড়া কথাগুলো বলবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধভাবে ছেলে এক ঝটকায় সর্বাঙ্গে ঢাকা দেওয়া চাদরখানা ঝটিতি তুলে ফেলতেই কটিদেশ থেকে পদতল পর্য্যন্ত দৃঢ়ভাবে আড়ষ্টকর বন্ধনাবস্থার মর্মন্তুদ দৃশ্যটি নীরদার মানসিক বিকৃত অবস্থাকে মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক মমতার তুহিন-স্পর্শে বিগলিত তুষারের মত রূপান্তরিত করে দিল। পরক্ষণে তিনি ক্রন্দসী কণ্ঠে ব্যাকুলভাবে বললেন: ওরে বাবারে! এই জন্যই আমি হাসপাতালের নামে ডাক ছেড়ে সেদিন কেঁদে উঠেছিলুম! ওরে খোকা, এত খোয়ার তোর যার জন্যে, এখনো সেই রাক্ষুসীর নাম করতে তোর সাধ হয়?

লিলি তাড়াতাড়ি উঠে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল; মিষ্টি স্বরে মিনতি করে বলল: আপনি তো অবুঝ নন মা, আপনার ছেলে সেরে না ওঠা পর্য্যন্ত এমন কোন কথা এখানে বলা উচিত নয়, যাতে ওর মনে কষ্ট হয়। সেরে উঠে উনি বাড়ী গেলে, তখন এসব কথা বলবেন।

লিলির দিকে রুক্ষদৃষ্টিতে চেয়ে নীরদা বললেন: বেশ মেয়ে তো তুমি বাছা, এই তোমার সেরে ওঠা? ওরে বাবা, খোকার বাঁধন দেখে আমার বুকের রক্ত সব হিম হয়ে গেছে! আমি যে আর ওর দিকে তাকাতে পাচ্ছি না রে!

লিলি তৎক্ষণাৎ উঠে চাদরখানা টেনে নিয়ে নিতায়ের গায়ে ঢেকে দিয়ে বলল: ডাক্তারদের চিকিৎসাই এ রকম মা! হাড়

সরে গিয়েছিল বলেই এত শক্ত করে বাঁধাবাঁধির ব্যবস্থা ; এতে ভয়ের কিছু নেই।

ছেলের ব্যাণ্ডেজটা চাপা পড়তেই নীরদা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর পাশেই বসেছিলেন মোক্ষদা, একটু ঝুঁকে তার কাণের কাছে মুখখানা বাড়িয়ে চুপি চুপি বললেন : আমি এখানে আর খোকাকে কিছু বলব না মোক্ষ,—তুই বরং সে কথাটা শুনিয়ে দে ওকে—ওর আক্কেল হোক।

মোক্ষদাও এই সুযোগটির প্রতীক্ষা করছিলেন। এখন নিতাইকে উদ্দেশ করে যতদূর সম্ভব নরম গলায় মিষ্টি করে বললেন : বাবা নিতাই, কথায় বলে—মায়ের দরদ। মা যা বলেন, তোমারই ভালোর জন্যে বাবা! তুমি তো ওখানকার খবর কিছুই শোননি, সাধ করে কি সাধির ওপর উনি রেগে আছেন! তোমার এই অবস্থা, আর সে কিনা বড় বাড়ী থেকে এতদিনের পাঠশালাটা তুলে নিয়ে যায়—এ কি কম আস্পর্দ্ধার কথা বাবা?

পুনরায় মুখখানা তুলে নিতাই বলল : পাঠশালা তুলে নিয়ে গেছে! কে—সাধনা?

চাপা গলায় মোক্ষদা বললেন : আবার কে? আর কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে বাবা, কর্তার ব্যবস্থা ভেঙে দেয়!

মায়ের কথার পীঠে স্বপ্নাও বলল : সেরে উঠে যখন বড়-বাড়ীতে সেঁধুবে, দেখবে—বাইরের দালান খালি ; আর—তোমার সাধি তোমাদের ওপর টেক্কা দিয়ে আলাদা পাঠশালা

বসিয়েছে সেই অনামুখো সাধুর আশ্রমে। বড়বাড়ীর সবাইকে তিনি বয়কট করেছেন।

স্বপ্নার কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনেও নিতাই কিন্তু তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে সহসা নিধানের দিকে তাকিয়ে হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকে চাপা গলায় বলল: দেখুন নিধুবাবু, আপনি কলকাতার ছেলে—আবার দুটো পাসও করেছেন। আপনি যখন ও বাড়ীতে আছেন, সবই জানেন। আপনি নিশ্চয়ই বাড়িয়ে কিছু বলবেন না। পাঠশালা কেন উঠে গেল, আমি আপনার কাছেই জানতে চাইছি—বলবেন দয়া করে?

নিধান অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবেই বলল: অমন করে আপনি বলবেন না খোকাবাবু, আমি যা জানি নিশ্চয় বলব। আসল ব্যাপার কি জানেন—আমার অন্ততঃ ধারণা যে, সাধনা মেয়েটিকে এঁরা সবাই ভুল বুঝেছেন। পাঠশালার ছেলেমেয়েরা টিন বাজিয়ে আপনার ঘোড়াটাকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল বলে, আপনার মা-মণি তার জন্যে সাধনাকেই দায়ী করেছেন। এমন কি আপনার মামাবাবু সদর থেকে গিয়ে ব্যাপারটা আগাগোড়া বলেও ওঁদের ধারণা পাল্টে দিতে পারেন নি। অবিশ্যি তাঁর কাছে সব কথা শোনবার আগেই আপনার মা-মণি পাঠশালার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে সাধনাকেও ঐ ব্যাপারের জন্যে ধমকে দেন। সাধনা তাতে বলে—ছেলেমেয়েদের দোষ হলে শিক্ষক ছাড়া তাদের কিছু বলবার আর কারো ক্ষমতা নেই। এই

নিয়ে তর্কাতর্কি হয়, মা-মণি পাঠশালা থেকে জিনিষপত্র উঠানে ফেলে দেন—

নিতাই এখানে বাধা দিয়ে বলে, আর আপনাকে বলতে হবে না নিধুবাবু। আমি সব বুঝেছি। সাধনা ঠিকই করেছে। আমি এখান থেকেই বলছি—সাবাস সাধনা!

স্বপ্নাও তৎক্ষণাৎ বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল: এখান থেকে বাহোবা দিলে সে তো শুনতে পাবে না। আর ক'দিন পরে মাস পয়লায় তার নতুন পাঠশালা ওখানে বসছে। নাম হয়েছে—সরস্বতী বিদ্যাপীঠ। ঘটা করে উৎসব হবে, আপনার মামাবাবুকে নেমন্তন্ন করেছে। আহা, তুমিই তাহলে বাদ পড়ে গেছ! বেশ, আমিই খবরটা শুনিয়ে দিলুম।

নিতাই নীরবে শুনল, কোন জবাব দিল না। নার্স দিদি সবিনয়ে বলল: আপনারা দয়া করে অন্য কথা নিয়ে আলোচনা করুন। খোকাবাবুর সামনে এ সব কথা তোলা কিন্তু ভালো হয়নি।

স্বপ্না বলল: আর একটা কথা বলেই আমি চুপ করব নার্স দিদি! কথাটা খোকা বাবুকেই বলা হচ্ছে। মা-মণির ঝোঁক হয়েছে, আবার আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে হোষ্টেলে রেখে পড়াবেন। নিধুদাও বি, এ পড়বে, আর গার্জেন হয়ে আমাকে দেখবেন। খোকা বাবু সেরে স্থুরে বাড়ী গেলেই আমরা বেরিয়ে পড়ব।

নিতাইও সঙ্গে সঙ্গে কথাটার জবাব দিল: মা-মণির

মতলব আমি বুঝেছি। বেশত, আগেই বেরিয়ে পড়লে হয়—খোকাবাবুর জন্যে অপেক্ষা করে কি লাভ !

কথাগুলি বলেই নিতাই সেই যে মাথার বালিসে মুখখানি গুঁজে শুয়ে রইল, আর তার মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না। নীরদা, মোক্ষদা, নিধান, রমেশ, স্বপ্না—প্রত্যেকেই সাধ্যমত চেষ্টা করেও তার মুখে কথা ফুটাতে সমর্থ হলো না। আরও কিছুক্ষণ সাধ্যসাধনার পর তাঁরা হাসপাতাল থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হলেন।

আনন্দস্বামীর যেমন কথা, তেমনি কাজ। একটা ভালো দিন দেখে আনুষ্ঠানিকভাবে সরস্বতী বিদ্যাপীঠের উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন করে সর্বসমক্ষে ভাষণ দিলেন : যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—এই শাস্ত্র বাক্যটি বড় সত্য। শুদ্ধ মনে নিষ্ঠার সঙ্গে যা ভাবা যায়, কালক্রমে তা সিদ্ধ হবেই। এ কথার সাক্ষ্য এই বিদ্যাপীঠ। দশ বছর আগে এই গ্রামে এসে শিশুদের অন্তরে শিক্ষার আলো দেখাতে চেয়েছিলাম। এগিয়ে এসেছিল একটি মাত্র শিশু—তিন বছরের এক বালিকা। 'এক চন্দ্রস্তমোহন্তি ন চ তারা সহস্রচ' চাণক্যপণ্ডিতের এই শ্লোকটি স্মরণ করে সেই একটি মেয়েকে নিয়েই আমার বিদ্যাপীঠ খুলে বসি। আজ সেই মেয়েটিকেই আমি দেবী সরস্বতী কল্পা বিদুষী জেনে—এই অঞ্চলের শিশুদের শিক্ষা-সংস্কারের প্রয়োজনে তারই হাতে আমার যত্নেগড়া এই বিদ্যাপীঠ সমর্পণ করে

আমি বিদায় নিয়ে চলেছি। আমি আজ এ অঞ্চলের জ্ঞানী গুণী সুধীবৃন্দ এবং মাতৃমণ্ডলীর সামনে দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি,—ভারতের স্ত্রীশিক্ষা কোন পথ অবলম্বন করলে সার্থক হবে, আমার হাতে গড়া ও সাধনা সিদ্ধা এই মানবী সরস্বতী সাধনাদেবীই তার নির্দেশ দেবেন। বিবিধ সাধনার মধ্য দিয়ে ইনি এই বয়সেই যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, এঁর আদর্শ অনুসরণ করলে আজকের প্রগতিশীল যুগে আরো অনেকের পক্ষেই এভাবে সিদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে। তাই আমি সকল বিদ্যার অধীশ্বরী মহাদেবী ভারতীর কাছে প্রার্থনা করি—সাধনাদেবীর কিশোর সাধনা সার্থক হোক, সফল হোক, সত্য হোক,—শিক্ষার পথে নূতন আলোকপাত করুক।

উৎসব উপলক্ষে আশ্রমটি পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত হয়ে সমাগত সকলকেই বিমুগ্ধ করে। বিদ্যোৎসাহী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বহু মহিলার সমাগমে অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। কানাইবাবুও মথুরবাবুকে সঙ্গে করে উৎসব সভায় যোগ দেন। স্বামীজীর সমক্ষেই তিনি কর্মব্যস্ত সাধনাকে ডেকে বলেন: এই দেখ মা, সবার আগেই আমি এসে গেছি—নিমন্ত্রণ না পেলেও আমি নিজে থেকেই আসতাম।

সাধনাও তৎক্ষণাৎ মৃদু হেসে উত্তর করে: রোদ আর বাতাসকে নিমন্ত্রণ করতে হয় না জেঠামণি, নিজেদের দায়েই তাঁরা আসেন!

এর পর স্বামীজীর সঙ্গে বিদ্যাপীঠ সম্বন্ধে কানাইবাবুর কিছু

কিছু আলোচনাও হয়। স্বামীজীর ইচ্ছা, বালিকাদের জন্যই এখানকার বিদ্যাপীঠের দরজা খোলা থাকবে। তবে বালকদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত, বড়বাড়ীর পাঠশালায় যারা পড়ত, তারাও এখানে স্থান পাবে। কানাইবাবু, এই সূত্রে জানালেন যে, স্বামীজী যদি সম্মতি দেন, এরই পাশের জমিতে ঠিক এই ধরণের এক বিদ্যাপীঠ তাড়াতাড়ি গড়ে তোলবার ব্যবস্থা তিনি করতে পারেন। স্বামীজী তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন : বেশ, আপনি তাই করুন। মানুষের মনে কোন প্রকারেই ব্যথা দেওয়া উচিত নয়। আপনার প্রস্তাব যুক্তির দিক দিয়ে আমি তখন গ্রহণ করতে পারিনি, কিন্তু তার জন্য সত্যই অস্বস্তি বোধ করছিলাম, এতক্ষণে শান্তি পেলাম।

কানাইবাবু বললেন : আপনি সুবিবেচক, শুধু বিদ্যালয় নয়, মানুষের মনের উপরেও আপনার দৃষ্টি সজাগ। আজ আমিও সত্যই শান্তি পেলাম।

অনুষ্ঠানের উপসংহারে কানাই বাবুও উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে ভাষণ দিলেন : আমি এই বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা আনন্দ-স্বামীর উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলছি—গ্রামের এই একটি মাত্র কন্যাকে অবলম্বন করে শুধু এই মধুমতী গ্রাম নয়, সমগ্র অঞ্চলটাই জেগে উঠবে। ভারতের প্রতি গ্রামে যদি এমনি এক একটি কন্যা আত্মপ্রকাশ করে, তারই অনন্যসাধারণ প্রতিভার দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ভারত সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। যেহেতু এই কন্যাই বিশ্বধন্যা—যুগকন্যা।

সমাপ্ত